মৃদঙ্গার

শ্রীকালীপদ ঘটক

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

করকমলেষু—

ভস্মানুলেপ তোমারেই নাকি সাজে,
হে নীলকণ্ঠ, ওহে কঙ্কালমালী।
ধরে দিনু তাই লাগে যদি কোন কাজে,
মৃদঙ্গারের ছাইভস্মের ডালি॥

—এই লেখকের আরও দুটি বই—

অরণ্য-কুহেলী

চন্দন-বহ্নি

মৃদঙ্গার

ফেলারাম চক্রবর্তী এর নাম দিয়েছে অক্ষয়বট। এই বটতলার চায়ের দোকানেই কলিয়ারির বাবুরা সব চা খেতে আসে। কুলি ধাওড়ার মালকাটারা পানবিড়ি কিনে নিয়ে যায়। কোন্ কালে যে বাঁকড়ো জেলার অখ্যাত এক পল্লী থেকে কদমডাঙায় কাজ খুঁজতে এসেছিল ফেলারাম, সে কথা আজ অনেকেরই অজানা। জানেন শুধু কলিয়ারির খাজাঞ্চীবাবু, জয়দেব পৈতুণ্ডী মশায়। আর জানে কোম্পানীর বুড়ো দারোয়ান অমৃৎ সিং। বাদবাকিরা পরবর্তী। কারো হল দশ বছরের চাকরি, কারো বড়জোর পনের। একমাত্র ওই চাঁদ্‌লে মাথা হাজরিবাবু আর পাম্প খালাসী গনি মিয়া উনিশ বছরে পড়েছে। ফেলারামের চলছে এটা আঠাশ বছর। এককুড়ি আটটা বছর ধরে আস্তানা গেড়ে বসে আছে ফেলারাম এই অক্ষয়বটের তলায়। কলিয়ারির বহু কিছু তার নিজের চোখে দেখা। ফেলারামের বয়স যখন মোটে পনের, ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়ে এই খাদমুলুকে। চাকরি একটা সঙ্গে সঙ্গেই জুটে গিয়েছিল ফেলারামের, কম্পাসবাবুর তামাক সাজত। কয়েক মাসের মধ্যেই রসুই ঘরের অ্যাপ্রেন্টিস। চাকরিটা কিন্তু টেঁকলো না বেশিদিন। বছরখানেক যেতে না যেতেই হঠাৎ এক দিন চোখ বুজলেন কম্পাসবাবু। চোখ অবশ্য নিজে থেকে বুজলেন না, পিলার কাটিং-এর কাজের সময় কয়লার একটা চাল ধ্বসে একেবারেই বুজিয়ে দিয়ে গেল চোখ দুটো। বেকার হয়ে পড়ল ফেলারাম। কাউকে কিছু না বলে কেরোসিন কাঠের বাক্স একটা যোগাড় করে ফেলল। পানবিড়ির দোকান সাজিয়ে চুপচাপ এসে বসে পড়ল এই বটগাছটার নীচে। গাছটা তখন কচি ছিল নেহাত, ঠিক ফেলারামের মতই। দেখতে দেখতে হয়ে উঠল প্রকাণ্ড এক মহীরুহ। সে অনুপাতে না হলেও ফেলারামের ব্যবসাও কিছু বেড়েছে বইকি। ফেলারাম আজ পানবিড়িই শুধু বেচে না, সেই সঙ্গে চালু হয়ে গেছে চা বিস্কুট মুড়ি মুড়কি তেলেভাজার কারবার। গুমটির পাশে কাঁচা কয়লার চুল্লী, চায়ের কেটলিতে জল ফুটছে হরদম। রীতিমত একটা রেস্টুরেন্ট সাজিয়ে জেঁকে বসেছে ফেলারাম। তিনটে লোকের ভরণ-পোষণ, মায় শখ-আহ্লাদ এটা-

সেটা অনেক কিছুই গুজরান হচ্ছে এই থেকেই। ফেলারামের প্রতিষ্ঠাতা মা বটেশ্বরীর দয়ায়, আর চেটিয়াবাবুদের এই কদমডাঙা কলিয়ারির দৌলতে অভাব কিছু নাই তার। গায়ে গতরে খেটে খুটে দোকানের ঝাঁপটা একটু খুলে রাখতে পারলেই হল। করিয়ারির মালকাটা আর কুলি-কামিনরা একচেটে সব খদ্দের। বাবুভেয়েরাও সেই সঙ্গে আছেন অনেকেই, চক্রবর্তীর মাসকাবারী মক্কেল। ফেলারামের স্পেশাল চা আর গোলাপীর হাতের মিঠে খিলি, এ না হলে আপিসের কাজে মন বসে না বাবুদের। ছোকরা পাঠিয়ে সাপ্লাই দিতে হয় ফেলারামকে। কুলিকামিন আর মালকাটার দল হাতের পাঁচ তো আছেই! তিন সন্ধ্যে পালিবদলের সময় ফেলারামের অক্ষয়বট গুলজার। খদ্দেরের রহট কিছু কম নেই। এতকাল এটা চলে আসছিল চায়ের দোকান বলেই। সম্প্রতি কিছু উন্নতি ঘটেছে। শহর থেকে একটা সাইনবোর্ড তৈরি করিয়ে এনে গুমটির সামনে ঝুলিয়ে দিয়েছে ফেলারাম, বটগাছের ডালে। নতুন করে এর নাম দেওয়া হয়েছে— কদমডাঙা রেস্টুরেণ্ট।

গুমটির পাশে ফালিখানেক জায়গা। রঙচটা করোগেটের টিন দিয়ে ঘেরা। মাথার উপর ছাউনি বলতে সামনের দিকে খোলার টালি, পিছন দিকটায় ক্যানেস্তারা। ফেলারামের অন্দর মহল। আর এক পাশে ছোট্ট একটা খড়ো চালা, বাবুয়ার আস্তানা। বাবুয়া মানে ফেলারামের মতই দেশছাড়া এক বেওয়ারিশ পশ্চিমা ছোকরা, বছর তের বয়েস। চা-পকৌড়িটা বরাতমাফিক খদ্দেরদের হাতে তুলে দেয় বাবুয়া, কাপডিশ বর্তনগুলো ধোয়ামোছা করে, তিন সন্ধ্যে ঝাড়ু লাগায় চায়ের দোকানের চৌহদ্দিভোর। তাই বলে তাকে রেস্টুরেণ্টের চাকর বলে ধরে নেওয়া ঠিক হবে না, ফেলারাম তার ধরমবাপ। মা বটেশ্বরীর নামে তিন সত্যি শপথ করে বাপ বলে সে মেনে নিয়েছে ফেলারামকে। ধরতে গেলে বাবুয়া তার খোদ লেড়কার সামিল। মাঝে মধ্যে অবশ্য ধরমবেটার ভালাকাওয়াস্তে থাপ্পড় দু-একটা লাগায় ফেলারাম। কিন্তু সে এমন কিছু বাহুল্য না। ভোগরাগ বা খানাপিনার ব্যবস্থাটা ভালই আছে এখানে। সে অনুপাতে মাঝে মাঝে এক-আধখানা নরম গরম চাঁটি, বা কান ধরে একটু ডলাইমালাই, সে এমন কিছু ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। অবশ্য মাত্রাটা যেদিন দৈবাৎ একটু বেশি হয়ে পড়ে, সেদিন এসে মাঝখানে পড়ে ঠেকা দেয় ওই পানওয়ালী গোলাপী। বলে ঢের হয়েছে, ওই থাক। কাজে কাজেই ওইখানেই থেকে যেতে হয় ফেলারামকে, হাত গুটিয়ে নিতে

হয় বাধ্য হয়ে। এর অবশ্য গূঢ় একটু তাৎপর্য আছে। গোলাপী শুধু কদমডাঙা রেস্টুরেন্টের পানওয়ালীই নয়, ফেলারামের আঁতের মানুষ। দশটি বছর ঘর করছে ফেলারামকে নিয়ে, অক্ষয়বট সাক্ষী! খাস ওড্র থেকে আমদানি এই উড়িয়ানী গোলাপী, পান সাজে ফেলারামের দোকানে। দেখতে শুনতে বয়েসটা একটু বেশি হলেও গায়ে গতরে জৌলুস এখনো কম কিছু নেই গোলাপীর। ফেলারাম তাই ফেলতে পারে নি, তুলে এনে বসিয়েছে পানগুমটির পাটাতনের আটনে। ধরতে গেলে কদমডাঙা রেস্টু-রেন্টের একমাত্র স্বত্বাধিকারী ফেলারাম চক্রবর্তীর যাবতীয় স্বত্ব এবং উপস্বত্বের বর্তমান বেওয়ারিশ দখলীকার শ্রীমতী গোলাপশশী দাস্যা। এতবড় কার-বারটার হাল ধরে আছে পিছন থেকে।

ফেলারাম চক্রবর্তী, বাবুয়া মাহাতো, আর গোলাপশশী দাস্যা। একাধারে বাঙালা বিহার উড়িষ্যা। মিলে মিশে এক হয়ে গেছে ফেলারামের এই অক্ষয়বটের তলায়। সেদিক থেকে কদমডাঙ্গা রেস্টুরেন্টের বৈশিষ্ট্য একটু আছে বইকি। অবশ্য কলিয়ারির কথা ধরতে গেলে এর চেয়েও সেটা বৃহত্তর ব্যাপার। আছেন এখানে বাঙালা বিহার উড়িষ্যা, আছেন ভোজপুরী আর পাঞ্জাবী। ওঁরাও মুণ্ডা সাঁওতাল, দেশোয়ালী আর বিলাসপুরী। আছে কিছু কিছু নাগপুরী আর বোম্বেওয়ালা, যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণবাসী তামিলভাষী সমেত। তামাম হিন্দুস্থানের ছিটেফোঁটার জোড়াতালি দেওয়া এ যেন এক দরবেশী আলখাল্লার মত। পাঁচফোড়নের ফোড়ন দেওয়া খাঁটি একটি শিল্পাঞ্চল। আর এই কদমডাঙা কলিয়ারির হৃদ্‌পিণ্ড বলতে তেমন কোন বস্তু যদি থেকে থাকে, সে হল এই ফেলারামের চায়ের দোকান। চায়ের দোকান বলা অবশ্য ঠিক হবে না, রীতিমত একটা তকমাধারী রেস্টুরেন্ট। ভিতরে এর যাই থাক না কেন, অক্ষয়বটে লটকানো এর কাপডিশ মার্কা সাইনবোর্ডটা যাবে কোথায়।

বিকেল বেলা। কয়লাখাদে পালিবদলের সময় হয়ে আসছে। খদ্দের দু-চারটে ভিড়ছে এসে দোকানে। চায়ের জলের কেটলিটা চাপানো আছে উনানের উপর। খদ্দের এলেই চা তৈরি করে এক-একখানা কাচের গেলাস বাড়িয়ে দিচ্ছে ফেলারাম। কেউ কেউ বা চুমুক দিচ্ছে মাটির ভাঁড়ে। ফরসা একখানা চওড়াপাড় শাড়ি পরে আটনে বসে পান সাজছে গোলাপী। হাতে একটা কটকী জাঁতি, সুপারি কাটছে খুটখাট শব্দে।

বেঞ্চির উপর কয়েকটা এঁটো গেলাস জমে উঠতেই খোঁজ পড়ল ধরম

বেটার। সামনের ওই আমবাগানটার লাগাও কোম্পানীর ধাওড়ার দিকে মুখ করে জোর গলায় একটা হাক দিলে ফেলারাম, বাবুয়া—আরে হুই বেটা বাবুয়া, ই সময় আবার গেলি কোন্ চুলে য?

ওপাশ থেকে গোলাপী একটু চোখ তেড়ে বললে, আসছে বাপু আসছে, ষাঁড়ের মত এত চেঁচাও কেনে?

চায়ের গেলাসে দুধ-চিনি ঢালতে ঢালতে তাকাল একবার ফেলারাম গোলাপীর দিকে। বললে চেঁচ ই কি সাধে, ভোঁ পড়বার সময় হয়ে এল যে, গেলাসগুলোন ধুতে হবে না।

মালকাটাদের ধাওড়ায় তিতির পাখীর লড়াই দেখতে গিয়েছিল বাবুয়া। ফেলারামের হাঁক শুনেই ছুটে এল হন্তদন্ত হয়ে। বেঞ্চির উপর থেকে গেলাস কটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে চুপচাপ গিয়ে বসে পড়ল কলতলায়।

মালকাটা আর কুলিকামিনদের ভিড় একটু হয় এই সময়। খাদ থেকে ফিরবার পথে দু-চার পয়সার মুড়িমুড়কি তেলেভাজা কিনে নিয়ে যায় ফেলারামের দোকান থেকে। নিদেন দু-এক পয়সার পানবিড়ি না কিনে ফেলারামকে পাশ কাটাবার উপায় নাই। আসা-যাওয়ার পথে বটতলার সামনে এসে একটুখানি দাঁড়াতেই হয়।

একটু একটু মেঘবাদলা শুরু হয়েছে। তেলেভাজার বিক্রিটা কিছু বেড়ে গেছে ফেলারামের। আর বেড়েছে চায়ের কাটতি। ফেলারামের স্পেশাল চা কিনা, একবার যে খেয়েছে—সহজে আর তাকে ভুলতে হচ্ছে না। এই করেই না দেখতে দেখতে ফেলারামের রেস্টুরেণ্টটা এতদিনে জমল।

খাদমুন্সী ঘড়ইমশায় আর ডেসপ্যাচ-ক্লার্ক রোহিণীবাবু কলতলার পাশ দিয়ে হঠাৎ এসে হাজির হলেন ফেলারামের দোকানে। টিনের শেডের সামনেটায় তাড়াতাড়ি একখান বেঞ্চি এগিয়ে দিলে ফেলারাম। বললে, আসুন, আসুন, আসতে আজ্ঞে হোক। ওরে বেটা বাবুয়া, জলদি দুখানা কাপ-ডিশ বের কর।

বাবুভেয়ে খদ্দের। মাটির ভাঁড় বা কাচের গেলাস এগিয়ে দিতে কেমন কেমন লাগে। এঁদের জন্যে তাই কাপ-ডিশের ব্যবস্থা। খাতির-যত্ন একটু করতে হয় বাবুদের। কোম্পানীর ধাওড়ায় বাস করতে হলে এঁদের একটু হাতে রাখাই দরকার।

গরম গরম চা দু কাপ ধরে দিলে ফেলারাম। ঘড়ইমশায় কাপ-ডিশটা বেঞ্চির একপাশে নামিয়ে রেখে বললেন, বসো বাবা, মৌতাতের মশলাটা

আগে বের করি।

পকেট থেকে বের করলেন আফিং-এর কৌটো। ছোট্টমত ডেলা একটা গোল পাকিয়ে মুখের মধ্যে ফেলে দিলেন ঘড়ইমশায়। চায়ের পিয়ালায় চুমুক দিতে দিতে চাইলেন একটু রোহিণীবাবুর দিকে, বললেন, এই কালামণির ঠেলায় পড়ে সকাল-বিকেল আসতে হয় ভায়া। বহুদিনের অভ্যাস, তাই ফেলারামের দোকানে এসে মৌতাতটা সেরে যেতে হয়। যত না আসি চায়ের নেশায়, বুঝলে কি না ভায়া, তার চেয়ে ঢের বেশি গরজ এই যে দেখছ—

আফিঙের কৌটোটা রোহিণীবাবুর সামনে একবার তুলে ধরলেন ঘড়ই-মশায়, বললেন আসতে হয় এই চণ্ডালের তাড়নায়।

রোহিণীবাবু ত [illegible]। ঘড়ইমশায় একটু সিরিয়াস হয়ে বললেন, এ হাসির কথা নয় হে ভাইজীবন, একেবারে খাঁটি কথাই বলছি, চণ্ডাল যাকে বলে। হয় মানুষের [illegible] চণ্ডাল বিপুল ত [illegible], আর চণ্ডাল অনেক কিছু। কিন্তু এই যে দেখছ নবনীলশ্যাম-অঙ্গ কালীবরণ বস্তুটি, এ হল একেবারে চণ্ডালের চণ্ডাল। এর খপ্পরে একবার যে পড়েছে সহজে আর রেহাই নাই তার।

ঘড়ইমশায় লোকটি বড় জমাট। তাদের কাছে যা হোক কিছু বক্তব্য একটা পেলেই হল, সঙ্গে সঙ্গে জমিয়ে তোলেন মজলিশটি। রোহিণীবাবু হেসে বললেন, কদ্দিন থেকে চলছে এটি আপনার?

একটুখানি ভেবে বললেন ঘড়ইমশায়, তা ভাইজীবন, হল অনেকদিন। সেই যে বছর সারদা আইন পাশ হল দেশে, চারিদিকে শুধু বিয়ের হিড়িক, অর্থাৎ কিনা সন ১৩৩৬ সাল ছাব্বিশে আষাঢ়।

সেইদিন থেকেই ত বিয়ে করলেন বুঝি?

—আরে না না, আফিং ধরতে যাব কেন, বিয়ে হল আমার ছাব্বিশে আষাঢ় তারিখে। আর ওই জ[illegible]র সামন্তদের বাড়িতে বিয়ে করাই আমার কাল হল।

রোহিণীবাবু একটু উৎসুক হয়ে উঠলেন। বিয়ে করা বা না করার সঙ্গে অহিফেনের সম্পর্কটা এমন কিছু অচ্ছেদ্য নয়। তাহলে আর বিয়ে করাটা কাল হয় কেমন করে।

তেলেভাজার কড়াটা উনুন থেকে নামিয়ে এগিয়ে এল ফেলারাম। হাত জোড় করে বললে, গরম গরম দু-চারখানা আলুর চপ দিব নাকি বাবুমশায়দের?

রোহিণীবাবু তাকালেন একবার ঘড়ইমশায়ের দিকে, প্রশ্ন করলেন,

খাবেন নাকি।

ঘড়ুইমশায় সায় দিয়ে বললেন,—আপত্তি কি, চলতে পারে দু-একখানা। তেলেভাজাটা মন্দ করে না ফেলারাম, ভালই লাগে বর্ষার দিনে।

শালপাতার ঠোঙায় করে গরম গরম কয়েকখানা আলুর চপ ধরে দিয়ে গেল ফেলারাম। অহিফেনের কৌটোটার উপর তর্জনীর একটা টোকা মেরে শুরু করলেন আবার ঘড়ুইমশায়, আমার ঠিক বিয়ের পর বেশ কিছুদিন ভুগেছিলাম আমাশয়ে। ডাক্তারবদ্যি ওষুধপত্রে বিশেষ কোন ফল হল না। হঠাৎ আমার শ্বশুরমশায় একদিন কি বলে উঠলেন জান। বললেন, বাবাজী এক কাজ করতে পার, আফিঙ খাও না একটু করে। দেখবে তোমার ওই পেটের অসুখ বাপ বাপ করে পালাবার আর পথ পাবে না। ছিটে-কয়েক খাওয়ালেন বেশ যত্ন করে, তাঁরই নিজের কৌটো থেকে। তাঁর কন্যাসহ বাড়ি ফিরলাম যেদিন, নিজেই তিনি বাড়িয়ে দিলেন মালঠাসা এই কৌটোটি জামাইবাবাজীর হাতে। উনি আবার গাঁজা-আফিঙের ভেণ্ডার ছিলেন কিনা, দোকান ছিল নিজের বাড়িতেই।

রোহিণীবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, তাই নাকি?

জবাব দিলেন ঘড়ুইমশায়, তবে আর বলছি কি। তারপর ছাই শোন না। সেখান থেকে আসবার সময় পই পই করে বলে দিলেন—কিছুদিন যেন এটা কন্টিনিউ করি। ডিসপেপসিয়ার নাকি অব্যর্থ মহৌষধ এই বস্তুটি, একথা তিনি জোর করেই বললেন।

রোহিণীবাবু আলুর চপে একটা কামড় দিয়ে বললেন, এতেই আপনার সেরে গেল?

সায় দিয়ে বলে উঠলেন ঘড়ুইমশায়—সেরে গেল, গুরুজনের বেদবাক্য ফলে গেল মাসখানেকের মধ্যেই। কিন্তু মুশকিল হল কি জান, ইনিই আমার রক্ষক হয়ে শেষকালটায় ভক্ষক হয়ে উঠলেন, পড়ে গেলাম মফিয়ার নেশায়। মৌতাতের ঠিক সময়টি হলেই হাই উঠতে থাকে।

রোহিণীবাবু একটু বিস্মিত হয়ে বললেন, বলেন কি, আফিঙ না খেলে হাই ওঠে নাকি?

সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন ঘড়ুইমশায়, তবে আর বলছি কি। আরে সেই জন্যেই তো আজও এটা ছাড়তে পারিনি। চলছিল তাও বিনা পয়সায়, শ্বশুরমশায় নিজে যদ্দিন বেঁচে ছিলেন। এর ছেদ পড়ল কখন জান, বছর তিনেক পর। মারাত্মক একরমের লিভারের অসুখে ভুগে ভুগে শ্বশুরমশায় শেষ

পর্যন্ত মারা পড়ে গেলেন। গাঁজা-আফিঙের দোকানটাও তাঁর উঠে গেল সঙ্গে সঙ্গে। হয়ে গেল, শ্বশুর-জামাই সম্পর্ক সেইদিন থেকেই খতম।

সেও একটা কথা বটে। দোকানটা যখন উঠেই গেল, সম্পর্ক আর থাকে কেমন করে। রোহিণীবাবু বলে উঠলেন, তারপর?

—তারপর আর কি, সেই থেকেই টান পড়ল গাঁটের কড়িতে। চলছে আজও কায়ক্লেশে। এই মাগ্‌গীগণ্ডার বাজারে এই যে একটা রীতিমত ফালতু খরচ, এর কোন মানে হয় না ভায়া? কিন্তু ওই যে বললাম চণ্ডাল! ন্যাংটো করে তোমার পরনের কাপড়খানা যদি খুলেও নিতে হয়, তাতেও ওর কোন আপত্তি নেই। ঘাটের কড়ি ও যেমন করেই হোক আদায় করে নেবেই। বোঝ এখন ঠেলাটা।

বলতে বলতে নিজের মনেই একবার হেসে উঠলেন ঘড়ইমশায়। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললেন, সেইজন্যই তো মাঝে মাঝে তোমার বৌদির কাছে রহস্য করে বলি যে আমিরী এই মৌতাতটি শ্বশুরমশায় আমায় মরবার আগে উইল করে দিয়ে গেছেন। শৌখিন তাঁর আফিঙের এই কৌটোটি সমেত।

হো হো করে এবার হেসে উঠলেন ঘড়ইমশায় আর রোহিণীবাবু দুজনেই। হাতঘড়ির দিকে তাকালেন একবার রোহিণীবাবু। সিটির সময় হয়ে আসছে। গোলাপশশীর মিঠেখিলি মুখে দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন দুজনেই।

ডাইকমিস্ত্রী আলতাব মিয়া। ট্রাম লাইনের ঠিকাদার। পাথর কাটা আর ঠিকাদারি দুটোই চলে আলতাবের, যখন যেটায় সুবিধা। চা খাচ্ছে একধারে বসে। সঙ্গে কয়েকজন ভাই-বেরাদার, কারমাটারের গ্যাং। খাদের নীচে কয়লা কাটে এরা। কেউ কেউ বা পাথর কাটে, কেউ বা করে টালোয়ানি। এগিয়ে এল ফেলারাম আলতাবের সামনে, বললে, তোর কাছে যে আমার একটা আরজি আছে ভাতিজা!

তাকাল একবার আলতাব মিয়া ফেলারামের দিকে। আরজিটা সঙ্গে সঙ্গে পেশ করে দিলে ফেলারাম, বললে, টাকা-পাঁচেক প্রায় বাকি পড়ে গেছে সোনাই মালতের, কিছুতেই আর আদায় করতে পারছি না। দিতে পারিস পয়সা ক'টা আমার কোন রকমে আদায় করে।

ক্ষুণ্ণ হল একটু আলতাব মিয়া। সোনাই মিয়া তার দলের লোক। হাটে বাজারে যার তার সঙ্গে এইভাবে সে চোট্টামি করে বেড়াবে, এটা আলতাব ভাল বোঝে না। বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, ধার দিতে গেলে কেনে খুড়ো,

ওসব বাজে লোককে ধার হাওলাত দিতে যাও কেনে ?

ফেলারাম একটু আমতা আমতা করে বললে, ওইখানেই একটু ভুল করে ফেলেছি বাপ, ছাখ্ যদি কোনরকমে আদায় করে দিতে পারিস।

আলতার একটু ক্ষুব্ধ হয়ে বললে, ও বেটা আমার কারমাটারের নাম ডোবাবে। ওকে আমি চিনি যে, এক নম্বর ছ্যাচড। তা আমি না হয় বলে দিব চ'চা। পয়সা তোমার মারতে পারবে না সোনাই মালতে, এতখানি বেইমানি ও করতে পারবে না।

সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল ফেলারাম, আরে না না—সে কি কথা, মুসলমান জাত কি বেইমানি করতে পারে, খোদাতালার খপ্পরে পড়ে যাবেক যে। তবে হ্যা, বেইমান যদি বললে ভাইজ সে আমাদের হিঁদু।

চেটিয়া বারান্দায় এক মস্ত তিলকধারী রামকিষণ মিশির বসেছিল একপাশে। সেদিক পানে দৃষ্টি পড়তেই তাড়াতাড়ি আবার বলে উঠল ফেলারাম, হিঁদু মানে বুঝলে কিনা মিশিরজী আমাদের বাঙালী হিঁদুর কথাই বলছি। বেইমান যাকে বলতে হয়।

সিগারেট কিনতে এসেছিলেন স্যুটপরা এক বরিশালীয় সেনবাবু। ওপাশ থেকে টিপ্পনি কাটলেন, ঠিক বলছে ফেলারাম বেইমান যদি বলতে হয় তো সে আমাদের বঙ্গবাসী হিঁদু খাঁটি কথাই বলেছ।

বিজকে উঠল ফেলারাম সেনবাবুকে দেখে। কথাটি একটু ঘুরিয়ে নিয়ে বললে, তা যা বলেছেন, হিঁদু মানেই হিঁদু। আবার তাও বলি সেনবাবু, ওর মধ্যে একটু ভেদ আছে। বাঙালবাবুদের মধ্যে কই ও দোষটি দেখান দেখি একদম খুঁজে পাবেন না। বেইমান যদি বলতে হয় তো সে আমাদের ঘটী বলুন সেনবাবু, মিছা বলছি ?

সেনবাবু একটু হেসে বললেন, তোমার ওই ঘটী আর বাঙাল দুই-ই সমান, এপিঠ আর ওপিঠ। এখন শুধু বাদ পড়ল আলতার মিয়া আর রামকিষণ মিশির। কি বল ভাই আলতার ?

আলতার একটু হেসে বললে, কি যে আপনি বলেন সেনবাবু ?

ওদিক থেকে মিশিরজী হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়েছে ফেলারামের অবস্থাটা দেখে। আস্ত ঘটী ফেলারাম নিজেও এবার হেসে উঠল হি হি করে। তামাশাটা মন্দ হল না।

আলতার মিয়া একটা পানের খিলি মুখে দিয়ে উঠে পড়ল সেনবাবুর পিছু পিছু।

তিলকধারী রামকিষণ মিশির। লোকটা বেশ সুবিধে নয়, এক নম্বর বকধার্মিক। আড়চোখে একবার তাকাল ফেলারাম। ঠিক তাই, টুলখানা এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে বসে পড়েছে গোলাপীর একেবারে গা ঘেঁষে। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে ওর মুখের দিকে।

রইল পড়ে হাতের কাজ। এগিয়ে গেল ফেলারাম। মুখখানা একটু গোঁজ করে বলে উঠল, বলি কি মিশিরজী, চা-টা তুমি খাবে কিছু?

জবাব দিলে রামকিষণ মিশির, আরে নেহি ভেইয়া, চা-উ হম বিলকুল পি লিয়া ডেরামে। সিরিফ থোড়া চুনাকা ওয়াস্তে—

একটু ঝাঁজ মিশিয়ে বলে উঠল ফেলারাম, তা চুনাকা বাস্তে এসেছ তো চুনা লেকে জলদি জলদি চলা যাও। জেনানা লোকের এত নজদিগমে বৈঠতা কাহে, থোড়া হটকে বৈঠো।

তিলকধারী মিশিরজী বত্রিশ পাটি দাঁত বার করে হেসে উঠল একবার খামোখাই। বললে, হাঁ হাঁ, ও বাতভি ঠিক আছে। লেকিন থোড়া চুনাকা ওয়াস্তে—

বাঁ হাতের চেটোর উপর খইনি একটু গুঁড়িয়ে নিলে মিশিরজী। একটুখানি চুন মিশিয়ে ডলতে ডলতে সরে পড়ল ফেলারামের সামনে থেকে। ফিরে একটু তাকাল ফেলারাম গোলাপীর দিকে। একটুখানি চোখ তেড়ে বললে, আর তোরই বা কি রকম আক্কেলটা বল দেখি গোলাপী। ওই পরদেশী আদমীটার সঙ্গে এত কিসের আদিখ্যেতা তোর।

ফোঁস করে উঠল গোলাপী। ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে উঠল, আ মরণ, আমি কি ওকে ডাকতে গেছি নাকি? খদ্দের মানুষ কাছে এসে বসল, তা আমি কি করব! মর্দানার সঙ্গে কোমর বেঁধে লড়তে যাব নাকি?

—তোর আস্কারা পেয়েই তো এই সময় রোজ খইনি খেতে আসে লোকটা। একটি দিন ও না এলে পান সাজতে মন উঠে না তোর। মতলবটা কিন্তুক্ ভাল না তোর গোলাপী।

—কি বললি, কি বললি মুখপোড়া মিন্সে, মতলবটা ভাল না! দেখবি তবে মতলবটা? মুখে তোর নুড়ো জেলে দিয়ে রাতারাতি কটক চলে যাব। বুঝবি তখন মজাটা।

তড়পে উঠল গোলাপী। ফেলারাম কিন্তু ঘাবড়াল না গোলাপীর এই মুখঝামটা খেয়েও। বললে, কটকে তোর চোদ্দপুরুষের কোন্ নানা আছে—সে আমার জানতে কিছু বাকি নেই। চালচুলো কিছু থাকলে তো! কটক

যাওয়ার ভয় আর আমাকে দেখাস না গোলাপী, ও আমার ঢের দেখা আছে।

খদ্দের লেগেছে দোকানে। গোলাপী তাই আপাতত চুপ করে গেল। কাচের ফুটো গেলাস ভাঙলে বাবুয়া। হাত ফসকে ঝন ঝন শব্দে গড়িয়ে পড়ল কলতলার শানে [illegible]। দাঁত খিঁচিয়ে এগিয়ে গেল ফেলারাম, বললে, তুই বেটা আমার ফতুর করবি দেখছি। এই নিয়ে বলি হল কটা, বল দেখি একবার হিসেব করে?

বাবুয়া একটু কাঁচুমাচু হয়ে বলে এখিমে গির গিয়া।

খিঁচিয়ে উঠল ফেলারাম, এখিমে যে গির গিয়া, তো গির গিয়াটা কাহে। মারব শালাকে এমন এক থাপ্পড় —

জলকলের ফিটারমিস্ত্রী বাউরী মুখুজ্যে এসে পড়ল। তাই ফুটো দাঁতে খিঁচুনির উপর দিয়েই কোন রকমে রেহাই পেয়ে গেল বাবুয়া। বাউরী মুখুজ্যে ফেলারামের বাঁধা খদ্দের। আসলে তার নামটা যে কি—অনেকেরই জানা নেই। লেখা আছে হয়তো কোম্পানীর খাতায়। বাইরে কিন্তু সকলেই তাকে বাউরী মুখুজ্যে বলেই জানে। বাউরী শব্দটি আগযোগ, আসলে কিন্তু মুখুজ্যে। বাউরী নিয়ে ঢের দিন থেকে ঘরকন্না করছে, লোকে বলে তাই বাউরী মুখুজ্যে। মুখুজ্যে কিন্তু রাগে না, শুনে শুনে অভ্যাস হয়ে গেছে। কদমডাঙা কলিয়ারির সবাই জানে তিন নম্বর পিটের জলকলের ফিটারমিস্ত্রী ওই বাউরী মুখুজ্যে। ওর বৌটার নাম হল কাজললতা বাউরান।

বাউরী মুখুজ্যে আজ একা আসে নি দোকানে। সঙ্গে আছে কাজলী, ওরফে কাজললতা। সাথে আছে তার ছোট বন বাতাসী। ধরমপুরের খসলা বাউরীও সঙ্গে এসেছে—বাতাসীর মরদ। বাউরী মুখুজ্যের নতুন শাড়ুভাই।

লোহার একটা ডাণ্ডা দিয়ে উনুনের নিচে খোঁচা দিচ্ছিল ফেলারাম। বাউরী মুখুজ্যে এগিয়ে গিয়ে বললে আমার হিসেবটা একবার দেখ দেখি ফেলারাম খুড়ো, পেছলিগা আজ জমা করে লাও।

ফেলারাম একটু উৎসাহিত হয়ে বলে উঠল, এই যে বাপধন, দেখে দিচ্ছি খাতাটা। হিসেব তোমার ধরাই আছে।

কলিয়ারির কতকগুলো ডেসপ্যাচ ফর্ম দিয়ে খাতা একটা গেঁথে নিয়েছে ফেলারাম। বাকিবকেয়ার হিসেবগুলো টুকে রাখে এতেই। পাতা উল্টে বলে উঠল, এই যে—এই যে তোমার গতমাসের হিসেব, হিং শ্রীবাউরীচরণ মুখোপাধ্যায়। মোট বাকী বারো টাকা সাত আনা তিন পয়সা।

বাউরী মুখুজ্যে বাড়িয়ে দিলে টাকা ক'টা, বললে, জমা করে লাও। আর

লিখ দেখি আজকের এই জিনিস কটা—টানার মেঠাই আড়াই সের, পেঁয়াজ বড়া পাঁচপো, সের দশেক মুড়ি, আর পোয়া আড়াইয়েক বাতাসা।

ফেলারাম নোট করে নিলে জিনিসগুলো হিসেবের খাতায়। কলমটা এক পাশে নামিয়ে রেখে বললে—আজ এত সব কিসের বাপধন, পালপার্বণ আছে নাকি কিছু?

জবাব দিলে বাউরী মুখুজ্যে, কাজলীর ঘরে ভাদুপুজোর জাগরণ যে।

সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে উঠল ফেলারাম, ঠিক ঠিক, ভাদুপুজোর জাগরণই তো বটে। ভাদ্রমাসের সংক্রান্তি যে আজ।

বাউরী মুখুজ্যে একটু হেসে বললে, ও ছাড়া সবে একটা কুটুম এসেছে, বাতাসীর নতুন বর। আমার শালীটার যে গেল মাসে সাঙা দিয়ে দিলোম, শোন নি বুঝি তুমি!

জবাব দিলে ফেলারাম, কই না তো, সাঙা আবার হল কখন? ওর বিয়ের খবরটাই তো জানা ছিল এতদিন।

মুখুজ্যে বললে, ভেস্তে গেছে বেবাক, ওদের আবার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল যে। মাস তিনেকের মধ্যেই কুড়মীদের একটা মেয়েকে নিয়ে ভেগেছে যে ছোঁড়াটা।

চোখ দুটো হঠাৎ কপালে উঠল ফেলারামের, বললে, সে কি বাপধন, এ তুমি কি বলছ। একেবারে ভেগেই গেল, তাও কিনা একটা কুমড়ীর মেয়ে নিয়ে! কলিতে আর জাতজন্ম রইল না কিছু।

জাতজন্ম আর থাকে কেমন করে? কালটা যে ঘোর কলি। ব্রাহ্মণসন্তান ফেলারাম চক্রবর্তী সে কথা বলতে পারে বইকি। বাউরী মুখুজ্যের কথাটা তো আর উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

হিসেব রাখার খাতাখানার দিকে উঁকি মেরে চাইলে একটু বাউরী মুখুজ্যে। বললে, লেখো আরও কটা জিনিস, মিঠে খিলি পঞ্চাশটা, নাগর বিড়ি পাঁচ বাণ্ডিল, মাচিশ লেখো তিনটে, আর সাকিট তিনেক কাঁইচি।

এগিয়ে এল কাজলী আর বাতাসা। জিনিসগুলো সব কায়দা করে সাজিয়ে নিলে ডালার মধ্যে। শুধু সিগারেট আর দেশলাইটা খাকি রঙের ফুলপ্যান্টের পকেটের মধ্যে ঠেসে নিলে বাউরী মুখুজ্যে।

দোকান থেকে ওরা বেরোবার সময় ফ্যালফ্যাল করে খানিক চেয়ে রইল ফেলারাম। মুখুজ্যের শালীটা যে দিদির চেয়েও এক কাঠি উপরে। রূপ আর যৌবন ফেটে পড়ছে যেন। খাপরার আগুন। এ আগুন কি খড়চাপা

দিয়ে ঢেকে রাখা যায়, সাঙা দিয়ে ভালই করেছে মুখুজ্যে।

কয়লাখাদে ভোঁয়া পড়ল। মগবাতি হাতে ঝুলিয়ে মালকাটারা খাদ থেকে সব একে একে উঠে আসছে। জমল কিছু ফেলারামের দোকানে। কোম্পানীর বুড়ো দারোয়ান অমৃৎ সিং ফোকটে এক কাপ চা খেতে ঢুকল। আপ্যায়িত করে বসালে ফেলারাম। খাতির একটু করতে হয়, বহুদিনের পুরনো লোক কিনা।

মেঠাই কিনতে ঢুকল এসে ফুলটুশি কামিন। কাজ করে সাইডিং-এ, মালগাড়িতে কয়লা বোঝাই দেয়। নিজের হাতে ঝোড়া অবশ্য ধরতে হয় না ফুলটুশিকে, কয়লা বোঝাই আপনি হয়ে যায়। হপ্তায় হপ্তায় ঠিকাদারের অফিসে গিয়ে হাজরিটা শুধু গুনে আনতে হয়। কয়লার কালি মাখে না বড় ফুলটুশি। এই কদমডাঙা কলিয়ারির ব্রহ্মডাঙায় শুকনো গাছে ফুল ফোটানোই কাজ তার।

আনা আষ্টেকের মেঠাই কিনে দাম দিবার সময় কাঁচমাচু করতে লাগল ফুলটুশি। বললে, ধার রইল, লেখে রাখো।

ফেলারাম ঘোর আপত্তি জানিয়ে বললে, ধার আমি তোকে দিতে পারব না। তুই শালীর কাছে পয়সা আদায় করা এক ঝকমারি ব্যাপার।

ফুলটুশি একটু চোখ তেড়ে বললে, ওই, অমন কথা বলছ কেনে ঠাকুর। তোমার কত টাকা ডুবাই দিয়েছি।

ফেলারাম বললে, ডুবাস নাই, দেখ দেখি একটু খেয়াল করে? সেই মনসা পূজোর দিন যে সাড়ে ছ আনার জিনিস নিয়ে গেলি, আজ পর্যন্ত শোধ দিয়েছিস?

ফুলটুশি একটু চোখ তেড়ে বললে, ই বাবা রে, সাড়ে ছ আনা কোথা পেলে ঠাকুর, চার আনা বল।

খেঁকিয়ে উঠল ফেলারাম, ওই দ্যাখ, এই জন্যেই তো ধার দিতে চাই না। খাতায় আমার পষ্ট লেখা আছে—শ্রীমতী ফুলটুশি কামিন, ছ আনা দু পয়সা। চার আনা তুই বললেই হবে।

ফুলটুশি বলে উঠল, লেখা আছে তো লিবে, একসঙ্গেই জুড়ে লিয়ো সব।

ফেলারাম কিন্তু রাজী হল না। বললে, সেটি হবেক নাই। আট গণ্ডা পয়সা এইখানে ফ্যাল আগে, আর তা না হলে মেঠাইগুলো ফেরত দিয়ে যা। ধার আমি আর দিব নাই তোকে।

মুখ টিপে টিপে হাসছে ফুলটুশি। এদিক-ওদিক তাকিলে একবার।

দারোয়ান বুড়োকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, দেখেছ—দেখছ নানা, বলে মেঠাইগুলো ফেরত দিয়ে যা। মেঠাই আমি থোড়াই ফেরত দিব। বল নানা —তুমিই বল, এই কি একটা কথার মতন কথা হল ?

ফুলটুশির কাজলটানা আঁখ দুটো নানাজীকে চিমটি কাটছে যেন। রসিয়ে উঠল দারোয়ানজী ফুলটুশির বাক্যি শুনে। ফেলারামকে লক্ষ্য করে বললে, আরে ছোড় ভেইয়া ছোড়, হঠাও হিঁয়াসে ঝুটমুট ঝামেলা।

ট্যাঁক থেকে একটা চকচকে আট-আনি বের করে ফেলারামের দিকে ছুঁড়ে দিলে অমৃৎ সিং।

দারোয়ানজীর একেবারে নজদিগমে দাঁড়াল গিয়ে ফুলটুশি। মুচকি একটু হেসে বললে, কি মানটাই যে আজ রাখলে নানা, সে আর কি বলব। গোড হাতগুলো টিপে দিব খানিক ?

দারোয়ানজী চোখ বাঁকিয়ে চাইলে একটু ফুলটুশির দিকে। চাপা গলায় একটু হেসে বললে, সইন্‌ঝা বেলা যাস না একটিবার হামার ডেবামে, কয়লা একঝোড়া দিয়ে আসবি।

—সন্ধ্যেবেলা ? কয়লা এক ঝোড়া চাই নাকি ? তা দিনের বেলা গেলে চলবে না. ঠিক যে সময় তোমার দলবলরা সব নাস্তা করতে আসে !

—আরে না না, ঠিক সামকো টাইম। থোড়া আঁধিয়ার হবে তব্ না।

ফুলটুশি একটু তেরচা সুরে বললে—কেনে বল দেখি নানা, এই ফোগলা দাঁত আর চেঁদো মাথায় আঁধিয়ার নিয়ে কি করবে। ভেবেছ একটা আধুলি ছুঁড়ে দিয়ে ফুলটুশির যৈবনটা কিনে ফেললোম. না ? সে গুড়ে বালি নানা, সে গুড়ে বালি।

ঝটিতি একটা লেফট টার্ন মেরে ঈষৎ একটু পাছা দুলিয়ে হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেল ফুলটুশি। দারোয়ানজী নিজের মনেই চাপা গলায় একবার গর্জে উঠল, শ—শালী কঁাহাকা।

কালিচরণ মালকাটা এসে পথ আগলে দাঁড়িয়ে গেছে ফুলটুশির। গদ গদ হয়ে বলে উঠল কালিচরণ, বহুদিন পর নাগরী এলে, দেখা না হইত পরাণ গেলে। বলি এ্যাদ্দিন কোথায় ছিলে সোনার চাঁদ ?

কবিয়ালের সাকরেদ ছিল কালি। ছড়া কাটতে ভালই জানে। পুনরায় একটু সুর টেনে বললে, বলি হঠাৎ এত হন্‌হনিয়ে চললে কোথা মানিক ?

ফুলটুশি একটু মুখ বেঁকিয়ে বললে, আমার কালিয়া বঁধুর কুঞ্জে, কালিচরণ মালকাটার পিণ্ডি চটকাতে। ছাড় মুখপোড়া পথ ছাড়, ভাদু গাইতে যাব

দেখনহাসির ধাওড়ায়।

কালিচরণ লুফে নিলে কথাটা, বললে, আমাদের একটু না শুনিয়েই চলে যাবে সখি? এত গরব কিসের গরবিনী, বদন তুলে এইখানেই না হয় একটুখানি গুড়ুক খেয়ে গেলে। ধরে ফেল—ধরে ফেল একটা ভাদুর গান।

ফিক করে হেসে উঠল ফুলটুশি। বললে, তাহলে এক ভাঁড় চা খাওয়াই দে।

আলবাৎ, এ কথা পারে কে শোনে। চা এক ভাঁড় খেতে হবে বইকি। সঙ্গে সঙ্গে অর্ডার দিয়ে দিলে কালিচরণ।

ফুলটুশির গান শুনবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছে অন্যান্য কুলিকামিনরাও। চা খেয়ে গলাটা একটু ভিজিয়ে নিলে ফুলটুশি। বসালো দেখে ধরলে একটা হাল-ফ্যাশানের ভাদুর গান—

মান করে থেকো না ভাদু বদন তুলে চাও,
ভাদু বদন তুলে চাও।
লেপটে বাঁধা লোটন খোঁপা গাল ভরে পান খাও
ভাদু বদন তুলে চাও।

পাশেই একটা পড়েছিল [illegible] -ফাটা এলুমিনিয়মের ডেকচি। কোলের কাছে টেনে নিয়ে সঙ্গত ক[illegible] শুরু করে দিলে কালিচরণ।

ফুলটুশির গলাটা বেশ মিষ্টি। ভাদুর গানে জমিয়ে ফেললে চটপট। হেঁকে উঠল এক ট্রামলাইনের টালোয়ান বলিহারি যাই, কেয়াবাত।

কালিচরণ ছাড়লে একটা লবজ, মরি হায় হায় হায়।

[illegible] গানের পরের কলি—

গোর [illegible] [illegible] [illegible],
সা[illegible] [illegible] [illegible] খানি থলি,
ও [illegible] [illegible] যে ওই ময়ূরপঙ্খী [illegible]।
ভাদু ব[illegible]ন তুলে চাও॥

ওপাশ থেকে বয়ান কানে পিয়ারা সিং, পাঞ্জাবী এক ড্রাইভার, ট্রাক চালায় কোম্পানীর। [illegible] নেমে বলে উঠল, স[illegible] সাব থোড়া নাচভি তো দেখলা দেও ফুলটুশি দিদি।

গাইতে গাইতে এগিয়ে গেল ফুলটুশি, আমার ইনাম, ইনাম ছোড় সর্দারজী, এক পাকিট কাঁচি সিগারেট।

ইনাম মঞ্জুর। সিগারেট এক প্যাকেট ধরিয়ে দিলে পিয়ারা সিং ফুলটুশির হাতে। শুরু হয়ে গেল গানের সঙ্গে ফুলটুশির নাচ। গান চলছে—

ভাদু লো তোর নাগর এলো—
ও গরবী নয়ন মেলো,
আদর করে বসাও খাটে চুম দিয়ে ঘুম যাও।
ভাদু বদন তুলে চাও॥

হাততালি আর হুল্লোড়ের চোটে ফেটে পড়ল ফেলারামের চায়ের দোকান। আসর একেবারে মাত করে ছেড়ে দিলে ফুলটুশি। গান শেষ করে হাসতে হাসতে বিদেয় হয়ে গেল। মজলিসটা যেন কানা হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। বেরোবার ঠিক মোড়টায় ষাঁড়ের মত শিঙ উঁচিয়ে মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে দারোয়ানজী, ফুলটুশির আট-আনি মনসবদার নানাসাহেব নিজে। আঁচলটা হঠাৎ ফুলটুশির চেপে ধরলে দারোয়ানজী। বললে, এই হারামজাদী, শোন্।

ফিরে দাঁড়াল ফুলটুশি। চোখে একঝলক বিজলি হেনে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ছাড়ো, নানা ছাড়ো, কয়লা দিতে যেতে হবেক ছোটসায়েবের বাংলায়। ওদিকে আবার আঁধিয়ার হয়ে এল যে।

হাতের মুঠোয় ধরা সিগারেটের আস্ত প্যাকেটটা ধাঁ করে নানাসাহেবের মুখের উপর ছুঁড়ে মারলে ফুলটুশি। হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেল দারোয়ানজীর নাকের ডগা দিয়ে।

মাটির উপর ছিটকে পড়েছে ফুলটুশির ইনামটা। ফ্যালফ্যাল করে প্যাকেটটার দিকে তাকাল একবার নানাসাহেব। চোখ দুটো পাকল করে নিজের মনেই গর্জে উঠল আর এক দফা, শ—শালী কাঁহাকা।

চারিদিক থেকে হো হো শব্দে উঠল একটা হাসির রোল। দূর থেকে হঠাৎ ভেসে উঠল জোর একটা পিলে-চমকানো আওয়াজ, ইনক্লাব—জিন্দাবাদ।

কলিয়ারির কতকগুলো কুলিকামিন মালকাটা একসঙ্গে সব দল বেঁধে হৈ হৈ করে এগিয়ে আসছে। একজনের মাথার উপর ডাকসাজ দিয়ে সাজানো টাটকা তৈরি একটা কালীপ্রতিমা। জিভ বের করা খাঁড়াধরা রণরঙ্গিণী শ্যামা। ভক্তের দল গোঁ ধরেছে কালীপূজো করতে হবে কলিয়ারিতে। চারিদিকে নানা দুর্লক্ষণ, অপদেবতার কোপদৃষ্টি; ভূত লেগেছে কদমডাঙার খাদে। কালীপূজো করতে হবে তাই খাদমোহানে। তাড়াতে হবে

ভূতগুলোকে কলিয়ারি থেকে। কোম্পানীর কাছে দরখাস্ত করা হয়েছিল অনুমতির জন্য, আর সেই সঙ্গে কিছু আর্থিক সাহায্যের জন্যও। তাতে কোন ফল হয় নি। ইনচার্জবাবু ফালি ফালি করে ছিঁড়ে ফেলেছেন দরখাস্তখানা। অগত্যা এই যুদ্ধং দেহি মিছিলের ব্যবস্থা। শব্দরূপী ব্রহ্ম কর্ণভেদী গণকণ্ঠে ব্রহ্মাস্ত্র হয়ে ককাচ্ছেন, ইনক্লাব—জিন্দাবাদ।

শোভাযাত্রা পরিচালনা করছে খেপচুরিয়াস দুখারাম আঁকড়ে। ঝাণ্ডা ধরে আছে জহুর পালোয়ান, দু নম্বর পিটের আধপাগলা একটা মালকাটা। বটতলার সামনে এসে থমকে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল লোকগুলো। শ্লোগান চলছে গলা ফাটিয়ে।

ফেলারামের দোকান থেকে তাড়াতাড়ি একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স এনে রাস্তার উপর পেতে দিলে একজন। উঠে পড়ল খেপচুরিয়াস দুখীরাম। শুরু হয়ে গেল বক্তৃতা: মেরে দোস্তো ভাই সব, পাশের গাঁয়ের কলিয়ারিতে কিছুদিন থেকে যে ভৌতিক কাণ্ড শুরু হয়েছে, সে খবর তোমরা শুনেছ নিশ্চয়ই। এও হয়ত শুনে থাকবে যে খাতপালিতে খাদের নীচে কাজ করবার সময় জন দুই তিন বিলাসপুরীর ঘাড় মটকেছে [illegible] ভূতে। আর একটা লোক মুখে হঠাৎ রক্ত উঠে বেঠাওকা মারা গেল সেদিন কানেপুরের হাসপাতালে গিয়ে, তাও বোধ করি শোনা আছে তোমাদের—

জনতার মধ্যে থেকে বলে উঠল কুলিবাওড়ার একজন: ও লোকটা খাদের নীচে জলকুলির কাজ করত সদার।

উঠে দাঁড়াল অপর একজন বললে, জলকুলি নয়, চালোয়ান, খাদের উপর ট্রামলাইনে চালোয়ানি করত।

তাও হতে পারে। মতভেদটা এমন কিছু গুরুতর নয়। হয় জলকুলি নয় চালোয়ান, হয় আণ্ডারগ্রাউণ্ড নয় সারফেস।

সন্দেহটা কাটিয়ে দিলে মূলবক্তা দুখারাম নিজেই। বললে, জলকুলির কাজ অবশ্য মাঝে মাঝে করত লোকটা, মাঝে মাঝে আবার চালোয়ানিও করত। কিন্তু সে কথা আমাদের মকাবিলার কোন দরকার নাই। মুখে হঠাৎ রক্ত উঠে মানুষ বেটা মরে গেছে, বস। সেটাই হল আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় কথা। এই সমস্ত ভূত-যামদের উপদ্রবের বিবরণ নিজের কানে তোমরা শুনছ কিনা বল।

হেঁকে উঠল জহুর পালোয়ান: ওসব আমাদের বিলকুল শোনা আছে। ভূত নেমেছে রামপুরের কলিয়ারিতে। দাঁত খিঁচিয়ে ভয় দেখায়

মালকাটাদের। আচমকা এসে পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দেয় পিছন দিক থেকে। শনিবার আর মঙ্গলবার রাত্তির ঠিক দুপুর নাগাদ নাকি সুড়ে গায়েন গায় সুড়ুং-এর মধ্যে।

শুরু করলে আবার দুখীরাম, তা হলেই বোঝ সব। সেই ভূত শেষে তাড়াতে হল কিনা খাদমোয়ানে কালীপূজো করে। গোটা পাঁচ-সাত ভেগেছে, আছে এখনো দু-একটা। কিন্তু ধরমপুরের সেই কালীখেদানো ভূতগুলো সব গেল কোথায় জান?

জবাব দিলে এক এক মালকাটা যাবেক আবার কোন চুলোয়, আছে হয়তো কাছাকাছি কুথাও।

বলে উঠল দুখীরাম, বিলকুল এসে ঢুকে পড়েছে এই কদমডাঙার খাদে। পূব-রাওড়ার মালকাটারা নিজের চোখে দেখেছে সেদিন। কালো ধুমধুমে চেহারা, মেয়েমানুষের শাড়ি পরে সুড়ুং-এর মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

ফোড়ন কাটলে জগুর পালোয়ান, খুব সম্ভব ওটা মার্দা ভূত সর্দার। শরীলের তার ছায়া পড়তে দেখা যায় নি, পায়ের পাঞ্জা দুটো ছিল উল্টো দিকে ঘোড়ানো।

দুখীরাম বললে, তা হলেই বোঝ। মায়ের পূজো না করলে কারো বাপের সাধ্যি আছে ওদের তাড়ায়?

বলে উঠল শংকর ডোম, কালীপূজো আমাদের করতেই হবেক সর্দার। মা কালী হলো চামুণ্ডা। ভূত তো ভূত ওদের বাপ চোদ্দপুরুষকে পর্যন্ত শুয়োরতাড়া করে ছেড়ে দিবেক দেখলি যা।

দুখীরাম হাত দুটো নিজের কপালে ঠেকালে কয়বার কপালে। হেঁকে উঠল জোর গলায়, জয় মা কালী, মাগো।

চারদিকে রব উঠল, কালীমায়ী কি জয়।

সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ দিলে আর একটা দল বোলো বোলো—বোলো বোলো বজরংবালী কি জয়।

বললে দুখীরাম, বড়ই আপসোসের কথা ভাইসব, কোম্পানী আমাদের [illegible] ফেলেছে। বলে ভূত আবার আছে নাকি, কালীপূজো না ভেঁদু। [illegible] কিন্তুক পেছু হঠলে চলবেক নাই ভাইসব, পূজো আমাদের করতেই হবেক। কয়লাখাদে খাটতে এসে ভূতের সামনে জানটা আমাদের এগিয়ে দিতে লারবো।

ঝাণ্ডা উঁচিয়ে তড়পে উঠল আরো একজন, কোম্পানী যদি হুকুম না দেয়

খাদমোয়ানে কালীপূজো করতে, তাহলে আমরা ইস্‌টাইক করব। দিব আমরা বিলকুল সব কয়লা কাটা বন্ধ করে। কেমন করে ওরা খাদ চালায় চালাক।

চারদিক থেকে রব উঠল, কালীমায়ীকি জয়।

. বক্তৃতা বেশ জমে উঠেছে। মনযোগ দিয়ে শুনছে অনেকেই। কেউ কেউ আবার দাঁত বের করে হাসছে। ফেলারাম চক্রবর্তী পাশে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিল এতক্ষণ। একটুখানি এগিয়ে এসে বললে, বলি হ্যাঁরে দুখীরাম, এত যে তোরা তড়পাচ্ছিস, কোম্পানী কি শুনবেক তোদের কথা?

জবাব দিলে আনন্দী কামিন, শুনবেক নাই তো কি বেটে কি, তাহলে আমরা ইউনাইন করেছি কিসকে? খ্যাংরা মেরে কোম্পানীর বিষ ঝেড়ে দিব না! বল মোড়ল, কি বলছিলে বল তুমি, বুক ঠুকে নেকচার দাও।

হেঁকে উঠল দুখীরাম, তাহলে ওই কথা রইল ভাইসব, দাবি আমাদের না মানলে শেষতক ওই ইস্‌টাইক। কয়লা কাটা আমরা বন্ধ করে দিব। লাগাও নারা জোরসে—

—ইনকেলাব…

—জিন্দাবাদ।

কোম্পানির জুলুম…

—চলবে না—চলবে না।

. —পূজোর দাবি…

—মানতে হবে—মানতে হবে।

—দুনিয়ার মজদুর…

—এক হো—এক হো।

কলিয়ারির ম্যানেজার মিঃ পানিগ্রাহী ইনচার্জবাবুর কাছ থেকে খবরটা শুনেই হো হো করে হেসে উঠলেন একচোট। ধরমপুরের খাদে নাকি ভূত লেগেছে। টেলিফোনের রিসিভারটা কানের কাছে তুলে ধরলেন ম্যানেজার সাহেব, হ্যালো মিঃ ডাট, পানিগ্রাহী স্পিকিং। দেয়ার ইজ এ স্ট্রং রিউমার দ্যাট ইওর কলিয়ারি ইজ হাণ্টেড বাই গোষ্টস্! ইজ ইট? এ্যাঁ—কি বললেন, গোষ্টস্ আর দি রিউমারিষ্টস্ দেমসেল্‌ভস্! আই সী।

হো হো করে আর একদফা হেসে উঠলেন ম্যানেজার সাহেব।

• কোম্পানীর অফিসে গিয়ে আলটিমেটামটা দিয়ে আসা দরকার। এগিয়ে চলল ইনক্লাবের দল। মাথায় আছেন মা দিগম্বরী স্বয়ং। সঙ্গে আছে ঢোল

কাঁসি। চারদিক থেকে চিৎকার উঠল, কালীমায়ীকি জয়।

মনের আবেগে গান ধরে দিলে দুখীরাম আঁকুড়ে:

ও মা দিগম্বরী নাচ গো শ্যামা রণমাঝে।
ও মা দিগম্বরী—

কাঠি পড়ল ঢাকেঢোলে। মায়ের নামে ডঙ্কা দিয়ে একসঙ্গে সব শুরু করলে বঙ্গবাসীর শাশ্বত এক জাতীয় সঙ্গীত:

নাচ গো নাচ গো শ্যামা নাচ গো।
ও মা দিগম্বরী নাচ গো শ্যামা রণমাঝে॥
আল্‌তা পায়ে সোনার নূপুর বাজে গো।
ও মা দিগম্বরী নাচ গো শ্যামা রণমাঝে॥

এগিয়ে চলল জয়-মা কালীর দল। পূজো হয়তো পরে হবে। বিসর্জনের অনুষ্ঠানটা আগেভাগেই শুরু হয়ে গেল, ওমা দিগম্বরী নাচ গো—।

চারিদিকে হঠাৎ শন শন শব্দ। আকাশে ঘোর মেঘ করেছে। বৃষ্টি নামল মুষলধারে। সেইসঙ্গে এলোপাতাড়ি ঝড়। ঝড় নয়, যেন সাইক্লোন। শোভাযাত্রার দলকে কোম্পানীর অফিস পর্যন্ত আর যেতে হল না। উদ্দাম সেই ঘনঘটার মধ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল কে কোন্ দিকে। বাহকের মাথায় ভর দিয়ে মা জগদম্বাও মরি-বাঁচি করে ছুটতে আরম্ভ করেছেন। আলতা পায়ে সোনার নূপুর বাজাবার আর ফুরসত পেলেন না। আপাতত যে কোন একটা ধাওড়ায় গিয়ে একটুখানি আশ্রয় পেলেই বাঁচেন।

ঝেঁপে এল বৃষ্টিটা। লহমার মধ্যে জনশূন্য হয়ে গেল ফেলারামের বটতলা। ঝাঁপ পড়ে গেল কদমডাঙা রেস্টুরেন্টের সামনেটায়।

॥ ২ ॥

কদমডাঙা গ্রামখানা খুব বড নয়। কয়েক ঘর সদ্গোপ, পাঁচ-সাত ঘর মুসলমান, ঘর তিনেক কুমোর, আর বাউরীদের একটা পাড়া নিয়ে এই গ্রাম। গাঁয়ের লাগাও পূবপ্রান্তে রেললাইনের ধার ঘেঁষে কদমডাঙার খাদ। বর্তমানে খাদটাই তার আসল পরিচয়, গ্রামটা কারো চোখে পড়ে না। কলিয়ারি পত্তনের ঢের আগে থেকই টেঁকে আছে কিন্তু গ্রামখানা। এই গাঁয়েরই দু-এক পুরুষ আগের যারা বাসিন্দা, নিজের চোখেই দেখে গেছে কেমন করে এই

কদমডাঙার হাজার বিঘার ডাঙাটা জলের দরে বন্দোবস্ত হয়ে গেল সাহেব কোম্পানীর নামে। বোরিং হল, বয়লার বসল, মা বসুমতীর বুক ফুঁড়ে মাটির নীচে থেকে উঠে এল কালো কুচকুচে ফুল কয়লার চাঙড়। আশপাশাড়ী চাষের জমি একে একে গ্রাস করলে ওই কলিয়ারি। বন্ধ হল রাস্তাঘাট। তৈরি হল সাহেব-সুবোর বাংলা, কুলি-কামিনদের ধাওড়া, তৈরি হল রেল কোম্পানীর সাইডিং। প্রথম এল ইংরেজ, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরবর্তী পরগাছা। কয়লার সেরা ফুল কয়লা, দুধের একেবারে সরটুকু তুলে নিয়ে সরে পড়ল ইস্তফা দিয়ে। বয়ে নিয়ে গেল থলেয় ভরে কয়েক কোটি ভারতীয় মুদ্রা। এল গুজরাট, এল কচ্ছ, এল পাঞ্জাব। তার পর এল কোলকাতিয়া এক বঙ্গবাসী। সুবিধে হল না কারবারে, ফেল মেরে গেল কিছুদিনের মধ্যেই। শেষ কালটার মাড়োয়ার এসে ঘাঁটি গাড়লে কদমডাঙার খাদে। কোলকাত্তী সেই বাংগালীবাবুর কাছ থেকে আধ কড়েতে সম্পত্তিটা খরিদ করে নিলে হংসেশ্বর চেটিয়া এণ্ড কোম্পানী। চলছে আজও কলিয়ারি ওই নামেই। মুনাফা হয়তো হয় কিছু। বাজে লোকেরা গেয়ে বেড়ায় অন্যকথা। তারা বলে কোম্পানী নাকি এই থেকেই লাল হয়ে গেল, বছর কয়েকের মধ্যেই।

কদমডাঙা গ্রামখানা এই কলিয়ারির ধারাবাহিক ইতিহাসের চাক্ষুষ সাক্ষী। সাক্ষী অবশ্য নামেই, সে কথার কোন দাম নাই আজ। জমজমাট এই কলিয়ারিটাব পাশে গ্রামখানা আজ মূর্তিমান এক অনাবশ্যক। কোম্পানির একটা কুলি-ধাওড়ার মর্যাদা এর চেয়ে আজ অনেক বেশি।

তবু কিন্তু টিঁকে আছে গ্রামখানা। এর বাসিন্দাদের চোখে স্বপ্ন হয়েই টিঁকে আছে আজও। সাতপুরুষের মাটির মায়া এদের কাছে আজও মিথ্যে হয়ে যায় নি। গাঁয়ের মাঝখানে সদ্গোপদের লক্ষ্মীঘরের আটচালায় ছোট-খাটো একটা পাঠশালা বসে। বাঁশ-বাগানের ওপাশটায় শেখসাহেবদের ইদ্‌গাতলা। বাউরীপাড়ার মেহনতী মানুষগুলো মা মনসার সিঁদুরলেপা বেদীটা তালবাকড়োর ছাউনি দিয়ে যেমন করে হোক টেঁকিয়ে রেখেছে আজও। শ্রাবণ মাসে পূজো হয় বেশ ঘটা করে। ভাদ্রমাসে ভাদু-উৎসব। সারাটা মাস চলতে থাকে ভাদু-গানের হুল্লোড়। উৎসবটা প্রধানত মেয়েদের। মরদগুলো শুধু ঢোল কাঁসিটা বাজিয়ে দেয় ভাদু গানের সঙ্গে। হুল্লোড় অবশ্য তারাও কিছু কম করে না।

পাড়ার মধ্যে কাজলীর বাড়ি ভাদুপূজোর সমারোহটা কিছু বেশি। খরচ-

খরচা ভালই করে বাউরী মুখুজ্যে। কোম্পানীর ফিটার মিস্ত্রী, হাতে-কলমে কাজজানা মানুষ, রোজগার নেহাত মন্দ করে না। কাজলীর সাধ-আহ্লাদ খুঁটিনাটি ফায়-ফরমাসটা মেটাতে খরচাও বেশ ভালই করে মুখুজ্যে। সেদিক থেকে কিছুমাত্র কার্পণ্য নেই। কাজলীকে ঠিক বিয়ে করা বৌয়ের মতই পরম যত্নে রেখে দিয়েছে। খাদে তাকে খাটতে পর্যন্ত যেতে দেয় না। ছেলে একটি হয়েছে মুখুজ্যের, মা-ষষ্ঠীর দয়া। বছর পাঁচেক বয়স হল বাচ্ছার। দেখতে ঠিক মুখুজ্যের মতই।

কাজলী ছিল পাড়ার সেরা রূপসী। লক্ষ্য পড়েছিল অনেকেরই কাজলীর ওপর। এমন কি খনি অঞ্চলের তথাকথিক ভদ্রশ্রেণীর জনকয়েক রসবিদগ্ধ কাপ্তেন-ব্যক্তির পর্যন্ত মতিভ্রম প্রায় ঘটে এসেছিল রূপবতীর উজ্জ্বলন্ত যৌবনের জৌলুসে। কাজলী কিন্তু পাত্তা দেয় নি কাউকে। ধরা পড়ল শেষে জলকলের ফিটার মিস্ত্রী মুখুজ্যেবাবুর ফাঁদে। অকূলে যেন কূল পেয়ে গেল মুখুজ্যে।

গোড়ার দিকে আপত্তি একটু উঠেছিল কাজলীর সঙ্গে মুখুজ্যের এই অবাঞ্ছিত মেলামেশা নিয়ে। বাউরীপাড়ার মাতব্বররা খুলেই একদিন বললে শেষে মুখুজ্যেকে, এ রকমটি আর চলবে না মুখুজ্যেবাবু। হয় তুমি কাজলীর সঙ্গে পাকাপাকি একটা ব্যবস্থা করে লাও, আর তা না যখন তখন এইভাবে আর পাড়ায় এসে ঢুকো না। এতে আমাদের মান-ইজ্জতের হানি আছে।

নিজের ইজ্জত বজায় রাখতে ব্যবস্থা একটা শেষ পর্যন্ত করতেই হল মুখুজ্যেকে। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলা খাদ থেকে ডিউটি করে ঢুকল এসে বাউরীপাড়ায়। কাজলীর হেঁসেল থেকে ভাত-তরকারি চেয়ে খেলে। পরের দিন সকালবেলা উঠে দেখা গেল রাতারাতি সিঁথিভরতি ডগডগে সিঁদুর পরেছে কাজলী। দু হাতে দুটো ঢাকাই শাঁখা, বাঁ হাতে একটা এয়োস্ত্রীর নোয়া পর্যন্ত।

কলিয়ারির আস্তানা ভেঙে বাকসো-প্যাঁটরা তুলে এনে স্থায়ীভাবেই রয়ে গেল মুখুজ্যেবাবু বাউরীপাড়ায় ডেরা বেঁধে। মাটির একটা ঘর তুলে নিলে কাজলীর চালাঘরের পাশে। চারিদিকে দেওয়াল তুলে গেরস্থালি আবরু করে নিলে। কেউ কেউ বললে, বাউরী হয়ে গেল মুখুজ্যেবাবু, কাজলীকে বিয়ে করেছে কি না। কেউ কেউ আবার উল্টো কথাও বলতে লাগল, কাজলী বোধ হয় বামুন হয়ে গেল, মুখুজ্যেবাবুর বৌ হল যে কাজলী। বয়ঃপ্রবীণ মাতব্বরদের কারো কারো আবার মন্তব্য একটু ভিন্ন রকমের। তাঁরা বলেন, ইয়াও হয়, উয়াও হয়।

কি যে হয় আর কি যে হয় না—সে সব কথা অনেক দূরে। আপাতত নতুন কিছু হল একটা। এখন থেকে মুখুজ্যে আর শুধু মুখুজ্যে রইল না, নাম হয়ে গেল বাউরী মুখুজ্যে।

ভাদ্রমাসের সংক্রান্তি। ভাদুপূজোর জাগরণ-রাত্রি। দুর্যোগ চলছে সন্ধ্যা থেকেই। মুষলধারে বৃষ্টি আর ঝড়ো হাওয়ার বিরাম নেই। ভাদু-জাগরণের উৎসবটা এবার বুঝি মাঠে মারা গেল। বাউরীপাড়া নিঝুম মেরে গেছে। ভাদুপূজোর ব্যবস্থাদি করা হয়েছে সবই, নাচগান আর হুল্লোড়ের রাত্রি আজ। ঢোলে কিন্তু চাঁটি পড়ে নি কারো। ভাদু-প্রতিমার সামনে কেরোসিনের লম্ফ জেলে দোপাটি আর সন্ধ্যামণি ফুল দিয়ে প্রথমরাতের পূজোটা কোন রকমে সব সেরে নিয়েছে। তার পর থেকেই ডামাডোল। ঝড়ো হাওয়ার ঝাপটা এসে লম্ফগুলো একে একে নিবিয়ে দিয়ে গেল। কারো কারো বাড়িতে লণ্ঠন দু-একখানা জ্বলছে এখনো, উৎসবটা কিন্তু মিইয়ে গেছে। জল পড়ছে চাল ফুটে, তাই নিয়ে সব সামাল দিতে ব্যস্ত। কেউ কেউ বা বসে আছে ভাদুর মাথায় ছাতা ধরে, জল পেয়ে পাছে রঙ বিগড়ে যায়। এঁটেল মাটির তৈরি ভাদু, গলে গড়তেই বা কতক্ষণ।

ঝড়-বৃষ্টি থেমে এল ঘণ্টা দুয়েক পর। ফিকে চাঁদের ঈষৎ একটু মলিন আভা ফুটে উঠল পূব আকাশের কোলে। মিটি মিটি দু-একটা তারাও যেন মাঝে মাঝে উঁকি মারছে। পাড়াটা এতক্ষণ নিঝুম মেরে গিয়েছিল একেবারেই। জনমানিষ্যির সাড়া জাগল একটু একটু করে। উঠানের উপর জল জমে গেছে বিস্তর। কোদাল দিয়ে শুরু করলে সব এদিক-ওদিক নালি কাড়তে। জল কিছুটা নিকাশ হয়ে গেল, সদর কুলিয় নয়ানজুলি দিয়ে। ঘরে ঘরে আবার জ্বলে উঠল টিবটিব আলোগুলো। হোক বাদল, হোক দুর্যোগ, ভাদুপূজোর জাগরণটা তো কোন রকমে সারতেই হবে।

কাজলী গিয়ে মুখুজ্যের ঘরে ঢুকল। বললে, গ্যাসবাতিটা একবার জেলে দাও কেনে। এবার আমরা ভাদু গাইব।

এক ঢেলা কারবাইট পুরে গ্যাসবাতিটা জেলে দিলে মুখুজ্যে। কাজলী গিয়ে চালাঘরের বারান্দায় ভাদুর সামনে নামিয়ে দিলে আলোটা। ঝলমল করে উঠল প্রতিমার ঠাট, চুমকি দেওয়া ডাকসাজগুলো ঝলকে উঠল গ্যাসবাতির আলোয়। শুরু হয়ে গেল মেয়েদের ভাদু উৎসব। চাঁটি পড়ল ঢোলকে।

কাজলীর বোন বাতাসী সাজগোজ করে বসে আছে কখন থেকে। আজ যে তাকে নাচতে হবে ভাদুগানের আসরে। পূজো-আচ্চা শেষ হতেই যেটুকখানি দেরি। ঢুকল গিয়ে বাতাসী বাউরী মুখুজ্যের ঘরে। বললে, ঘর থেকে একবার বেরোও কেনে জামাইদাদা, ভাদুমায়ের ভোগ দিতে হবেক নাই!

চৌকির উপর বসে বসে টুলের উপর একটা লণ্ঠন রেখে ভবপিতার ঝুমুর সঙ্গীত পাঠ করছিল বাউরী মুখুজ্যে। মুখ ফেরালে বাতাসীর সাড়া পেয়ে। রসিকতা করে বলে উঠল বাতাসীকে দেখে, সাজগোজের এত বাহার কিসের লো, চোখ দুটো যে ঝলসে দিলি একেবারে। চোখে কাজল, কপালে টিপ, খোঁপায় গোঁজা রঙ-বেরঙের দোপাটি। খসলা বাউরীর মুণ্ডুটা যে ঘুরে যাবেক দেখে।

বাতাসী একটু লজ্জা পেলে বুঝি। সুর টেনে বলে উঠল, কি যে তুমি কর জামাইদাদা। এখন উঠবে তো উঠ, আর তা না হলে চললোম আমি।

বাতাসী হঠাৎ পিছন ফিরতেই ডান হাতটা তার খপ করে চেপে ধরলে মুখুজ্যে। বললে, শোন শালী, শোন। তোকে দেখে কি মনে হচ্ছে জানিস, মনে হচ্ছে খসলার সঙ্গে বো পালটা-পালটি করে নিলে কেমন হয়। ঠকব না জিতব তাই বল দেখি।

হি হি করে হেসে উঠল মুখুজ্যে। হ্যাঁচকা টানে হাতটা হঠাৎ ছাড়িয়ে নিয়ে হন হন করে সরে পড়ল বাতাসী। যেতে যেতে আর একটিবার পিছন ফিরে তাড়া দিয়ে গেল, ভোগটা এবার তাড়াতাড়ি দিয়ে দিবে এসো।

ভোগটা তো মুখুজ্যেকে দিতেই হবে। ঠাকুর দেবতার পূজো-আচ্চা বা ভোগ চড়াবার অধিকার সবচেয়ে যে তারই এখানে বেশি। গলায় একগাছা পৈতে এখনো ঝুলছে মুখুজ্যের।

মুখুজ্যের পো তুলতুল এসে ঘরে ঢুকল। বছর পাঁচেক বয়স ছেলেটার। ঢুকতে ঢুকতেই হাঁক দিলে একটা, বাবা হে।

দরজার দিকে তাকালে একবার মুখুজ্যে। তুলতুল এসে হাত ধরে একটা টান দিয়ে বললে, ভুগ দিয়ে দিবি না বাবা, মা যে তোকে হাঁকছে।

উঠতে হল মুখুজ্যেকে। তুলতুলের হাত ধরে বেরিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। দেখতে বেশ চমৎকার মুখুজ্যের এই ছেলেটা। নাদুসনুদুস চেহারা, নধর কচি টুকটুকে মুখখানা। মাথার উপর চূড়ো করে চুলগুলো বেশ পরিপাটি করে বাধা। চুড়োর উপর বেলফুলের মালা একটা নিজের হাতে জড়িয়ে দিয়েছে

কাজলী। ওর হাতে একটা মেঠাই দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বসিয়ে দিলে, দেখতে লাগবে ঠিক যেন একটি নাড়ুগোপাল। রঙটা অবশ্য মুখুজ্যের মতই ফরসা।

মুখুজ্যে এসে তাড়াতাড়ি বসে পড়ল পূজোর আসনে। বললে, দে দে— জলের বটিটা এগিয়ে দে, আচমনটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলি। ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু।

কাজলী বললে, ওমা একি, হাত পাগুলো ধুয়ে এস আগে, তার পর না পূজোয় বসবে।

তাই তো, মুখুজ্যের একটু ভুল হয়ে গেল যে।

হি হি করে হেসে উঠল বাতাসী, বললে, ই আবার কেমন পুরুত গো, সব যে ভুলে বসে আছ জামাইদাদা।

মুখুজ্যে একটা দাবড়ি দিলে, তুই চুপ কর শালী, পূজো-আচ্চার জানিস কি তুই?

জানে না এরা কেউ কিছুই, কথাটা খুব সত্যি। তবু কিন্তু উঠতে হল মুখুজ্যেকে, এক পাঁজভর কাদা ভেঙে উঠান বেয়ে ছুটতে হল কুয়োতলা পর্যন্ত। হাত-পা ধুয়ে বসল এসে আসনে। ঘটি থেকে এক আঁজলা জল নিয়ে আচমন শুরু করলে—'ওঁ অপবিত্র পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতপি বা। য স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তর শুচি'। ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু। শ্রীহরি, শ্রীহরি, শ্রীহরি'।

মন্ত্রগুলো কিছু কিছু এখনও মনে আছে মুখুজ্যের। লেগে গেল আজ ভাদু-পূজোর অনুষ্ঠানে। গলায় আঁচল দিয়ে হাত জোড় করে মুখুজ্যের পাশে বসে আছে কাজলী। অন্যান্য সকলেই এ সময়টা কেমন যেন একটু তটস্থ হয়ে উঠল। বামুনের ছেলে পূজো য বসে মন্ত্র পড়ছে কিনা।

ভোগ-নৈবেদ্যের থালাগুলোর উপর গোটা কয়েক ফুল ছুঁড়ে দিলে মুখুজ্যে। শুরু করলে আবার স্তব করে, ওঁ ফলমূলানি সোপকরণানি ভাদুমণি দেব্যায় নমঃ। টানা মেঠাই মিষ্টান্নানি ভাদুমণি দেব্যায় নমঃ। এটা আবার কি এখানে, তালবড়া নাকি। ওঁ গোলাকৃতি চক্রাণি তালবড়ানি ভাদুমণি দেব্যায় নমঃ। ওঁ গোধূমচর্ণ পক্কানি গুড় পায়সানি ভাদুমণি দেব্যায় নমঃ। আর কি আছে, আছে আর কিছু। শাঁখ কই, শাঁখ?

শাঁখটা তাড়াতাড়ি এগিয়ে দিলে কাজলী। শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ভোগপর্ব সমাপ্ত। শেষ হয়ে গেল পূজো। হৈ-হৈ করে শুরু হল প্রসাদ বিতরণ। তারপরই বসে গেল ভাদুর আসর। আর এক দফা কোমর বেঁধে লেগে

পড়ল সব ভাদু গাইতে। এবার শুধু নাচ গান হুল্লোড়। এ হুল্লোড আর থামবে না সাড়াটি রাত। ভাদুপূজোর জাগরণ যে আজ।

কাজলী গিয়ে চালাঘরের ভিতর থেকে ধরে নিয়ে এল নতুন জামাই খসলাকে। বসিয়ে দিলে মজলিসের মাঝখানে। গান-বাজনা করতে হবে এই মজলিসে বসে। ওদিক থেকে বাতাসীকে টানতে টানতে নিয়ে এল পাড়ার একটা মেয়ে। বসিয়ে দিলে খসলার পাশে। শুরু হয়ে গেল ভাদুর গান, মেয়েদের সমবেত কণ্ঠে—

নমো নমো নমো ভাদু নমো তোমার চরণে।
কাল পূজেছি সাদা ফুলে আজকে তো নীল বরণে॥
নমো নমো নমো ভাদু—

পাড়ার একটা ভাদুগানের সম্প্রদায় মাগীমদ্দ মিলিয়ে হৈ-হৈ করে ঢুকে পড়ল এসে। শাটি বৌয়ের দল এটা, ভাদুগানের পাল্লা দিতে এসেছে। উঠান থেকেই সাড়া দিলে শাটি বৌ, কই গো মুখুজ্যে-গিন্নী, ভাদু পরবের ইলেম কিছু পাব নাকি।

এগিয়ে এসে আপ্যায়িত করে বসালে ওদের কাজলী। ভাদু গাইতে বসে পড়ল সব ঢাক-ঢোলক নিয়ে। প্রথম হল প্রসাদবিলি। সেই সঙ্গে একটা ঢোলকের সঙ্গত। তার কিছুক্ষণ পরেই বেরিয়ে এল পচুই মদের ভাঁড়টা, সঙ্গে কিছু পেঁয়াজবড়ার চাট। সামাজিক প্রথা, আপ্যায়িত একটু করতে হয় পরবদিনে। খেলে অনেকেই মদের ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে। নতুন জামাই খসলাও এই ফুরসতে চোঁ চোঁ করে টেনে নিলে খানিক। মেয়েদের মধ্যেও কেউ টেনলে দু-এক বাটি, ঘোমটার আড়ে ওরই মধ্যে একটু আবরু দিয়ে। গান ধরলে শাটি বৌয়ের দল—

চল ভাদু চল খেলতে যাব রাণীগঞ্জের বড়তলা।
অমনি পথে দেখাই আনব কয়লাখাদের জল তোলা॥

তাক ডুমাডুম তাং কুডকুড—তাক ডুমাড়ুম তাং কুডকুড—লহর উঠচে ঢোলকে।

কাজলীর দল ধরলে একটা কলি, গিয়ে পড়ল আর এক লাইনে। পাল্লা যখন দিতে হবে শাটি বৌয়ের সঙ্গে, সেই লাইনেই চলুক তবে ভাদুর গান ধরলে একজন সুর করে—

বান এল ভারতী এল ভেসে এল পুইমাচা।
পুইমাচাটি উল্টে দেখ শাটির ভাদুর নাক বোঁচা॥

হো হো করে হেসে উঠল কাজলীর দল।

জবাব দিলে শাটি বৌয়ের ভাইনের দোঁহার—

আমার ভাদু সোনামণি গলায় সোনার পেটি লো।
ওদের ভাদু গতরখাগী কাঠকুড়ানীর বেটী লো॥

এ ওর গায়ে ঢলে পড়ল, বেশ একচোট ঝেড়ে দিয়েছে। যেমন সওয়াল, তেমনি জবাব, কেমন এবার হল তো।

শাটি বৌয়ের ভাদুমণির নাকটা নাকি বোঁচা। এ কথা ওরা বলে কেমন করে। দুটো ভাদুই এক মিস্ত্রীর তৈরি যে। ডাক সেজেছে একই মালকার। তবু যারা মিথ্যে করে রটায় এমন কথা, তাদের ভাদু গতরখাগী তো বটেই, তার উপর সে কাঠকুড়ানীর বেটী ছাড়া আর কি। কাজলীর ভাদু যাক এইবার কাঠ কুড়োতে, বুঝুক একবার ঠেলাটা।

ঢোল বাজছে, তাক ডুমাডুম তাং কুড়কুড়, তাক ডুমাডুম তাং কুড়কুড়।

জমে উঠল ভাদুর মজলিশ। ঢোলে আর কাঁসিতে, ছোট্‌ঠাকুরের বাঁশিতে, আর ননদ-ভাজের হাসিতে আসর একদম মাত করে ছেড়ে দিলে শাটি বৌয়ের দল। ঢুলীটা ওদের মস্ত বড ওস্তাদ, নামকরা বাজনাদার। কাজলীর দলকে কোণঠাসা করে ছেড়ে দিলে ঢোল-বাজনার লহরে।

এদিক থেকে নাচতে উঠল বাতাসী। ওদের থেকে তৈরি অ... শাটি বৌয়ের ননদ। কিন্তু কাজলীর দল কি পাত্তা পাবে ওদের কাছে? এক। ওই ঢুলীটাই যে মাত করে ছেড়ে দেবে।

উঠতে হল একবার কাজলাকে। তাড়াতাড়ি গিয়ে ঢুকে পড়ল মুখুজ্যের ঘরে। ফটকে মদের বোতল খুলে নেশা করছে মুখুজ্যে। পটুই নড়তে চায় না। কাজলা গিয়ে তাড়া দিয়ে বললে, রাখো এবার বোতলটা। তাড়াতাড়ি একবার উঠে এস দেখি, নাচবে চল। ভাদুর আসরে। তুমি আজ একটু তবলা বাজাবে চল না গো।

পাশ ফিরে একটু তাকাল মুখুজ্যে। বললে, তবলা, তবলা আবার কিসকে।

নিশ্চিত স্বরে বলে উঠল কাজলী, তোমাকে আজ বাজাতেই হবেক তবলা, উঠ তুমি। তা না হলে শাটি বৌয়ের দলের কাছে আমরা হেরে যাব যে।

মুখুজ্যের মত পাকা বাজিয়ে থাকতে গান-বাজনায় হেরে যাবে কাজলীর দল। তা কখনো হতেই পাবে না। বাঁয়া-তবলাটা তাডাতাডি বের করে

নিয়ে এল কাজলী। উঠতে হলো মুখুজ্যেকে, বসল বিয়ে একপাশে। শুরু হল বাতাসীর নাচ, রুম-ঝুম শব্দে ঘুঙুর বেজে উঠল। মিঠে গলায় গান ধরলে বাতাসী—

চল্ ভাদু চল্ লো মেঘে এলো জল।
ভিজলো তোর ঢাকাই শাড়ি গেবে গেল মল।
চল্ ভাদু চল্ লো—

গান বাতসী ভালই গায়। নাচতে পারে তার চেয়েও ভাল। ময়ূরের মত পেখম তুলে হেসে দুলে নাচতে আরম্ভ করলে বাতাসী। সেই সঙ্গে তার জামাইদাদার তবলা। জমে গেল খুব চটপট। কয়েক মিনিটের মধ্যেই নাচে গানে হুল্লোড়ে আসর একেবারে ফেটে পড়ল যেন।

অবাক হয়ে চেয়ে আছে খসলা। বাতাসীর ঘুঙুরের তালে তালে দুলছে খসলার মনটা। তেহাই দিয়ে শেষ করলে মুখুজ্যে তবলার চাঁটি। খসলা বাউরীর বুকের উপর দিয়ে সাঁ করে যেন হাওয়াই জাহাজ উড়ে গেল একটা। যেমন নাচের লহর, তেমনি কিনা বলিহারি যাই সঙ্গতের চটক। তেহাই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘাম দিয়ে যেন জর ছুটে গেল।

শাটি বৌয়ের বায়েনটা হঠাৎ ঘাবড়ে গেল নাকি। মাথা হেঁট করে ভাবছে। এর পর তার তাক ডুমাডুম জমবে কি আর। ঢোলকটার ডাইনে বাঁয়ে টুং টাং শব্দে গোটা কয়েক আওয়াজ দিলে বায়েনটা। সুরটা একটু পরখ করে নিলে। বাজনার একটা নতুনতর লহর তাকে ছাড়তে হবে বইকি। তা না হলে নামটা যে আজ ডুবল। সামনের দিকে মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে কায়দা করে চেপে ধরলে ঢোলকটাকে। মরীয়া হয়ে দু হাত দিয়ে পেটাতে আরম্ভ করলে। গম্ভীর একটা আওয়াজ উঠল—গুড়-গুড়-গুড়-গুড়—

আসমানে গিয়ে ধাক্কা দিলে নাকি ঢোলকের চাঁটি! আওয়াজ উঠছে—গুড়-গুড়-গুড়-গুড়। ঝলকে উঠল বিদ্যুতের কশা। মেঘ ডাকছে গুড় গুড় শব্দে।

আগে থেকেই ঘোর করে ছিল আকাশটা। শন্ শন্ শব্দে আর একদফা এগিয়ে এল ঝড় হাওয়ার তাণ্ডব। লহমার মধ্যে বিপর্যস্ত করে দিলে ভদুগানের মজলিসটাকে। ঝলমলে গ্যাসবাতির আলোটা সোঁ-সোঁ করে একটু ডাক ছেড়ে নিবে গেল হঠাৎ। বৃষ্টি নামল আবার। একেবারে যেন চুপসে গেল আসরটা। নিঝুম মেরে গেল উৎসবমুখর ভাদুমণ্ডপ। শাটি বৌয়ের পিস্‌শাশুড়ী খেঁকিয়ে উঠল চাঁচা গলায়, ঐ যাঃ, নাবল আবার আঁটকুড়ীর

গ্যাবতা। ভাদুপুজোর জাগরণটা মাটি করে দিলেক গা।

আঁটকুড়ীর গ্যাবতা কিন্তু থামল না তাতেও। ঝেঁপে এল যেন তাড়া করে। হয়ে গেল ভাদুজাগানো। একে একে সব খসতে আরম্ভ করলে। শাটি বৌয়ের বায়েনটা গুড় গুড় শব্দে মল্লার রাগ ভেঁজে গেল কি না কে জানে। ঢোলক নিয়ে সরে পড়েছে আর সকলের আগে। কিছুক্ষণের মধ্যেই খালি হয়ে গেল জমজমাট মজলিসটা।

চালাঘরের সামনে নুনেচটের পর্দাটা ফেলে দিলে কাজলী। উঠে পড়ল মুখুজ্যে। বাঁয়া তবলাটা নিয়ে গিয়ে চৌকির নীচে রেখে দিলে একপাশে। চুপচাপ গিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানার ওপর। যা হয় তাই হোক গে, টেনে একটা ঘুম তো আগে দেওয়া যাক। কিছুক্ষণের মধ্যেই গিয়ে পড়ল কাজলী। ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলে দরজাটা। ঘুমন্ত তুলতুলকে চৌকির উপর শুইয়ে দিলে একপাশে।

চালাঘরের ভিতরদিকে শয্যা একটা পাতাই ছিল আগে। বাতাসীর হাত ধরে টানতে লাগল খাসলা। বর্ষাটা বেশ ভালই নেমেছে। তাড়াতাড়ি এবার হাত-পা গুটিয়ে শুয়ে পড়াই ভাল। বাতাসী একটু চাপা গলায় বললে, হাত ধরে এত টানছে কেনে, থাম আগে একটা পান খাই।

বর্ষণটা ঝেঁপে এল। মেঘবাদল কদিন থেকেই চলছিল একটু একটু। আজ যেন তার বাড়াবাড়িটা চরমে গিয়ে পৌঁছল। দুর্যোগ যাকে বলতে হয়। ঝড়বৃষ্টি থামবার কোন লক্ষণ নেই। এ যেন এক খণ্ডপ্রলয়ের সূচনা। দুনিয়াটাকে দুমড়ে চেপ্টে ভেঙেচুরে আজ ভাসিয়ে দিয়ে যাবে নাকি!

সেটা অবশ্য পরের কথা। আপাতত শেখ সাহেবদের পীর পুকুরটা ভেসেছে। ভেঙে গেছে তার পাড় একটা। পাড়ভাঙা পুকুরের জল হুড় হুড় শব্দে বয়ে যাচ্ছে সদ্গোপদের জোল জমির উপর দিয়ে। খবরটা হঠাৎ ছড়িয়ে পড়ল বাউরীপাড়ায়। পুকুরভরতি মাছগুলো সব বেরিয়ে পড়েছে। শোল মাগুর সিঙ্গি নেটা উজান বেয়ে সার দিয়ে সব উঠে পড়েছে ডাঙার দিকে। রুই মিড়িক কাতলা কালবাউস বড় বড় সব পুরনো মাছ, তাও কিছু কিছু ছিটকে পড়েছে এদিক ওদিক। এখন শুধু তালপাতার ছানি মাথায় দিয়ে ঘর থেকে একটু বেরিয়ে গিয়ে যত খুশি ধরতে পারলেই হয়। নিশপিশ করে উঠল যেন বাউরীপাড়ার লোকগুলো। চাপজাল আর পলুই নিয়ে, কেউ কেউ বা লাঠি-সোঁটা সড়কি হাতে বেরিয়ে পড়ল মাছ মারতে। বহুদিন পর আজ একটা মাছশিকারের বড়রকম মওকা পাওয়া গেছে। ছাতা ছানি আলো

বাতি নিয়ে, কেউ কেউ বা না নিয়েই, রাতদুপুরে হৈ-হৈ করে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে।

কাজলী এখনো ঘুমোয় নি। মুখুজ্যেকে একটা ঠেলা দিয়ে বললে, ওগো, বলি শুনছ, পীর পুকুরটা ভেসে গেল যে।

ঘুম চটে গেল মুখুজ্যের। চোখ বুজেই বলে উঠল, ভাসল তো কি হবেক কি, পীর আপনার বুঝবেক। তুই আপনার ঘুমো কেনে।

কাজলী বললে, টর্চবাতিটা হাতে নিয়ে খানিক ঘুরে আসবে নাকি, মাছ যদি দু-একটা পাওয়া যেত।

এসব কাজে কাতর মুখুজ্যে। জবাব দিলে নির্লিপ্তভাবে, মাছের কোন দরকার নাই। তার চেয়ে খানিক আরাম করে ঘুমো।

নিশ্চিন্তে আবার পাশ ফিরে শুলো মুখুজ্যে।

পাশের ঘরে গুন্ গুন্ করে গান চলছে বাতাসীর। মাঝে মাঝে শিস্ দিচ্ছে খসলা। উপচে উঠছে হাসি খুশি রঙ তামাশার ঢেউ। নতুন বিয়ে, নতুন সুখ, নতুন নতুন রসের কথা। এ-ঘর থেকে মুখ টিপে টিপে হাসছে কাজলী।

ভোরের দিকে ধরে গেল বৃষ্টিটা। ভাদু ভাসানের শোভাযাত্রা বেরিয়েছে ঢাকঢোলক বাজিয়ে। নাচে গানে হুল্লোড়ে গাঁয়ের কুলি গুলজার।

সিটি বাজল কদমডাঙার খাদে। খাকী রঙের প্যাণ্ট আর মিলিটারি হাফসার্টটা গায়ে দিয়ে কাজে বেরুল বাউরী মুখুজ্যে। মোটা চামড়ার বুট দুটো ঝুলিয়ে নিলে বাঁ হাতে। পথ-ঘাট সব ভরে গেছে কাদায়। খাদে নামবার আগে পা দুটো বেশ ভাল করে ধুয়ে জুতো জোড়া পরে নিলেই চলবে।

আজকের দিনটা শ্বশুরবাড়ি মোকাম দিয়ে কাল একেবারে বৌ নিয়ে বাড়ি ফিরবে খাসলা। আজ একটিবার যেতে হবে বাজারে। বৌয়ের জন্য শাড়ি চাই একখানা। বাতাসীকে বেশ একটু সাজিয়ে-গুজিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বিয়ের পর এই প্রথম যাবে শ্বশুরবাড়ি, পাড়ায় ঘরে দেখতে আসবে অনেকেই ; সাজ-সজ্জার চটক একটু চাই বই কি। নিন্দের কাজ খসলা বাউরী করবে না। বেশ ভাল দেখে নক্‌শাপাড় শাড়ি একখানা কিনতেই হবে। সেই সঙ্গে কিছু তেল সাবান, মাথার কাঁটা, আর বেলোয়ারি চুড়ি কয়েকগাছা। ধরমপুরের ঠিকাদারবাবুর তরপে কয়লার ডিপোয় কাজ করে খসলা। রোজগার সে এমন কিছু মন্দ করে না। বাতাসীর সাধ-আহ্লাদ মেটাবার

মত হিম্মত তার আছে। বাতাসীকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে বড়বাজার পর্যন্ত। নিজের চোখে দেখে শুনে শাড়িখানা পছন্দ করে কিনে নিয়ে আসবে।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই চা একবাটি খেয়ে নিলে খসলা। আকাশটা কিছু ফরসা হয়েছে। এইবেলা গিয়ে হাটবাজারটা সেরে আসাই ভাল। কোমরের গেঁজেটা একটু আলগা করে টাকাগুলো আর একদফা গুনে নিলে খসলা। ঠিক আছে, সিকে কম বাইশ টাকা ঠিকই আছে।

বাতাসী এসে দোরের সামনে উঁকিঝুঁকি মারছে। উঠে পড়ল খসলা। যেতে হবে সেই আসানসোলের বড়বাজার পর্যন্ত। হাঁটতে হবে মাইল চার পাঁচ। একটু সকাল সকাল বেরিয়ে পড়াই ভাল।

বাতাসীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল খসলা। রেল লাইনের ধার দিয়ে হেঁটে চলল দুজনে। মাঠ ঘাট সব ভরে গেছে জলে। উত্তর দিক থেকে গাড়ুই নদীর বান এসে টাঁস মারছে রেল লাইনের পাড়টায়। গাড়ুই নদী নামেই শুধু নদী, আসলে ওটা ছোট্ট একটা কাঁদর; তিন ড্যাঙে পার হওয়া যায়। হঠাৎ তার আজ একি মূর্তি। চারিদিকে শুধু জল আর জল। ওটা আদৌ আছে কিনা কে জানে। খসলা একটু অবাক হয়ে বললে, গাড়ুই নদীটা কি হল বাতাসী, ওটাকে তো আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

বাতাসী একটু এদিক ওদিক লক্ষ্য করে বললে, বানের জলে ভেসে গেল হয়তো।

তাই হয়তো হবে। রাতারাতি বানের জলে ভেসেই গেল হয়তো। কোন দিকে তার এতটুকু চিহ্নমাত্র নেই। ডুবে গেছে নদীপাড়ের ঝোপ-ঝাড়গুলো পর্যন্ত। ডাঙাডহর নদীনালা খালবিল সব একাকার।

রেল লাইনের এ পারটায় ডোবার জলে জালি টেনে মাছ ধরছে কতকগুলো লোক। একধারে তার ভাসছে দুটো বকের ছানা, মারা পড়ে গেছে গত রাতের দুর্যোগে। গাঁয়ের যত গরু-বাছুর লাইন-ধারে গিয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ঠায়। ডাঙাডহরে ঘাস নেই, চরবে কোথায়? ডাঙাই নেই, তার ঘাস আসবে কোত্থেকে। চারিদিকে শুধু জল আর জল।

গাঁইতি ঝোড়া কাঁধে ফেলে খাদে যাচ্ছে রাঙাপাড়ার মালকাটারা। ওদের মুখেও ও ছাড়া আর কথা নেই। গল্প চলছে বানভাসির। ভোরের দিকে অজয় নদী ভেসেছে। বরাকর নদী ঠেলে দিয়েছে এ-কানা থেকে ও কানা। দামোদরের বানের তোড়ে রাতারাতি ভেঙে গেছে বার্ন কোম্পানীর পাম্পিং

স্টেশন, আর সেই সঙ্গে পাটমোহনা কলিয়ারির রেলওয়ে সাইডিংটা। অতিবর্ষার এতখানি দাপট বহুকাল নাকি এ অঞ্চলে দেখা যায় নি।

রেল লাইনের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলে উঠল বাতাসী, বরাবর এই লায়েনটা ধরে চলে গেলে কেমন হয়?

খসলা বললে, ঘুরট হবেক যে। এই ধানমাঠ কটো পার হলেই তো পাকি সড়প, আমরা এত ঘুরতে যাব কেনে।

তা অবশ্য ঠিক। মেঠো পথটাই সবচেয়ে সোজা। ডানহাতি মোড় ফিরে আল পথটা ধরে নিলে খসলা। মাঝে কয়েকটা ধান মাঠ। জল বইছে হড় শব্দে। মাঠ কটা পার হলেই পাকা সড়ক। ওখান থেকে একেবারে নাকের সোজা। ঘন্টাখানেক হেঁটে দিলেই ব্যস, সিধে একদম আসানসোলের বড়বাজার।

আলপথ ধরে এগিয়ে চলল দুজনে। খানিকটা দূর যেতেই আলের উপর জল হয়ে গেল হাঁটুর নীচে। ধান ক্ষেতের উপর দিয়ে জল বইছে খানা ডোবা উপচে। উৎসাহিত হয়ে উঠল খসলা। পিছন ফিরে তাকাল একবার, বললে, আলপথের উপর চবং চবং করে হাঁটতে কিন্তু বেশ লাগছে বাতাসী। আয় না একটু এগিয়ে, হাত-ধরাধরি করে একসঙ্গেই যাই।

মুখ টিপে একটু হাসলে বাতাসী, বললে, হাঁ, টানা-হেঁচড়ায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাই আর কি। এগোও তুমি, পিছু পিছু আমি ঠিক আসছি।

আলপথের উপর থামল একটু খসলা। দু হাত দিয়ে বাতাসীকে চেপে ধরলে হঠাৎ। ধাঁ করে তার গালের উপর খামোকা একবার মুখ ডুবিয়ে দিলে।

বাতাসী একটু মুখ বেঁকিয়ে বললে, মাঝপথে আর ঢং করতে হবেক নাকো, চল।

বাতাসীর দিকে খাড়চোখে একটু চেয়ে হি-হি করে হেসে উঠল খসলা। সিটি বাজল কদমডাঙার খাদে। পালি বদলের সময় হল। হেডগিয়ারে চাকা ঘুরছে বন বন করে। চানক বেয়ে নামছে আর উঠছে কোম্পানীর ডুলি। বাতাসী হঠাৎ বলে উঠল—জামাইদাদা খাদে নামছে।

দূর থেকেই খসলা একটু তাকাল খাদমোয়ানের দিকে। ঘুরছে চাকা বন বন করে। এতক্ষণ হয়তো খাদের নীচে নেমে গেল বাউরী মুখুজ্যে।

খসলাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল বাতাসী। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলে। হাটবাজার সেরে এক্ষুনি আবার তড়িকঘড়িক ফিরে আসতে হবে।

বাতাসী আজ শ্বশুরবাড়ি যাবে যে।

জল ক্রমশ বাড়ছে আলপথের উপর। ডুবে গেল বাতাসার হাঁটু অবধি। শাড়ির আঁচলটা একটু গুটিয়ে নিলে বাতাসা। এগিয়ে গেল আরও খানিক। ধীরে ধীরে উপর দিকে টান পড়ছে শাড়িতে থমকে একটু দাঁড়াল বাতাসী। শাড়িখানা এবার ভিজে যাবে যে।

পিছন দিক থেকে হো হো করে হেসে উঠল খসলা। মুখ বেকিয়ে বলে উঠল বাতাসী, আহা হ, ঢং দেখে কি হয়।

ছেড়ে ফেললে একটুখানি শাড়ির আঁচলটা। সঙ্গে সঙ্গে আবার সামলে নিলে। জল কিন্তু বেড়েই চলেছে। এগোবে না পিছবে এবার বাতাসী? এর চেয়ে যে লাইনধার দিয়ে ঘুরে যাওয়াই ভাল ছিল।

খসলা বললে, থাম, আর এগোস না, এই দলকা মতন জায়গাটা আমি পার করে দিই।

খসলা গিয়ে তাড়াতাড়ি ধরে ফেললে বাতাসীকে। দু হাত দিয়ে পাঁজাকোলা করে তুলে নিলে। হকচকিয়ে উঠল হঠাৎ বাতাসী। মুখ ঝামটে বলে উঠল, আ-মরণ, কে কোন্ দিকে দেখে ফেলবেক যে।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে খসলা, দেখলেক তো কি হবেক কি, কুনু শালোকে ডরাই নাকি?

তা কেন ডরাবে! খসলা যে বাতাসীর বর। সাতখুন ওর ছাড় লেখা আছে। বাতাসী কিন্তু ছটফট করতে লাগল, কাতুকুতু লাগছে যে ভীষণ। দম ভরে একবার হি-হি করে হেসে উঠল খসলা। বললে, ছাড় খালভরা, ছাড়।

পা-টা হঠাৎ হড়কে গেল খসলার। এক জাংভর জলে দাঁড়িয়ে উল্টে পড়ল বাতাসীকে নিয়েই। পড়ল একেবারে সদ্গোপদের বাঁ-হাতি নীচু বহালটায়। বহাল নয়, রাতারাতি যেন পুকুর হয়ে গেছে, আলের নীচে জল হয়ে গেছে সাঁতার। টুপ করে ডুবে গেল দুজনেই। সঙ্গে সঙ্গে আবার ভেসে উঠল। জল কেটে কেটে এগিয়ে এল বাতাসী, জলের নীচে আলপথটা হাতড়াতে লাগল।

খসলা গিয়ে একটা টান দিলে বাতাসীর ঠ্যাং ধরে। হাসতে হাসতে বলে উঠল, আয় না একটু সাঁতার কাটি। ভিজেই যখন গেলুম, তখন আর এত তাড়াতাড়ি কিসের।

বাতাসীকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে বাহালের প্রায় মাঝখানটায় ছেড়ে

দিলে খসলা। জল সেখানে অথৈ। ধানগাছের চারাগুলো ডুবে গেছে জলের নীচে। দক্ষিণ দিকের পগারটায় জেগে আছে শুধু বোয়ান গাছের গোটাকয়েক ডাল। জি. টি. রোডের কালভার্ট দিয়ে হুড় হুড় করে বয়ে আসছে বর্ষার বেনো জল। ঠেসে দিয়েছে মেইন লাইনের ধার পর্যন্ত। উল্টোদিকে ঠেল মারছে সেখান থেকে। বহালের জল থিতিয়ে গেছে দুটো দিকের ঠেলা পেয়ে। বাতাসীকে পিঠের উপর চাপিয়ে নিলে খসলা। সাঁতার কেটে কেটে বহালের জলে চক্কর মেরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তার পর হঠাৎ বাতাসীকে ছেড়ে দিয়ে মারলে খসলা টুপ করে এক ডুব। থৈ নিয়ে আবার হুপ করে ভেসে উঠল, হাতে একমুঠো মাটি। হাত তুলে দেখিয়ে দিলে বাতাসীকে, বললে, আনতে পারিস থৈ ?

সাঁতার কাটতে কাটতে জবাব দিলে বাতাসী, উঁহু, থৈ-টৈ আমি আনতে লারব।

উপর দিক থেকে কি যেন একটা ভেসে আসছে কিলবিল করে। বাতাসী একটু ভয় পেয়ে গেল। চিৎকার করে উঠল হঠাৎ, সাপ !

দু হাত দিয়ে জল কেটে এগিয়ে চলল বাতাসী। আর নয়, এখান থেকে পালাতে হবে এবার।

খসলা বললে, সাপকে এত ভয় কিসের তোর ?

বাতাসী কোন জবাব দিলে না, এগিয়ে চলল আলপথটার খোঁজে। সাপটা গিয়ে কিলবিল করে উঠে পড়ল বোয়ান গাছের ডালে।

কিসের যেন একটা শব্দ হল প্রচণ্ড। ও কি, ও কিসের শব্দ ? কামান গর্জে উঠল যেন মাটির ভিতর থেকে। কেঁপে উঠল চারিদিক। পৃথিবীটা চৌচির হয়ে ফেটে পড়ল নাকি ! বদ্ধজলা সচল হয়ে উঠেছে ! বহালের জলে ভাসছে বাতাসী। অদৃশ্য এক দুর্বার গতিবেগ পিছন দিক থেকে টানছে যেন বাতাসীকে। শব্দ শুনে হকচকিয়ে গেছে হঠাৎ খসলা। সাঁতার কেটে উঠল গিয়ে আলপথটায়। ভ্যাবাচ্যাকার মত এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। স্রোতের টানে টানে ভেসে চলল বাতাসী। ভেসে চলল একটু একটু করে। সাঁতার কেটে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করছে আলপথটার দিকে। এগোতে কিন্তু পারছে না কোনমতেই, পিছন থেকে টানছে যেন মহাকাল। হাবুডুবু খেতে লাগল বাতাসী, আঘাম জলের দরিয়ায়। আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল হঠাৎ, মলুম, বয়ালের জলে ডুবে মলুম ; হাত বাড়িয়ে আমাকে একটু ধর গো—!

আলপথের উপর থেকে সঙ্গে সঙ্গে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল খসলা। ধরলে গিয়ে বাতাসীর একটা হাত। হাঁপিয়ে পড়েছে বাতাসী। টেনে তাকে ধরে রাখতে পারছে না খসলা, দুর্বার স্রোতের টানে তর তর করে ভেসে চলল দুজনেই। ঘূর্ণি, সামনে এক প্রচণ্ড ঘূর্ণি। বিরাট একটা গহ্বরের সৃষ্টি করে বন্ বন্ করে ঘুরছে যেন সুদর্শন চক্রের মত। কোত্থেকে যেন গম্ভীর একটা আওয়াজ উঠছে—বগ্ বগ্ বগ্ বগ্—বগ্ বগ্ বগ্ বগ্। চুম্বকের মত টানছে যেন খসলা আর বাতাসীকে। ভাসিয়ে নিয়ে চলল গহ্বরটার দিকে, খড়-কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে চলল। হাত বাড়িয়ে আঁকড় গাছের ডাল একটা ধরে ফেললে খসলা। বাতাসী কিন্তু ছিটকে গেল হাত ফসকে। আথাল-পাথাল ঘূর্ণির জলে হাবুডুবু খেতে খেতে রাক্ষুসে ওই হাঁ-টার মধ্যে লহমার মধ্যে ঢুকে পড়ল বাতাসী। আর তাকে দেখতে পাওয়া গেল না। দূর থেকে হঠাৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল খসলা, বাতাসী! বাতাসী!

কোথায় বাতাসী? বহালের জলে বরুণদেবের তাণ্ডবলীলা শুরু হয়েছে। বাতাসী তার পূজোর বলি। উন্মত্ত জলোচ্ছ্বাস কলকল খলখল শব্দে চারদিক থেকে কাড়ানাকাড়া বাজাচ্ছে যেন, উৎকট এক পৈশাচিক আনন্দে।

করুণভাবে আর একটিবার মুখ তুলে তাকাল খসলা। বাতাসী নেই। মাথার উপর তার বিষধর সাপটা ফণা তুলে দুলছে।

দুহাত দিয়ে আঁকড় গাছের ডালটাকে শক্ত করে চেপে ধরলে খসলা। স্রোতের বুকে গা ভাসিয়ে দিলে। বাঁশপাতার মত থর থর করে কাঁপতে লাগল খসলা বাউরীর অচৈতন্য দেহখানা।

অতিরিক্ত জলের চাপে বহালের প্রায় আধখানা বসে গেছে আট-দশ হাত মাটির নীচে। কলিয়ারির সুড়ঙ্গ একটা ধ্বসে পড়েছে ঠিক তার পাশেই।

॥ ৩ ॥

কলিয়ারির পিটমাউথ। রাত পালি শেষ হয়ে গেছে, শুরু হচ্ছে দিনের পালি। সিটি বাজার সঙ্গে সঙ্গে খাদের নীচে কয়লা কাটতে নেমে গেছে কতকগুলো মালকাটা। নামছে আরও কতকগুলো। হেডগিয়ারে চাকা ঘুরছে। কেজ্ উঠছে নীচের থেকে, ঠেকল এসে সারফেসের সীমানায়। খাদ থেকে উঠে এলেন মিঃ নাহার, ইলেকট্রিক সুপারভাইজার। থর থর করে কাঁপছেন।

খাদের নীচে কি যেন একটা ঘটে গেল এইমাত্র। তিন নম্বর পিটের নীচে প্রথম পালির বিলি ব্যবস্থা শেষ করে সবে তিনি কেজে এসে উঠেছেন। বেজে উঠল ঘন্টিওয়ালার সঙ্কেত, কেজ উঠল আণ্ডারগ্রাউণ্ড ছেড়ে। ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ যেন কিসের একটা উচ্চকিত আর্তনাদ—পানি—পানি—তুফান।

এর বেশি কিছু শুনতে পান নি মিঃ নাহার। ঊর্ধ্বমুখী কেজ তাঁকে সারফেসের দিকে টানছে। ভয়ানক রকমের একটা কিছু যে ঘটে গেল খাদের নীচে—শুধু এইটুকু তিনি বুঝতে পেরেছেন। তার বেশি কিছু জানা গেল না।

পিটমাউথে পরবর্তী ডুলির জন্য অপেক্ষা করছে কতকগুলো মালকাটা। ডুলি উঠবার আগেই কিসের যেন একটা আওয়াজ। কোত্থেকে হঠাৎ বিরাট একটা শব্দ ভেসে এল। মুহূর্তের মধ্যে কেঁপে উঠল কলিয়ারির ভিত পর্যন্ত। চকচকিয়ে উঠল যেন সমগ্র সারফেস। রেন কোটটা তাড়াতাড়ি গায়ে ফেলে ছুটে এলেন মিঃ পাণিগ্রাহী, কলিয়ারির ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার। ব্যাপারটা এ পর্যন্ত কেউ কিছুই বুঝে উঠতে পারে নি। ম্যানেজার সাহেব পিটমাউথের সামনে এসে দাঁড়াতেই চোখে পড়লেন মিঃ নাহার। চোখেমুখে তার কেমন যেন একটা আতঙ্কের ভাব। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলেন পাণিগ্রাহী সাহেব. হোয়াট হ্যাপেন্‌স মিঃ নাহার, ইজ দার এনি রং। হল কি হঠাৎ বলুন তো?

জবাব দিলেন মিঃ নাহার, আই য়্যাম অ্যাফ্রেড, দার মাস্ট বি সামথিং সিরিয়াস। খুব সম্ভব জল ঢুকেছে কলিয়ারিতে।

জল ঢুকেছে কলিয়ারিতে? কোথেকে এল জল।

রাত পালির কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিল তিন নম্বর পিটের একটা খালাসী। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে, দাঁড়াল এসে ম্যানেজার সাহেবের সামনে। সেলাম ঠুকে বললে, হুজুর—হুজুর, পানিকা বড়সে তোড় দিয়া পছি তরপকা জমিন। গ্যালারি ফোড়কে পানি ঘুসতা দরিয়াকা মাফিক।

গ্যালারি ভেঙে জল ঢুকছে। খনিমুখ কোথাও ধসে পড়ল নাকি! এ যে এক অবিশ্বাস্য অসম্ভব ব্যাপার।

ম্যানেজারবাবু সঙ্কেত করলেন, ডুলি নামাও—নামাও ডুলি ডুলি নামিয়ে দাও খাদের নীচে।

নামাতেই হবে ডুলি। বিপদ যদি ঘটে থাকে কিছু—লোকগুলোকে কোন রকমে বাঁচাতে হবে তো।

পিটমাউথে এসে ভিড় করে দাঁড়িয়ে গেছে বহুলোক। মুখেচোখে অজানা এক আশঙ্কার ছায়া। হাঁ করে সব চেয়ে আছে হতভম্বের মত।

গেছে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে।

ওরা কিন্তু রয়ে গেল খাদের নীচে, একেবারেই রয়ে গেল। নিয়তি ওদের ওইখানেই কবর দিয়ে গেল বুঝি একসঙ্গে। কারো জন্য খুঁড়তে হয় নি কবর, খোঁড়াই ছিল আগে থেকে ; বেনো জলের কফনটা শুধু তাড়াতাড়ি ঢেকে দেওয়া হয়েছে। আর কি ওরা উঠবে ?

অতিমাত্রায় চঞ্চল হয়ে উঠলেন মিঃ পানিগ্রাহী, কলিয়ারির ম্যানেজার সাহেব। কোম্পানীর ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি, কদমডাঙা কয়লাখনির সর্বময় কর্তা। কলিয়ারির সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে দায়িত্ব যে তাঁরই সব চেয়ে বেশী। এ বিষয়ে যথাবিহিত করণীয় অবিলম্বে শেষ করা দরকার। নির্দেশ দিলেন ওভারসিয়ার মণিমোহনবাবুকে ভাঙনের দিকটা তদন্ত করে আসতে। সহকারী ইনচার্জবাবুকে পিটমাউথের ভার দিয়ে বিভ্রান্তের মত ছুটলেন তিনি অফিসের দিকে। সংবাদ দিতে হবে, বহু জায়গায় পাঠাতে হবে দুর্ঘটনার চরমতম দুঃসংবাদ। তিলার্ধের অবকাশ নাই। রেস্কু্য স্টেশন থেকে রিজিওন্যাল অফিস থেকে শুরু করে কলকাতার হেড অফিস পর্যন্ত। লোক্যাল থানা···পুলিস সাহেব···মহকুমা হাকিম---

—হ্যালো···হ্যালো···রেস্কু্য স্টেশন—

টেলিফোনের রিসিভারটা কানের কাছে ধরে ঠক ঠক করে কাঁপছেন ম্যানেজার সাহেব। প্রথম শ্রেণীর মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার খনিবিশারদ মিঃ আর. এল. পানিগ্রাহী। কেমন যেন একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছেন।

কলিয়ারির জল নিষ্কাশনের জন্য অবিলম্বে পাম্প দরকার। তেমন কোন পাম্প কিন্তু হাতের কাছে নেই। ফালতু পাম্প তো এ কোম্পানী রাখে না। কোনরকমে দৈনন্দিন কাজ চালাবার মত দুটো মোটে পাম্প চলে পাশাপাশি পিট দুটোতে। সে দিয়ে কোন কাজ হবে না। এ জল যদি নিকাশ করতে হয়—এর চেয়ে ঢের শক্তিশালী পাম্প দরকার। সে ব্যবস্থা কি তাড়াতাড়ি সম্ভব হবে !

জবাব এল হেড অফিস থেকে। পাম্প পাঠাবার ব্যবস্থা করছেন তাঁরা। টনক নড়েছে চেটিয়া কোম্পানীর। পাম্প যোগাড় করতেই হবে তাঁদের, যেখান থেকে আর যেমন করেই হোক। লাগবে হয়তো কিছু টাকা কিরায়া। আফৎ যখন এসেছে খরচা কিছু হয়ে বইকি। তাতে কিছু এসে যায় না।— ও কলিয়ারির কিম্মত যে এখন কমসে কম বিশ লাখ রুপেয়া। মুনাফাটাও ভাল

আছে। যেমন করে হোক ওটা আবার তাড়াতাড়ি চালু করা দরকার। তার জন্য পাম্প দু-একটা অবশ্যই চাই।

আপদকালীন ক্ষয়-ক্ষতিগুলো মুনাফার অঙ্ক দিয়ে হয়তো একদিন পূরণ হয়ে যাবে। কিন্তু এই যে এতগুলো খনিশ্রমিক, খাদের নীচে আটকা পড়ে গেল যারা, তাদের যদি জীবনের কোন হানি ঘটে! সে ক্ষতির কথা ভাবতে পারে কি হংসেশ্বর চেটিয়া এণ্ড কোম্পানী? পারবে সে ক্ষতি জীবনে কোনদিন পূরণ করতে?

সেসব কথা পরে। দরকার হলে মালিকপক্ষ খেসারত কিছু ধরে দিতে পারেন বইকি। আপাতত জলনিকাশের পাম্প চাই। কয়লার বাজারে আগুন লেগেছে, দর চড়ছে হুড় হুড় করে। এ অবস্থায় কলিয়ারি তো আর বেশি দিন বন্ধ রাখা চলে না।

কদমডাঙা কলিয়ারির তিন নম্বর পিট! লোকে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। ঝড়ের বেগে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল নিদারুণ দুঃসংবাদ—জল ঢুকেছে কদমডাঙা কলিয়ারিতে। আটকা পড়ে গেছে বহুলোক, আট শ ফুট খাদের নীচে।

রেস্‌ক্যু পার্টি এসে পড়েছে। সরকার পক্ষীয় উদ্ধারকারী দল। ফায়ার ব্রিগেডের খানতিনেক লাল গাড়ি মই পাইপ সাজসরঞ্জাম নিয়ে জোর শব্দে ঘণ্টা বাজিয়ে থামল এসে কলিয়ারির সামনে। সেণ্ট্রল হাসপাতাল থেকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল খানকয়েক অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি। অবস্থাটা সম্যক অনুধাবন করতেই কেটে গেল আরও কিছুক্ষণ। অবস্থা অতি সঙিন। রেস্‌ক্যু পার্টি কি করতে পারে এ অবস্থায়? অথৈ জলে ডুবে গেছে কলিয়ারি। ডুলি দুটো পর্যন্ত ভেঙে-চুরে বিগড়ে গেছে, আটকে আছে খাদের নীচে। নিমজ্জিত খনি শ্রমিকদের অবিলম্বে উদ্ধার করবার কোন পথ যে খোলা নেই চোখের সামনে। ফায়ার ব্রিগেডের ব্রিগেডিয়ার দল চারদিকে শুধু পাইপ নিয়ে টানাটানি করছে। সামান্য কয়েকখানা হোসপাইপ দিয়ে এ জল কি নিকাশ করা সম্ভব? এতে কোন কাজ হবে না। সুতরাং তাদের অধিক কিছু আর করবার নেই। বড় জোর ইস্পাতের টুপি মাথায় দিয়ে পিটমাউথ থেকে নীচের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে ওরা, আট শ ফুটের ঝুঁকি নিয়ে। আহত ও নিহতের সংখ্যা তাতে কিছু বেড়ে যাওয়াই সম্ভব, কমবার কোন ভরসা নেই।

দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন মহকুমা হাকিম। সঙ্গে

তাঁর সহকারী লেবার কমিশনার ; আর পুলিস মহলের বড়কর্তা নিজে। তার আগেই রীতিমত পুলিস পাহারা বসে গেছে কলিয়ারিতে। পৌঁছে গেছে তকমাধারী লালপাগড়ি, কলিয়ারির প্রধান প্রধান ঘাঁটিগুলো তাড়াতাড়ি এসে ঘিরে ফেলেছে। এ বিষয়ে সরকার পক্ষের কর্তব্যের গুরুত্ব বড কম নয়। সকলেই তাঁরা অতিমাত্রায় সজাগ হয়ে উঠেছেন। রিজিওন্যাল অফিস থেকে এসে পড়েছেন ভারত সরকারের অভিজ্ঞ খনি পরিদর্শকগণ। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়লেন তাঁদের উপরিতন কর্মকর্তা শ্রীএস. কে. কানোয়ার, চীফ ইন্‌সপেক্টার অব মাইনস, গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া।

কলিয়ারির ম্যানেজার সাহেব তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে গলদঘর্ম হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন চারিদিকে। সকলে মিলে সরজমিনে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করে এলেন কলিয়ারির সম্যক অবস্থাটা। সরকার ও কোম্পানী পক্ষের প্রাথমিক তদন্তের কাজ শেষ হতেই কেটে গেল প্রায় ঘণ্টা দুইয়ের উপর। সারফেসের উপর অতিরিক্ত জলের চাপে ভেঙে পড়েছে পশ্চিম দিকের একটা গ্যালারি। সেই পথ দিয়ে খনিগর্ভে জল ঢুকেছে প্রবল বেগে। এইটাই হল দুর্ঘটনার প্রধান কারণ। তদন্তের ফলে এইটুকুই শুধু জানা গেল আপাতত। গ্যালারিগুলো ডুবে গেছে কানায় কানায়, সে বিষয়ে আর সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

একেবারেই ডুবে গেছে পিট বটমটা। গ্যালারিগুলো ঠেসে আছে অফুরন্ত বেনো জলের চাপে। অথৈ জলের দরিয়ায় সেই সঙ্গে ঠেসে আছে কতকগুলো হতভাগ্য খনিশ্রমিক। আটকা পড়েছে খাদের নীচে। সংখ্যায় খুব অল্প নয়, মোট একশ বাষট্টি। পৃথিবীর বুক থেকে আটশ ফুট নীচের দিকে নেমে গেছে ওরা। ডুলি চড়ে নেমে গেছে কয়লা কাটতে। কয়লা এখনো কাটছে হয়তো। সঙ্গে আছে গাঁইতি ঝোড়া মশাবাতি। পাতালপুরীর পাষাণকারা ভেঙে উদ্ধার করতে গেছে ওরা পাষাণময়ী বাণিজ্য লক্ষ্মীকে। সেখান থেকে তাকে উপড়ে এনে ধরে দিতে হবে লক্ষীমন্ত ধনকুবেরদের হাতে। তার জন্য তারা মজুরি পাবে। পাবে কিছু মাগ্‌গী ভাতা, সেই সঙ্গে হাজরিখাতার হিসেব মিলিয়ে পেয়ে যেতে পারে নব্বই দিনে তিরিশ দিন, ফালতু একটা বোনাস। খেয়ে পরে বেঁচে থাকবার মত আরও কত সুযোগ সুবিধা। ট্রাইবিউনালের রোয়েদাদ ওদের রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা করেছে যে। আইন করে কড়ায় গণ্ডায় পাওনা আদায়ের যথারীতি সুবন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়েছে। লোকগুলো যাতে অনাহারে মারা না যায়—সেদিকটা একটু দেখতে

হবে তো। ওদের দিয়ে ডলার কিনতে হবে যে। পঞ্চবার্ষিক যোজনার মূল্যবান অ্যাসেট ওরা, দেশের একটা মস্ত বড় সম্পদ।

কিন্তু এই চরমতম দুর্যোগের ঘনঘটা কাটিয়ে আকস্মিক এই বেনোজলের ধাক্কাটা সামলে লোকগুলো ঠিক পথ চিনে আবার উঠে আসতে পারবে তো। সে কথা শুধু জানেন ওদের ভাগ্যবিধাতা; আর কিছুটা হয়তো জানতে পারেন সমবেত খনিবিশারদগণ। এ বিষয়ে একটা কিছু রায় তাঁরা দেবেন বইকি।

পিটমাউথে অপেক্ষামান উন্মুখ জনতার ভিড়। দেশসুদ্ধ ভেঙে পড়েছে খাদমোয়ানে এসে। অবাক হয়ে চেয়ে আছে সব হতভম্বের মত। মনের মধ্যে ঠেলে উঠছে ঘুরে ফিরে শুধু একটি মাত্র প্রশ্ন—লোকগুলো কি বেঁচে আছে এখনো! আর কি ওরা উঠে আসবে কোম্পানীর ডুলি বেয়ে। ওদের আবার সেই চেহারায় দেখতে পাওয়া যাবে কি।

প্রথম পালির কাজকর্ম পুরোপুরি চালু হাওয়ার আগেই ঘটে গেছে যেটুকখানি ঘটবার। খাদে যারা নেমে গেছে. তাদের যারা অন্তরঙ্গ আপনজন. তারাই সব চেয়ে ভেঙে পড়েছে বেশি। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই শ্রমিক ধাওড়া খালি করে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে এসে খাদমোয়ানের ফাঁকা ডাঙাটায়। মাথা ঠুকছে মাটির উপর, বুক চাপড়ে হায় হায় করছে। তবু একটু ক্ষীণ আশা—হয়তো ওরা বেঁচেও যেতে পারে আবার হয়তো উঠে আসবে কোম্পানীর ডুলি বেয়ে। একটু খানি অবসর হতেই যা দেরি!

কিন্তু কি ব্যবস্থা যে হচ্ছে তাও তো কেউ কিছু বলতে পারছে না। এইভাবে আর কতক্ষণ কাটবে. বেলা যে প্রায় এগারোটা বাজে। সঠিক খবরটা তাড়াতাড়ি এবার জানা দরকার যে।

সঠিক খবর দেবার যারা মালিক—দুর্ঘটনার তদন্তাদি শেষ করে খাদমোয়ানে এসে পড়েছেন তাঁরা। সঠিক খবর দিতেই হবে তাঁদের। সমবেত জনতার সামনে শেষ করতে হবে তাঁদের কঠোরতম সে দায়িত্বটুকু। সে প্রস্তুতি চলছে তাঁদের বহুক্ষণ আগে থেকেই।

বহু কিছু ভেবে চিন্তে, অনেক কিছু গবেষণার পর বহুদর্শী ও বিচক্ষণ খনিবিশারদগণ ব্যক্ত করলেন তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত—লোকগুলো আর বেঁচে নেই, বহু আগেই ওদের মৃত্যু ঘটেছে।

আকাশখানা যেন ভেঙে পড়ল তিন নম্বর পিটের উপর। শুরু হল চারদিক থেকে বুকফাটা কান্না. গগনভেদী হাহাকার, দ্বিগুণতর বেগে। মা

কাঁদছে, বৌ কাঁদছে, কাঁদছে তাদের ছেলেমেয়ে। সেই কান্নার করুণ বিলাপ আছাড় খেয়ে পড়ছে যেন পিটমাউথের দিকে দিকে। উদ্বেল হয়ে উঠল বুঝি কদমডাঙার আকাশ বাতাস। উচ্চকিত বহিরাগত আগন্তুকের দল হতবিহ্বল দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে শোকার্তদের পানে। চোখ মুছছে গভীরতম সমবেদনায়। ভেসে উঠল মর্মন্তুদ বিলাপধ্বনি—ওদের তোমরা ফিরিয়ে দাও মালিকবাবুরা, দয়া করে ওদের ফিরিয়ে দাও। ওদের ছেড়ে আমরা বাঁচব কেমন করে।

মা গিয়ে পাগলের মত আছাড় খেয়ে পড়ল ম্যানেজার সাহেবের পায়ের উপর। মাথা কুটে চিৎকার করছে—আমার বেটা, আমার এক মাত্তর জোয়ান বেটা মলুয়া, তাকে তোমরা কোন্ মুলুকে ঠেলে দিলে হুজুর।

অতিমাত্রায় বিব্রত হয়ে উঠলেন মিঃ পাণিগ্রাহী। কানের ভিতর ছুঁচ ফুটছে যেন। বিঁধছে যেন বহ্নিশলাকা। মুখ ফেরালেন চোখের উপর রুমাল চাপা দিয়ে।

কাদের একটা বৌ গিয়ে লুটিয়ে পড়ল কানোয়ার সাহেবের পা দুটো জড়িয়ে ধরে। বাচ্চাগুলো ককাচ্ছে। হাত-পা ছুঁড়ে কাতরাচ্ছে হীরু মালকাটার বৌ—আমাদের একবার দেখাও এনে সায়েববাবুরা, মরল নাকি বাঁচল একবার নিজের চোখে দেখি।

পিছু হটছেন শ্রীকানোয়ার। হীরুর বৌ আরও জোরে পা দুটো তাঁর চেপে ধরলে। পাগলের মত বলে উঠল—দাও আমাকে ডুলি করে খাদের নীচে নামাই। আমি নিজে গিয়ে খুঁজে আনব টুনটুনির বাপকে। দয়া কর, তোমরা আমাদের দয়া কর হুজুর।

বিচলিত হয়ে উঠলেন মিঃ কানোয়ার। ইঙ্গিত করলেন পাণিগ্রাহীকে, অফিসের দিকে এগিয়ে চলুন।

লাঠি ঠুক ঠুক করতে করতে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছেন পক্ককেশ এক লোলচর্ম গ্রামবৃদ্ধ। এসেছেন তাঁর নাতির খোঁজে। আণ্ডারগ্রাউণ্ডের ইলেকট্রিক অ্যাপ্রেন্টিস সুহাস নন্দীর দাদু ইনি। পিটমাউথের কাছাকাছি এসেই বুক চাপড়ে চিৎকার করে উঠলেন—সুহাস—সুহাস রে—আমার দাদুভাই—!

খাদের নীচে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছেন। তাড়াতাড়ি ধরে ফেললে কয়েকজনে মিলে। কোটরগত চোখ দুটো বিস্ফারিত করে আকাশের পানে তাকালেন একবার বৃদ্ধ। কাকে যেন খুঁজছেন অসীম শূন্যে দৃষ্টি মেলে। ধোঁয়া, সবই

যেন ধোঁয়া। পাগলের মত চিৎকার করে উঠলেন আর একটিবার—সু—হা—স!

স্তব্ধ হল কণ্ঠস্বর। মূর্ছিত হয়ে পড়েছেন। সরকারী অ্যাম্বুলেন্স থেকে তাড়াতাড়ি নেমে এলেন এক ডাক্তার। দেখলেন একটু নেড়েচেড়ে। দেখবার আর নেই কিছু। থেমে গেছে জীবনের স্পন্দন। অত্যধিক উত্তেজনার ফলে হার্টফেল করেছেন বৃদ্ধ। অপমৃত্যুর সংখ্যা একটি বাড়াল।

নাতির খোঁজে এগিয়ে গেলেন বৃদ্ধ। খুব সম্ভব এখানে সে নেই। খুঁজতে হবে আর এক দেশে গিয়ে।

লোকগুলো সব কাঁদছে। চারিদিকে শুধু বুকফাটা কান্নার রোল। আজ যে ওদের সব কিছু রয়ে গেল ওই খাদের নীচে। একটুখানি না কেঁদে কি পারে। কাঁদছে যখন কাঁদুক। প্রাণভরে একবার কেঁদে নিক এই শেষ কাঁদা। বুক খালি করে কাঁদতে দাও ওদের। নইলে ওরা বাঁচবে না। যে-সুহাস নন্দীর দাদুর মত মারা যাবে হার্টফেল করে। কাঁদছে, আহা কাঁদুক। কান্না নয় ঔষুধ, মহাশোকের মহৌষধি। কেঁদে কেঁদে ওরা হাঁপিয়ে পড়বে আপনা থেকেই। দম নিয়ে আবার কাঁদতে শুরু করবে। সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করা বৃথা। কান্না যেদিন থামবার—সেদিন আর কোন সান্ত্বনা-বাক্যের দরকার হবে না। আজ ওরা একটু কেঁদে নিক, এ কান্না কি জোর করে থামানো যায়! খাদের নীচে কয়লা কাটতে গিয়ে ওরা যে এদের বুকের পাঁজর ভেঙে দিয়ে গেল। ছিঁড়ে দিয়ে গেল বত্রিশ নাড়ী। হারিয়ে গেল বুকের ধন। সবহারাদের সবকিছু যে রয়ে গেল আজ খাদের নীচে।

একটু ওরা কাঁদুক। ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে ওই সাঁওতালী বৌ, বিলাসপুরী মা। কোঁড়া আর ধাঙড়দের ধাওড়াগুলো খালি করে খাদ-মোয়ানে সব কাঁদতে এসেছে। ভেঙে পড়েছে বাউরীপাড়া, বাগদীদের কুলিবস্তিটা শিকড়সুদ্ধ উপড়ে এনে কে যেন এখানে আছার মেরে ফেলে দিয়ে গেছে। ভিন্ন ভিন্ন সমাজের লোক, কাঁদছে ওরা নিজের নিজের ভাষায়; সুরটা শুধু একটুখানি আলাদা। এ কান্নার রূপ কিন্তু এক, দেশ ভেদে আর বর্ণ ভেদে রঙ কিন্তু এর এতটুকু পাল্টায় নি। মানসিক যে বস্তু এদের নির্মম-ভাবে নাড়া দিয়ে ভেঙেচুরে গুঁড়ো করে দিয়ে গেল—নাম তার শোক। সব ঘটে ওই একই বস্তুর ছায়া।

নিষ্করুণ এ নির্মম শোক। হাজার বুকে জেলে দিয়ে গেল রাবণের চিতা। সেই দহনে জ্বলছে এরা, দু চোখ বেয়ে ফেটে পড়ছে বিগলিত বাষ্পধারা।

কাঁদছে, আহা কাঁদুক ; একটুখানি না কেঁদে কি পারে।

কাঁদে না শুধু একজন। জীবনে কখনো কাঁদতে শেখে নি। শোক বলে বুঝি কোন বস্তু নেই তার কাছে। সে মহাকাল। পিটমাউথে অগণিত শোকার্তের হাহাকার চলছে। তার কিন্তু বিকার নাই। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই এতটুকু। কয়লাখনির নিমজ্জিত সুড়ঙ্গের মধ্যে মৃতদেহের উপর পা ফেলে ফেলে চলছে বুঝি তার উদ্দাম সংহার নৃত্য। মহাকালের সদ্যলব্ধ শিকার যে আজ ওরা। একসঙ্গে অনেকগুলো, একুনে প্রায় পৌনে দুশর কাছাকাছি। ওদের আত্মী-য়স্বজন ভাই-বন্ধু পরিবার, আরো যেন কারা সব-এমন করে কাঁদছে কেন পিঠমাউথে গলা ফাটিয়ে। মহাকালের শান্তিভঙ্গ হবে যে। তবু এঁরা কাঁদে, এমন করে কাঁদে কেন এরা? কে দেবে এ প্রশ্নের উত্তর।

অন্তরীক্ষে কান পেতে ছিল বুঝি নিষ্ঠুরা নিয়তি। সাড়া দিয়ে উঠল যেন হঠাৎ—ও কিছু না, পাগলের প্রলাপ।

॥ ৪ ॥

আকস্মিক দুর্ঘটনার উপর মানুষের কোন হাত নেই। দৈবকে সে রোধ করবে কেমন করে। মানুষ এখানে নিতান্তই অসহায়। উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে অপরাধীর বিচার করা চলে না। এমনটা কি বড় দেখা গেছে যে ধীসম্পন্ন সুস্থমনের মানুষ অকারণে বা অতি তুচ্ছ কারণে নিজের হাতে সর্বনাশের সুড়ঙ্গ পথ কেটে এমন একটা অঘটনকে ইচ্ছে করে ডেকে নিয়ে এল, পরিণতি যার মানুষের পক্ষে ভয়াবহ। তা কি করে হতে পারে। মানুষ যে অতি বুদ্ধিমান জীব, এ ভুল কি সে করতে পারে কখনো। শুধু বুদ্ধিমানই বলা যায় কেন, তারও এক কাঠি উপরে। অঘটন-ঘটন-পটিয়সী পরাবিদ্যার সাক্ষাৎ উত্তরসাধক বিংশ শতাব্দীর বাছাই করা যুদ্ধোত্তর মানুষ। অসাধ্য সাধন করতে পারে এরা। অতিবুদ্ধির তুড়ি দিয়ে জগৎটাকে প্রায় মুঠোর মধ্যে এনে ফেলেছে। নতুন যুগের স্রষ্টা এরা, পূব দিগন্তে নবযুগের নতুন সূর্য উঠল বলে। হাঁ করে সব চেয়ে আছে লক্ষ কোটি জনতা। ওই মুষ্টিমেয় অতিমানবের রথের চাকায় কাঁধ দিতে হবে। চালাতে হবে জগদ্দল রথ, অবিশ্রান্ত অবিরাম ঠেলতে হবে মরীয়া হয়ে। চলছে কিন্তু ঠিকই, পুণ্যবানের পুষ্পক রথ ঠিক

চলছে। রথের চাকায় চাপা পড়ে গুঁড়িয়ে যারা ধুলো হয়ে গেল, অশেষ পুণ্যের অধিকারী তারা। তিলে তিলে মরে বাঁচছে। জীবনের মহামুক্তি, পরকালে এদের অক্ষয় স্বর্গ মারে কে।

স্কদমডাঙা কলিয়ারির তিন নম্বর পিট। রসাতলের সুড়ঙ্গ পথ বেয়ে স্বর্গের রথ পৌঁছে গেল নাকি। না পৌঁছলেও পৌঁছতে আর বেশি দেরি হবে না। ওরা যে সব মহামানবের বলি। পুণ্যবানদের অতিলোভের যূপকাষ্ঠে স্বেচ্ছায় এসে মাথা পেতে দিয়েছে। তাই তো আজ না চাইতেই মহামুক্তির ডাক এসে পৌঁছে গেল আচম্বিতে। অমৃতস্য পুত্রাঃ এরা। খাদের জলে হাবুডুবু খেতে খেতে মৃত্যুকে পর্যন্ত বেমালুম এরা হজম করে দিলে। রেখে গেল শুধু ক্ষণভঙ্গুর নশ্বর দেহগুলো। এদের সাধনার পথে বাইরে থেকে বিশেষ কোন ব্যাঘাত যদি না ঘটে, তাহলে ওই জলজ্যান্ত মৃতদেহগুলোও একদিন হয়তো মহামানবের পূজোয় লেগে যাবে। এরাই একদিন ফসিল হয়ে মিলিয়ে যাবে মৃদঙ্গারে। হাড়গুলো এদের কয়লা হয়ে উঠবে। ধরিত্রীর বহুসঞ্চিত বুকের ধন একচেটিয়া অধিকারের নেশায় যখের মত আঁকড়ে ধরে যারা পাহারা দিচ্ছে অতি সতর্ক দৃষ্টি মেলে, সেই ভাগ্যবানদের সুরক্ষিত ধনাগারে সঞ্চয় কিছু বাড়ল বইকি।

মরতে মরতেও মালকাটারা এগুচ্ছে, জীবনের এক অবধারিত জয়যাত্রার পথে। ভবিষ্যতের গর্ভে শবরূপী ভ্রূণ এরা, জন্ম নেবে কালোমাণিক হয়ে। জীবনভর এরা কয়লা কেটেছে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। আর কিন্তু কাটতে হবে না, দুঃখের নিশি প্রভাত হয়ে গেল। নিজেই এরা কাটা পড়বে এবার। কেটে নিয়ে যাবে অন্যেরা সব। ডিসেরগড়ের ফার্স্ট ক্লাস সিমকেও হার মানিয়ে দেবে এরা। মানুষের হাড়ের কয়লা যে, দাহশক্তি এর অনেক বেশি। দাম উঠবে উচ্চহারে। কেটে নিয়ে যাবে গাঁইতি দিয়ে, চাঙড় চাঙড় কয়লা। ব্লাস্টিং করে ধ্বসিয়ে দেবে হুড়মুড় শব্দে। টব গাড়িতে বোঝাই হয়ে আবার ওরা উঠে আসবে পিটমাউথে। জন প্রতি এদের মূল্য যাচাই সেদিন কিন্তু আর সম্ভব হবে না, টনের দরে বিকিয়ে যাবে এরা। এদেরকে আর চিনবেই না কেউ, শুনবে না কেউ প্রস্তরীভূত অলক্ষ্য জীবনের অবরুদ্ধ ক্রন্দন। বড় জোর এরা ভূতত্ত্ববিজ্ঞানীর গবেষণার কাজে লাগতে পারে। জলজ্যান্ত মানুষের হাড়, তাই হল কিনা কয়লা। জিওলজির নূতন একটা থিওরি হয়ে খনিবিজ্ঞানের ইতিহাসে এরা হয়তো রীতিমত একটা নাম কিনে ফেলতে পারে। জীবনের চরম মূল্য পেয়ে গেল এরা। কে বলে এদের মালকাটা। এরা

আজ জীবন্ত এক মহাজাগতিক জড় পদার্থ, গবেষণার উৎকৃষ্ট উপাদান। বেঁচে থাকলে কেউ পুছতো এদের ? এই যে একটা এত বড় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়ে গেল—তুচ্ছ এদের গোটা কয়েক জীবন নিয়ে, এমনটা কি ঘটত কোনদিন। মরে আজ এরা অমর হয়ে গেল যে। খবরের কাগজে নাম উঠবে, এর বেশি আর চায় কি ! মালকাটাদের নাম-ধাম সব উঠে গেল কাগজে। হেডলাইনের বড় বড় অক্ষরগুলো কালো কয়লার কালির মতই জ্বল-জ্বল করে ফুটে উঠবে প্রথম পাতায় খুা সম্ভব। অঙ্গারের কালি হয়ে কালকে এরা জয় করলে, এরাই যে আজ ভবিষ্যতের মৃদঙ্গার।

চাঞ্চল্য শুরু হয়ে গেছে। এদের নিয়ে হৈ-চৈ চলছে বিরাট একটা। ঝড়ো হাওয়ায় প্রলয়ের সঙ্কেত। বিলকুল সব ডামাডোল করে ফেলবে নাকি। কদমডাঙা কলিয়ারিটা শেষ পর্যন্ত টিঁকলে হয়। কিংবা হয়তো ও কিছু না, অন্তহীন মহাসমুদ্রে গোটাকয়েক বুদ্‌বুদ মাত্র, মিলিয়ে যেতে কতক্ষণ। মিলিয়ে যাবে ঠিক বুদবুদের মতই।

এর মধ্যে কিন্তু উপরতলার বিশেষ কোন হাত নাই। একটুখানি অঘটন বা বিঘটনের জন্য তাঁদের চেলা-চামুণ্ডারাই যথেষ্ট। সেও অবশ্য তাঁদেরই এক কৃতিত্ব।

গভীর জলে গা-ঢাকা দিয়ে মালা জপছে রাঘব বোয়াল। জল একটু ঘোলা হতেই ভেসে উঠল গোটাকয়েক চুনোপুঁটি। ধরা পড়ে গেল কলিয়ারির মাটিকাটা ঠিকাদার, বিলবাবু আর ওভারসিয়ার। এই যে একটা এত বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেল আচম্বিতে, এর জন্য দায়ী কে ? তদন্তের ফলে জানা গেল, মূলত এবং প্রত্যক্ষত ওঁরাই সেজন্য দায়ী।

কলিয়ারির পশ্চিম প্রান্তে খনিমুখ যেখানে ভেঙে পড়েছে, ঠিক তার দক্ষিণে শ চারেক গজ দূরে উঁচুমত একটা পাড় দেওয়া ছিল। সন তের শ বিশ সালের বানভাসির পর বেশ একটা মোটা টাকা খরচা করে মজবুত ওই মাটির পাড়টা তৈরি করা হয়। কলিয়ারির নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসাবে। বর্ষার দিনে মাঠ-ঘাটের বেনো জল পাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে মুখ ফেরাত পশ্চিম দিকে। বয়ে যেত একটা উত্তরমুখী নালা দিয়ে। ধান-মাঠের উপর অতিরিক্ত জল কোনদিন জমতে পারত না। প্রতি বৎসর বর্ষার আগে প্রয়োজন মত মাটি ভরাট করে পাড় সংরক্ষণের পাকাপাকি একটা ব্যবস্থা ছিল ইংরেজ কোম্পানীর আমলে। এ-হাত থেকে ও-হাত হয়ে কলিয়ারি এল দেশী কোম্পানীর আওতায়। সঙ্গে সঙ্গে পাড় সংরক্ষণের ব্যয়-বরাদ্দ অর্ধেক গেল

কমে। বাকি অর্ধেকটার জমাখরচ কাগজে-কলমে এ পর্যন্ত ঠিকই রাখা হয়েছে। মোটা টাকার বিল একটা করে পাস হয়ে যায় বছর বছর, মাটিকাটা ঠিকাদারের নামে। আসলে কিন্তু মাটি আর তাকে কাটতে হয় না। এদিক-ওদিক ভাগবখরা ডিসকাউন্টটা বাদ দিয়ে যা হোক কিছু এসে যায় ফোকটেই।

তা হলে আর কিজন্য মাটিকাটা। সে প্রয়োজন থাকলে তো। ভাঙা কুলোর বাতাস দিয়ে ইংরাজকে দেশ ছাড়ানোর পর থেকে বহু দিকের বহু কিছু দায়িত্ব-ভার আপনা থেকেই লাঘব হয়ে গেছে। নীতি এবং দুর্নীতির পৃথক দুটো সত্তাকে আজ আর কেউ স্বীকার করতে চায় না। যুদ্ধোত্তর নামক পদার্থটির মধ্যে রীতিমত ভেজাল ঢুকে বসে আছে। ভূতগ্রস্ত বিবেক তার সত্যিকারের মানুষ দেখে দূর থেকে তাই ভেংচি কাটে। দরকার হলে মানুষের মন ঘাড় মটকাতে কতক্ষণ। স্বাধীনতার লোহার মুগুর দিয়ে ন্যায়নীতি মনুষ্যত্বের গণ্ডী ওরা একেবারেই ভেঙে ফেলেছে। আজাদী আর কাকে বলে।

কদমডাঙা কলিয়ারির মাটিকাটা ঠিকাদার। সেও তো একজন স্বাধীন যুগের জলজ্যান্ত প্রতিনিধি। তাহলে আর মাটি কাটতে হবে কেন? কৈফিয়ত তো আর দিতে হচ্ছে না। পিছনে আছে পরমাত্মীয় মাসতুতো ভাইয়ের দল। এক চেনে বাঁধা। প্রয়োজনের দায়িত্বটা বেঁটে নিয়েছে তারাই আগে।

বিগত প্রায় দশ বৎসরের মধ্যে এক ছটাক মাটি পড়ে নি বাঁধের পাড়ে। এদিকেও তাই আজাদীর ঢালাও ব্যবস্থা। বাধামুক্ত বর্ষার জল কুলু-কুলু নাদে আজাদী সঙ্গীত গাইতে গাইতে যদৃচ্ছা বয়ে যাচ্ছে যেদিক দিয়ে খুশি। পথ তো আর কেউ আটকাচ্ছে না। এদিকটায় কেউ খেয়াল করে নি এতদিন, প্রয়োজনও হয় নি তেমন। গোলমাল বাধল বহালের নীচে গ্যালারি একটা ধ্বসে গিয়ে। ধরা পড়ে গেল পাড় চুরির ব্যাপারটা। কোম্পানীর রেকর্ডপত্র ঘেঁটেঘুঁটে শেষতক কিন্তু পাওয়া গেল ওটা। পাড়টা এখনো আঁকা আছে নক্সার মধ্যে। পশ্চিমে তার উত্তরমুখী নালা একটা। সরজমিনে ও দুটোই কিন্তু অদৃশ্য, তদন্তকালে এই যা একটু তফাত ঘটে গেল।

বিচিত্র ব্যাপার। এতগুলোর চোখের সামনে কেমন করে ভেঙে পড়ল সে পাড়। ক্ষইতে ক্ষইতে উপেই গেল এত বড় একটা উঁচু মাটির বাঁধ? কোথায় গেল সে জল-নিকাশী নালা? ওগুলো আজ ঠিক থাকলে এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটতই না।

ধরা পড়ে গেল মাটিকাটা ঠিকাদার, আর সেই সঙ্গে জনকয়েক তার অন্যান্য সাহায্যকারী। অভিযোগ গুরুতর। অতিলোভের তাড়নায় কলিয়াবিকে এরা নিশ্চিন্তে ঠেলে দিয়েছে প্রলয়ঙ্কর এই বিপর্যয়ের মুখে। দুঃসাহসিক প্রতারণার অভিযোগে লোকগুলোকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হল। হাতকড়া আর দড়ি বেঁধে সঙ্গে সঙ্গে চালান দিয়ে দিলে। আপাতত পুলিসফাঁড়ির হাজত।

জালে পড়েছে চুনোপুঁটির দল। ঘুম ভাঙল রাঘব বোয়ালের। দাঁত শানাচ্ছে গভীর জলের নীচে। কোম্পানীর ইজ্জত আজ বিপন্ন। জাল কেটে ওদের মুক্ত করতে না পারলে অনেক কিছু হানি আছে। কোম্পানীর পক্ষ থেকে এড়াতেই হবে দুর্ঘটনার দায়িত্ব। এই কলিয়াবিই দিয়েছে একদিন ছালা ভরে। দু-চার মুঠো অপচয়ে এমন কিছু এসে যায় না। এও তো এ ইনভেস্টমেণ্ট।

গভীর রাতের অন্ধকারে পা টিপে টিপে চোরা গলির সুড়ঙ্গ পথটা খুঁজে বেড়াচ্ছে রূপচাঁদ। এই মওকায় আর এক দফা সে যাচাই করে দেখে নিতে চায় তার জবিবসানো পয়জারের দাপট।

মেঘমেদুর নিশুতি রাত্রি। থমথমে অন্ধকারে চারিদিক ঢাকা। জেগে আছে শুধু পিটমাউথের হাজার ভোল্টের বাতিটা। অতন্দ্রিত উজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে হাঁ করে চেয়ে আছে আটশ ফুট নীচের দিকে। পাতালপুরীর অন্ধকারে অথৈ জলে হাবুডুবু খাচ্ছে একশ বাষট্টি জন হতভাগ্য খনিশ্রমিক। পিথমাউথের জ্বলজ্বলে ওই আলোটা হাতছানি দিয়ে ডাকছে যেন মৃত্যুপুরীর মুসাফিরদের —উঠে আয়, এইখানে উঠে আয়, ওখানে নয়, এখানে। অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা ধাত্রী মাটিমায়ের কোলে। লোকগুলো কি শুনতে পাচ্ছে? এ ডাক কি কোনদিন আর পৌঁছবে হতভাগ্যদের কানে? চানকমুখে চিক চিক করছে ঘোলা জল। ওর মধ্যে কি একেবারেই স্তব্ধ হয়ে গেল এতগুলো মানুষের জীবনের স্পন্দন? সামান্য একটা বুদবুদের মুখে এতটুকু বার্তাও যে পৌঁছল না এসে। জেগে আছে তন্দ্রাহারা নিশীথিনী, ওদের কোন সাড়া-শব্দই নেই। ওরা কি তবে ওইখানেই ঘুমিয়ে পড়ল? সে ঘুম কি আর ভাঙবে না কোনদিন?

কড়া পাহারা বসে গেছে খাদমোয়ানোর চারিদিকে। পিটমাউথের কাছে কারো ঘেঁষবার উপায় নাই। ঘুমিয়ে আছে বহির্জগৎ গভীর রাতের অন্ধকারে। ঘুম নাই আজ কদমডাঙার চোখে। সেই যে ওরা সকালবেলা

নেমে গেল খাদের নীচে এখনো তো কই ফিরল না কেউ!

হতভাগ্যদের আত্মীয়স্বজন খাদমোয়ানে পড়ে আছে ঠায়। সারাদিন কেউ বাড়ি ফেরে নি। লোকগুলোর শেষ সংবাদ না নিয়ে বাড়ি এরা ফিরবে কেমন করে? ওরা যদি কেউ সাড়া দেয় খাদের নীচ থেকে? হঠাৎ যদি চিৎকার করে ওঠে চানকমুলে মুখ বাড়িয়ে—ওগো আমরা বেঁচে আছি, তোমরা আমাদের এখান থেকে তুলে নিয়ে যাও। পরিচিত কণ্ঠের সেই ডাকটুকু শোনবার জন্যই কান পেতে যে খাদমোয়ানে বসে আছে এরা।

অবুঝ মনের অন্তহীন আশা আর অবিশ্বাস্য আশ্বাস নিয়ে এখনো এরা মুহূর্ত গুনছে অধীর প্রতীক্ষায়। লোকগুলো হয়তো উঠে আসবে, এক্ষুনি হয়তো উঠে আসবে শ্রান্ত ক্লান্ত দেহভার নিয়ে। এসে হয়তো লুটিয়ে পড়বে সুরজমিনের ভিজেমাটির উপর। ওদের কোন রকমে ঘরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে যে। সঙ্গে ওদের না নিয়ে শূন্য ঘরে এরা ফিরবে কেমন করে?

বীতবর্ষণ হালকা মেঘের গুমোট এখনো আছে কিছুটা। মাঝে মাঝে ঝলকাচ্ছে এলোমেলো বিদ্যুতের ঝিলিক্। বিষাদমৌন গভীর রাতের কালো মাটির বুকে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে যেন গুমরাচ্ছে। আকাশ-ছেঁড়া হালকা মেঘের শেষ ক-ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ল অন্ধকারের কপোল বেয়ে। কাঁদছে বুঝি রাত্রিজননী, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে যেন হাপুস নয়নে।

—মলুয়া, ওরে আমার মলুয়া, এখনো তোর কয়লা কাটা শেষ হয় নি বেটা।

ওই আবার মূর্ছিতা হয়ে পড়ল বুঝি। মালকাটা মলুয়ার মা-বুড়ি। ফিট হচ্ছে ঘন ঘন. দাঁতি লেগে গেল বুঝি। পাশের ধাওড়ার নয়না মুচির বৌ গাল দুটো তার চেপে ধরলে। দাঁতি ছাড়াবার চেষ্টা করছে মুখের মধ্যে আঙুল পুরে।

কদমডাঙার বাউরীপাড়া ভেঙে পড়েছে খাদমোয়ানে। খাদের নীচে আটকা পড়েছে অনেকগুলো জোয়ান! সারাদিন তাই পড়ে আছে কলিয়ারির ফাঁকা ডাঙায়। দাঁত দিয়ে কেউ কুটো কাটে নি সমস্ত দিন ধরে। কে করবে দানাপানির ব্যবস্থা। অন্নজল মুখে তুলবার মত মানসিক অবস্থাই বা এদের মধ্যে কটা লোকের আছে। কিছু কিছু চিঁড়ে-মুড়ির ব্যবস্থা নাকি করা হয়েছিল। বিলিয়ে গেছে বাইরের লোক এসে। এরা সেদিকে ফিরেও তাকায় নি। বাচ্ছাগুলো দু-এক মুঠো খেয়েছিল কেউ কেউ, কেউ কেউ আবার তাও খায় নি। মায়ের বুকে স্তন টানছে স্তন্যপায়ী শিশু। শূন্য বুকের

শেষ ফোঁটাটি পর্যন্ত শেষ করেছে টেনে টেনে। ঘুমিয়ে পড়েছে অবসন্ন মায়ের কোলে।

দমকা হাওয়া অতর্কিতে ঝেঁপে এল আর এক দফা। ছিটিয়ে দিলে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির ধারা। পিঠ আড় দিয়ে ঘুরে বসল মালকাটার বৌ। বাচ্ছার গায়ে আঁচল চাপা দিয়ে একটুখানি আড়াল করে দিলে।

নেতিয়ে পড়েছে নসিবন বিবি, ডাইকমিস্ত্রী আলতাব মিয়ার বৌ। একেবারে নেতিয়ে পড়েছে। মূর্ছা গেছে বার তিনেক। হুঁশ হতেই আবার সেই কান্না। মাথা ঠোকে মাটির ওপর। পাগলের মত ঝাঁপ দিতে যায় খাদে। শক্ত-সোমত্ত জোয়ান বৌ, ধরে রাখা শক্ত। অলতাব মিয়ার মা-বুড়ী বহু কষ্টে সামলে রেখেছে। কাবু হয়ে পড়েছে বৌটা, আলতাব মিয়ার সন্তান ওর পেটে। এ অবস্থায় এতখানি ধকল কি আর সয়? কেঁদে-কেঁদেই হয়তো মরে যাবে বৌটা। আলতাবের মা ছোট্ট একটা বদনা করে একটুখানি মিছরির জল জবরদস্তি ঢেলে দিলে নসিবন বিবির মুখের মধ্যে। ধাওড়ায় ওকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য বহু চেষ্টা করেছে বুড়ী। নসিবন কিন্তু নড়তে চায় না খাদমোয়ান থেকে। মুখ গুঁজে ওই পড়ে আছে একধারে। কাতরাচ্ছে দম টেনে টেনে। আলতাবের মা ভাঙা বুকে পাথর চাপা দিয়ে বৌ আগলে রাত জেগে বসে আছে ঠায়।

খসলা বাউরী রাতদুপুরে আর এক দফা ডুকরে উঠল। বাতাসী যে আগুন জেলে দিয়ে গেল খসলার বুকে। বয়ালের জলে সাঁতার কাটতে গিয়ে ডুবে গেল বাতাসী। কোন্ দিক দিয়ে কোথায় গিয়ে যে পড়ল, তার আর কোন টিক-ঠিকানাই পাওয়া গেল না। কেউ বলছে ভেসে গেছে গাড়ুই নদীর জলে, কেউ বলছে খাম্বার মধ্যে আটকে আছে রেললাইনের কালভার্টটার নীচে। খসলা কিন্তু বিশ্বাস করে না, নিজের চোখে বাতাসীকে বয়ালের জলে তলিয়ে যেতে দেখেছে যে। মস্ত একটা হাঁ মেলে আচমকা যে বাতাসীকে গিলে ফেললে খাইরাক্ষসী খাদ। সে কথা কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। খসলা কিন্তু নিয্যস জানে বাতাসী এই খাদেই আছে। আর কি তাকে ফিরে পাওয়া যাবে না? এতগুলো লোক যদি উঠে আসে খাদ থেকে সেই সঙ্গে বাতাসীও তো উঠে আসতে পারে। সেই আশাতেই বুক বেঁধে খাদমোয়ানে এসে পড়ে আছে খসলা।

কেঁদে উঠল কাজলী, বাউরী মুখুজ্যের বৌটা। খাদ থেকে কই উঠল না তো তুলতুলের বাপ। খসলাকে লক্ষ্য করে বলল, আর একটিবার দেখে

আয় ভাইটি, খাদমোয়ানে কেউ উঠল কি না। ডুলি কি ওদের নামল।

কোথায় নামবে ডুলি? ডুলিটা যে ভেঙে-চুবে বসে গেছে খাদেব নীচে। কবে তক যে নামবে ডুলি সে খবব কেউ জানে না। খসলা বাউবী হতাশভাবে বলে উঠল, কাজলদিদি!

ঘুম ভেঙে গেছে তুলতুলেব। কান্না জুড়লে কাজলীব বুকে মুখ গুঁজে, বাবা কই, কই, বাবা এখনো আসছে না যে।

সকাল থেকেই গোঁ ধবেছে তুলতুল, বাবা কই, বাবা এখনো আসছে না কেন।

তুলতুলকে বুকে টেনে বলে উঠল কাজলী ঘুমো, কোলে আমাব মাথা বেখে আব একটুখানি ঘুমিয়ে লে তুলতুল।

ঘুমাতে আব চায় না সে। মায়েব উপব বুঝি বাগ কবেই কান্নাব সুবে বলে উঠল, বাবা কই?

কি উত্তব দেবে কাজলী, উত্তব তাব নিজেবই যে জানা নেই। আব একটিবাব ভেঙে পডল বুকফাটা কান্নায, এ আম্মাদেব কি হল বে তুলতুল. তোকে নিয়ে আমি কাব দোবে গিযে দাঁডাব?

এগিযে আসছে আব একখানা সাঁজোযা গাডি। মোড ফিবল বাস্তাব বাঁকে। হেডলাইটেব তীব আলোয অন্ধকাবকে তেডে ফুঁডে গাডিখানা এসে থেমে গেল কোম্পানিব অফিসঘবেব সামনে। বন্দুক ঘাডে নেমে এল আবও কতকগুলো আর্মড পুলিস। খাদ পাহাবায ডিউটি পডেছে। টর্চবাতিব ফোকাশ কবতে কবতে এদিকওদিক ছডিযে পডল অন্ধকাবে।

অফিসঘবে আলো জ্বলছে। চাপা একটা গুঞ্জন চলেছে ভিতবে। নীল পর্দাব অন্তবালে মালিকপক্ষ সমাসীন। পাশেব একটা কামডায সলা-পবামর্শ চলছে কলিযাবিব ম্যানেজাবেব সঙ্গে। বাত জেগে ঠায বসে আছে সপাবিষদ হংসেশ্বব চেটিযা এন্ড কোম্পানী। হাতেব কাছে টেলিফোন, বুক কবা আছে আর্জেন্ট ট্রাঙ্ক। কল-এব পব কল চলছে একটাব পব একটা, মাঝে মাঝে শুধু ক্রিং ক্রিং শব্দ। বিসিভাবটা ধবাই আছে চেটিযাব কানেব কাছে। অফিস ঘবেব সামনে লাঠি কাঁধে পাহাবা দিচ্ছে জনকযেক ভোজপুবী দাবোযান।

বাত্রি ক্রমশ এগিযে চলল। বেললাইনেব ধাব থেকে কতকগুলো শেযাল ডেকে উঠল। পিটমাউথেব হাজাব ভোল্টেব বাতিটা নীচেব দিকে উঁকি মেবে দেখছে কি। জল তো এখনো একটুও কমে নি। কলিয়ারিব ইনচার্জবাবু

একদৃষ্টে চেয়ে আছেন নীচের দিকে। চানকমুলে ঘন ঘন সার্চলাইটের ফোকাশ করছেন। নাঃ—আর কোন আশা নাই, চানকের জল বাড়ছে বই কিছু কমছে না। সহকর্মীদের লক্ষ্য করে হতাশভাবে বলে উঠলেন, হোপলেস, আর কোন আশা নাই।

সাঁওতালপাড়ার হপনা হাড়াম চুপি চুপি এসে দাঁড়িয়েছিল পিছনে। তিন-তিনটে জোয়ান বেটা নেমে গেছে তাব কয়লা কাটিতে। ইনচার্জবাবুর ভাব-গতিক দেখে আঁতকে উঠল হপনা হাঁড়াম। চিৎকার করে বলে উঠল, কি বললি—কি বললি বাবু, লোকগুলো আর উঠবেক নাই?

আশেপাশে ঘাপটি মেরে বসেছিল আরও অনেকেই। হপনা মাঝির কথা শুনে চঞ্চল হয়ে উঠল। হৈ-হৈ করে উঠল একসঙ্গে, বুক চাপড়ে কান্না জুড়লে কেউ কেউ। সেপাই-শান্ত্রী পাহারাওয়ালার দল তাড়াতাড়ি কর্ডন করে ঘিরে ফেললে জায়গাটাকে। পুলিস দলের হাবিলদার সাহেব নানাভাবে শান্ত করবার চেষ্টা করছেন লোকগুলোকে। হপনা হাড়াম কর্ডন ঠেলে এগিয়ে যেতে চায়। জোর গলায় সে চিৎকার জুড়ে দিলে, খাদান পানে মুখটা বাড়াঁই কি দেখলেক ইনচার্জবাবু। আমাদিগকে একবার দেখতে দে হে, মানুষগুলোকে আমরা একবার দেখে লি।

কোথায় দেখবে মানুষগুলোকে? এখান থেকে কয়লা কাটা সুড়ঙ্গ যে অনেক দূর, সেও যে গেছে বেনোজলে ডুবে। তবু একটি বার উঁকি মেরে চানকটা একটু দেখে নিতে চায় হাপনা হাড়াম। ছেলেগুলোর যে খোঁজখবর করা দরকার।

হাপনা হাড়ামের দেখাদেখি ঝুঁকে পড়ল আরও অনেকগুলো। কর্ডনসুদ্ধ ঠেলতে থাকে পিটমাউথের দিকে। দেখতেই হবে খাদমোয়ানে উঁকি মেরে, ইনচার্জবাবু কি দেখে এল।

তুমুল একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। লোকগুলো যেন মরীয়া হয়ে উঠেছে, শুরু করে দিলে ঠেলাঠেলি ধ্বস্তাধ্বস্তি। যার যা খুশি আবোল-তাবোল বকতে লাগল নিজের মনে। উঁকি মেরে একবার খাদমোয়ানটা দেখতেই হবে, কি দেখে এল ইনচার্জবাবু।

ক্ষেপে গেছে বুঝি লোকগুলো। পাগলের মত বকছে। আরও কতকগুলো এগিয়ে এসে ভিড়ে গেল ওদের দলেই। একসঙ্গে সব ঠেলা দিচ্ছে সামনের দিকে। সিটি বাজালেন হাবিলদার সাহেব। আরও কতকগুলো সেপাই এসে ধাক্কা মেরে পিছু হটিয়ে নিয়ে চলল লোকগুলোকে।

ইনচার্জবাবু একটু গরম হয়ে উঠলেন। কি আস্পর্ধা লোকগুলোর, বেয়াদপির চরম। জোর গলায় একবার হেঁকে উঠলেন তিনি, নিকালো—নিকালো—নিকাল যাও হিঁয়াসে।

হপনা হাড়াম মরীয়া হয়ে উঠেছে। গলা ফাটিয়ে পাগলের মত চিৎকার করে উঠল, লোকগুলোকে ওরা মেরে ফেললেক, জলে ডুবাঁই মেরে ফেললেক ইঁদুরমারা করে। একটাও কেউ বেঁচে নাই, বোঙার নামে কিরা করে আমি বলতে পারি—একটাও কেউ বেঁচে নাই।

হপনা বুড়ো বলে কি! কার কাছ থেকে খবর নিয়ে এল! সঠিক খবর জানা গেল নাকি?

বিস্তীর্ণ ময়দানটার এধার থেকে ওধার পর্যন্ত নতুন করে আবার একটা চাঞ্চল্যের ঢেউ উঠল। হতাশ হয়ে ভেঙে পড়ল যেন সব। ইনিয়ে বিনিয়ে কান্না জুড়লে আবার। একটাও যে বেঁচে নাই ওরা, হপনা হাড়াম এইমাত্র খবর নিয়ে এল যে।

পাতালপুরী নিঝুম। ঝড় বইছে সারফেসের উপর। উন্মত্ত শোকের ঝড়, এলোপাথাড়ি কান্নার ঝড়। অফিস থেকে পর্দা ঠেলে বেরিয়ে এলেন মিঃ পানিগ্রাহী, কলিয়ারির ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার। দূরে থেকে লক্ষ্য করছেন কি যেন। জানালার ওপাশ থেকে সাড়া দিলে মিঃ চেটিয়া, হোয়াট আর ইউ অবজারভিং ম্যানেজার সাব। দেখছেন কি?

কথাটা হয়তো শুনতে পেলেন না মিঃ পানিগ্রাহী। একদৃষ্টে চেয়ে আছেন খোলা মাঠটার দিকে। টিমটিম করে লণ্ঠন জ্বলছে দু-একখানা। আশেপাশে ঠেসে আছে কতকগুলো ছায়ামূর্তি। অন্ধকারে মাথা কুটছে হতভাগ্যদের উদ্‌ভ্রান্ত বিলাপ।

ফাঁকা মাঠের একান্তে হঠাৎ একটা শোরগোল উঠল। অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছে ডাইকমিস্ত্রী আলতাব মিয়ার বৌ। মাটির উপর মুখ থুবড়ে গোঙাচ্ছে। চারদিক থেকে আঁচল আড় দিয়ে ঘিরে রেখেছে কয়েকজন জেনানা। আলতাব মিয়ার মা-বুড়ী চিৎকার করে গলা ফাটাচ্ছে। ওদের আবার হল কি হঠাৎ? ঘটল নাকি নতুনতর অঘটন কিছু?

অঘটন ঠিক বলা যায় না। স্বাভাবিক যা তাই ঘটেছে। আলতাব মিয়ার বিবি খাদমোয়ানে সন্তান প্রসব করেছে? ওঁয়া ওঁয়া করে কেঁদে উঠল বাচ্চাটা। ওঁয়া—ওঁয়া—ওঁয়া—

কান্না নয়, নবজীবনের জয়ধ্বনি। মৃত্যুর সঙ্গে পাশাপাশি নবজীবনের

জয়যাত্রা। আণ্ডারগ্রাউণ্ডের অতলস্পর্শী স্তব্ধতা আড়ি পেতে শুনছে বুঝি সারফেসের এই মহাসঙ্গীত—ওঁয়া—ওঁয়া—ওঁয়া।

সংবাদটা সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে রড়ল চারিদিকে। টর্চবাতি হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন কলিয়ারির ডাক্তারবাবু। মাটিতে পড়ে ট্যাঁ-ট্যাঁ করছে সদ্যজাত শিশু। নাড়ি কাটা শেষ করলেন ডাক্তার। তুলো আর ব্যাণ্ডেজের কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন নবজাতকের সর্বাঙ্গ।

কালিপড়া লণ্ঠনটা টিমটিম করে জেগে আছে একপাশে। আলতাব মিয়াব মা-বুড়ী ছানিপড়া চোখ দুটো বিস্ফারিত কবে একদৃষ্টে চেয়ে আছে বাচ্চাটাব দিকে। আর এক দফা ডুকরে হঠাৎ কেঁদে উঠল বুড়ী, ওরে আলতাব রে, তোর ভাঙা ঘরে চাঁদ উঠল রে, একবার এসে দেখে যা বাপ রে।

ওঁয়া—ওঁয়া—ওঁয়া—

এদিক-ওদিক চাইলে একবার বুড়ী। ভাঙা গলায় বলে উঠল, ওরে তোরা আজান দে, আল্লার নামে আজান দে, আমার আলতাবের যে বেটা হয়েছে।

ওঁয়া, ওঁয়া, ওঁয়া—

নবজীবনের জয়োল্লাস। কালো রাতের অন্ধকারে আলোর নিশান তুলে ধরে মৃত্যুর মুখে কালি ছিটোচ্ছে আলতাব মিয়ার লেডকা। ওঁয়া—ওঁয়া—ওঁয়া—

মহাকালের দূত খাদের নীচে কান পেতে আছে নাকি।

॥ ৫ ॥

কদমডাঙা কলিয়ারির তিন নম্বর পিট। সমস্তটাই ডুবে গেছে জলে। আটকা পড়েছে হতভাগ্য মালকাটার দল। হাবুডুবু খাচ্ছে সুড়ঙ্গের মধ্যে। লোকগুলোকে তুলে আনতে হলে তাড়াতাড়ি গোটাকয়েক জলনিকাশী পাম্প চালু করা দরকার। সে ব্যবস্থা এ পর্যন্ত হয়ে ওঠে নি। কোথায় পাম্প। দৈনন্দিন কাজ চালাবার মত সামান্য দু-একখানা পাম্প ধুঁকতে ধুঁকতে কোন-রকমে চলছিল দুর্ঘটনার আগে পর্যন্ত। বেনো জলের ধাক্কায় তাও বিগড়ে বসে আছে। ফালতু পাম্প তো এ কোম্পানী রাখে না। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রয়োজনের খাতিরে যদিও সেটা অবশ্যই রাখা উচিত। ও নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। তাই আজ এই অসময়ে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে

আছে এত বড় একটা কোম্পানী। জলনিকাশের কোন ব্যবস্থাই করতে পারে নি এ পর্যন্ত। জনমত বিক্ষুব্ধ। কোম্পানী কি লোকগুলোকে উদ্ধারের কোন চেষ্টা করছে আদৌ ? তেমন কোন লক্ষণ নেই। পাম্প এসে পৌঁছল কই এখনো, এই ভাবে ধাপ্পা দিয়েই কাজ সারতে চায় নাকি কোম্পানী। লোকগুলোকে তাড়াতাড়ি খাদ থেকে উঠিয়ে আনছে না কেন ?

মালিকপক্ষ নির্বিকার। এ কেন'র উত্তর বহুবার দেওয়া হয়ে গেছে। পাম্প এসে পৌঁছলেই ব্যবস্থা একটা হবে। এ তো আর ছেলের হাতের মোয়া নয় যে ছোঁ মেরে এনে ধরে দেবে সামনে। জহ্নু মুনির মত এক গণ্ডূষে শুষে নেবে পাতালপুরীর খাদভরা ওই অফুতন্ত বেনো জল। কোম্পানী কি করতে পারে এ অবস্থায়। করবার যা তা করা হচ্ছে। কলিয়ারি সাফ করবার ব্যবস্থা তো করতেই হবে, দুটো দিন আগে আর দুটো দিন পরে। অন্যের চেয়ে সে বিষয়ে গরজটা কিছু কম নয় কোম্পানীর। কলিয়ারিটা সাফ করতে হবে যে।

তা হলে আর চিন্তা কি। কলিয়ারি সাফ করবার ব্যবস্থা যে করতেই হবে ওদের। একেবারেই সাফ করে দেবে হয়তো, একশ বাষট্টি জন খনিকর্মীর হাড়-মাংস সমেত। বারে বারে টানা হ্যাঁচড়ার দরকার কি, একসঙ্গেই বিলকুল সাফ ; পাইকারি হারে সরকারী ব্যবস্থা। লোকগুলো তো বেশ আনন্দেই আছে, আটশ ফুট খাদের নীচে। গুলতানি করছে একসঙ্গে বসে। কিংবা হয়তো নাক ডাকাচ্ছে আরাম করে। একটানা বিশ্রাম। দম ভরে সব জিরিয়ে নিচ্ছে একটুখানি, কালোমানিকের পালঙ্কের ওপর শুয়ে। লোকগুলো হয়তো ঘুমিয়েই পড়ল। কারো বাপের সাধ্য আছে আর ওদের ঘুম ভাঙায় ?

ঘুমুচ্ছে তো ঘুমোক। কয়লা কাটা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না, আরাম করে খানিক ঘুমিয়ে নিক এই বেলা। এর জন্য হাজরী ওদের কাটা যাবে না। সশরীরে হাজির আছে খাদের নীচে, গাঁইতি ঝোড়া শাবল কোদাল সমেত। কোম্পানীর খাতায় নাগা দাগবার উপায়টি নেই। হয়তো ওদের ওভার-টাইমটাও পাইপয়সা হিসেব করে চুকিয়ে দিতে পারে কোম্পানী। পাম্প আসতে একটু দেরি হলেও এমন কিছু ক্ষতি হবে না। সেই জন্যই তো মালিকপক্ষ এতখানি নিশ্চিন্ত। লোকগুলো তো আর নিজে থেকে উঠে আসতে পারছে না, অফিস ঘরে চড়াও হয়ে ঝামেলা তো করতে আসছে না কেউ। তা হলে আর মিছেমিছি তাড়া কিসের এত। পাম্প আসছে আসুক না, বিলকুল সব ঠিক হয়ে যাবে।

হাবুডুবু খাচ্ছে কলিয়ারি অথৈ জলের দরিয়ায়। লোকগুলোকে উদ্ধার করবার জন্য রেসক্যু পার্টি হাজির আছে খাদমোয়ানে। রেসক্যুর কোন ব্যবস্থাই কিন্তু হয়ে উঠে নি এ পর্যন্ত। যতক্ষণ না জল কমছে, কেজ সার্ভিস চালু না হচ্ছে পিটারমাউথে, রেসক্যু পার্টির করবার কিছু নেই। যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম সমেত চলছে শুধু উদ্ধারকার্যের মহড়া, সারফেসের ফাঁকা ডাঙায়। জলটা একটু হঠে গেলে খাদের নীচে নামতে তো একবার হবেই।

ফেলারাম চক্রবর্তীর রেস্টুরেন্টটা আপাতত বন্ধ হয়ে গেল। সাইনবোর্ডটা ঝুলছে এখনো বটগাছের ডালে। কারবার কিন্তু বন্ধ। সেই জায়গায় রাতারাতি চালু হয়ে গেল ফেলারামের খয়রাতি এক লঙ্গরখানা। চালে ডালে এক সঙ্গে পাক করে যতটুকু পারে যোগান দিচ্ছে ফেলারাম। পাতা পেড়ে সব খেয়ে যাচ্ছে অনেকেই। খাদ্যবস্তুর মূল্য হিসাবে কিছুমাত্র আজ দাবি নেই ফেলারামের, পুরোপুরি খয়রাতি ব্যবস্থা। কলিয়ারির এই ডামাডোলের মুখে বিপন্নদের মুখ চেয়ে এটুকু আজ স্বীকার করে নিতে হয়েছে ফেলারামকে। দায়িত্বটা যখন নিজে থেকেই ঘাড়ে এসে পড়ল, হাত গুটিয়ে বসে থাকে কেমন করে ফেলারাম। লাগতেই হল কোমর বেঁধে।

দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপন্নদের সাহায্যকল্পে খাদমুন্সী ঘড়ইমশায় কলিয়ারির বাবুভেয়ে বাসিন্দাদের কাছ থেকে কিছু করে চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। ধাওড়াবাসী শোকার্ত ও দিশাহারা লোকগুলোকে অবিলম্বে যে সাহায্য করা দরকার। কে করবে ওদের দানাপানির ব্যবস্থা, কে ভাববে হতভাগ্য মালকাটাদের অসহায় স্ত্রীপুত্র পরিবারের কথা। ভাবতে হল সবার আগে কলিয়ারির লোককেই। ঘড়ইমশায় এগিয়ে গিয়ে হাত পাতলেন পাঁচজনের কাছে, নগদ কিছু সাহায্যের জন্য। আদায় হয়ে গেল গোটা পঞ্চাশ টাকা। তাই দিয়েই আপাতত শুরু করে দিলেন। জুটে গেল দু-একজন উৎসাহ সহকর্মী। সাউজীর দোকান থেকে চাল ডাল সব কিনে এনে ফেলারামের হাতে ধরে দিলেন ঘড়ইমশায়। রান্না করে খাওয়াতে হবে ক্ষুধার্তদের। সারাদিন যে উনুন জ্বলে নি ধাওড়ায় কারো। লোকগুলো সব দিশেহারা হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক। খাওয়ার কথা ভুলেই গেছে। খেতে কিন্তু হবে ওদের, না খেলে কেউ বাঁচবে না যে। ব্যবস্থা তাই করতে হল যা হোক কিছু, এ অবস্থায় যতটুকু সম্ভব। উনুন থেকে চায়ের কেটলি নামিয়ে দিলে ফেলারাম, সরিয়ে ফেললে তেলেভাজার কড়া। হাতা বেড়ি খুন্তি নিয়ে লেগে পড়ল খিচুড়ি পাক করতে।

শিকেয় উঠল ফেলারামের ব্যবসা। তা হোক গে, সেজন্য কোন আফসোস নেই ফেলারামের। কলিয়ারির বিপদ যদি কাটে কোনদিন—ব্যবসা আবার জমিয়ে নেবে ফেলারাম। খেয়ে পরে বাঁচবার তার অভাব হবে না। এই কলিয়ারির কুলিকামিন মালকাটারা বহুদিন ধরে অন্ন জুগিয়েছে ফেলারামকে। তাদের এই চরমতম দুঃসময়ে ফেলারাম কি হাত গুটিয়ে পিছিয়ে থাকতে পারে! তারও যে কিছু করবার আছে। হদিশটুকু যুগিয়ে দিলেন ঘড়ইমশায়। আর্তের সেবা, বিপন্নের সাহায্য, আরও যেন কি সব ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছিলেন ফেলারামকে। ফেলারাম তার নিগূঢ় অর্থ বোঝে না, মন কিন্তু সায় দিয়ে উঠল—তারও যে কিছু করবার আছে। চা তেলেভাজা পানবিড়ির ব্যবসা দিনকয়েক না হয় বন্ধই রইল ফেলারামের।

দেখেশুনে ভ্যাবাচ্যাকা মেরে গেছে গোলাপী। পান সাজা আর সুপারি কাটা বন্ধ হয়ে গেছে। বান ঢুকেছে খাদের নীচে, ডুবে গেছে মালকাটারা ; গোলাপীর সব পানবিড়ির খদ্দের। ওদের সবগুলোকেই যে চেনে গোলাপী। জলজ্যান্ত কয়লা-কাটা মানুষগুলো। গাঁইতি হাতে একে একে নেমে গেল খাদে, আর কিন্তু উঠল না। সর্বাঙ্গে কালিঝুলি মেখে খাদ ফেরত কেউ ভিড় করে আর দাঁড়াল না এসে বটতলার চায়ের দোকানে। শোরগোল উঠল চারিদিকে, কান্নার চোটে ফেটে পড়ল আশপাশাড়ী ধাওড়াগুলো। এ কান্না যে আর সইতে পারছে না গোলাপী। চারিদিকে শুধু হৈ-চৈ, সাহেবসুবোব আনাগোনা আর লালপাগড়ির হাঁকডাক। এই সমস্ত দেখে শুনে হাঁপিয়ে উঠেছে গোলাপী। পালাই পালাই ডাক ছাড়ছে মনের মধ্যে। পালাবার কিন্তু উপায় নেই কদমডাঙা কলিয়ারি ছেড়ে। গোলাপীর যে নানান গেরো। হাজার দিকে হাজার পাকে জড়িয়ে পড়েছে গোলাপী, ফসকে বেরোবার উপায় আছে কি। গোলাপী হঠাৎ সরে গেলে ফেল পড়ে যাবে ফেলারামের দোকানটা। লোকটা একেবারে পথে বসে যাবে। অসহায় এই গোবেচারা মানুষটাকে এত বড় একটা দাগা দিয়ে যায় কেমন করে গোলাপী। বিয়ে করা বৌ হলে কি এ কথা সে ভাবতে পারত। ভাবতেও সে চায় না। ঘর বেঁধেছে যাকে নিয়ে—গোলাপী আজ তারই ঘরের ঘরন্তী, সাক্ষী ওই বটেশ্বরী মা। তারই নামে শপথ করে ঘর বেঁধেছে বটগাছের ছায়ায়। সে কথা কেউ জানুক আর না জানুক ফেলারাম তো জানে। থাকতেই হবে গোলাপীকে এইখানেই পড়ে, অন্তত চক্রবর্তী নিজে থেকে যতক্ষণ না ছেড়ে যায় এই বটতলার মায়া। এ মায়া কি আর ইহজীবনে কাটাতে পারবে গোলাপী, এ

ঝকমারি এড়াবার কি উপায় আছে।

মনে মনে কত কথাই ভাবছে আজ গোলাপী। বোঝার উপর শাকের আঁটি, বাবুয়াটা এসে জুটে গেল হঠাৎ। বলে পেটভাতায় নোকরি করব, দুনিয়ায় কেউ নেই আমার। নেই যদি তো লোকের কি, তুই আবার কি নোকরি করবি রে হতচ্ছারা। এটা কি তোর নোকরি করবার বয়েস। ছোঁড়া আবার মা বলে ডাকে, বলে মাইয়া; নিপুতি গোলাপীকে বলে কিনা মাইয়া, বোঝ একবার শয়তানিটা। কোথাকার এক পরদেশী ছোঁড়া এসে গোলাপীকে হঠাৎ মা ডেকে বসল। তাড়াও এবার কেমন করে তাড়াবে। ফেলারামকে বলে কয়ে রাখতে হল ছোঁড়াটাকে। থাক মুখপোড়া এক ধারে পড়ে, খেয়ে পরে মানুষ হয়তো হোক। মা ডেকেই যদি সুখ পায় তো পাক হতভাগা, গোলাপী আর বাদ সাধতে যায় কেন। কিন্তু এ যে আবার এক নতুন ফ্যাঁসাদ, ছেলেটার উপর ক্রমশই যে মায়া পড়ে যাচ্ছে। এ আবার কি ঘোড়ারোগে ধরল হঠাৎ গোলাপীকে। মরণ আর কি, ঝাঁটা মারো।

মনে মনে নিজের ভাগ্যটাকেই ঝাঁটা মারে গোলাপী। গায়ে কারো লাগে না। এতকাল ধরে ফেলারামের গায়েও ওটা লাগে নি। গোলাপীর মুখের ঝাঁটা কাজের বেলা ঝাড়ু হয়ে অজান্তে তার বারেবারেই লেগে পড়েছে বটতলার উঠান ঝাড়ু দিতে। সত্য কথা বলতে কি ফেলারামের ফাঁস আর বাবুয়ার গেরো, ও দুটোই সমান, ছাড়াও এ জট কেমন করে ছাড়াবে। বটতলার এই ঘর সংসার ভিটেমাটি ছেড়ে গোলাপীর যে বাইরে কোথাও পা পাড়াবার উপায় নেই।

ফেলারামের সহযোগিতা পেয়ে ঘড়ইমশায় নিশ্চিন্ত হলেন। এগিয়ে গেলেন গোলাপীর দিকে, ডেকে হেঁকে লাগিয়ে দিলেন তরিতরকারি কুটতে। এ একরকম ভালই হল, মনটা ভারি মুষড়ে পড়েছিল গোলাপীর। হাতের কাছে যা হোক কিছু নতুন একটা উপলক্ষ্য পেয়ে গোলাপী যেন বর্তে গেল। হাঁড়ি হেঁসেল হাতাবেড়ি নিয়ে লেগে পড়ল ফেলারামের সঙ্গে।

বেলা গড়িয়ে আসছে। রান্নাবান্না শেষ হতে প্রায় বিকেল হয়ে গেল। খাদমোয়ানের মাঠটায় খিচুড়ির বালতি নিয়ে হাজির হল গিয়ে ফেলারাম। বাবুয়ার হাতে কুমড়োর ঘণ্ট। শালপাতার তাড়া খুলে ফাঁকা মাঠে ঘাসের উপর এক-একখানা করে সাজিয়ে দিচ্ছেন খাদমুন্সী ঘড়ইমশায় নিজে। আয়োজন অতি সামান্যই, নিষ্ঠা কিন্তু কম নয় এঁদের। বিশেষ এই ক্ষণটিতে এই যৎসামান্য সাহায্যটুকু নিয়েই বা এগিয়ে আসে কজন। ময়দানের একান্তে

একে একে পাতা পড়তে লাগল। খেয়ে গেল অনেকেই। না খেয়ে আর উপায় কি, কতক্ষণ আর না খেয়ে থাকতে পারে মানুষ। ওদের মধ্যেই কেউ কেউ আবার খেলেও না। কয়লাখনির হতভাগ্য শ্রমজীবীর দল, মুখ দিয়ে যে দানাপানি উঠতে চায় না সহজে। ফেলারাম আর ঘড়ইমশায় হাত ধরে সব একে একে টেনে এনে বসালেন কতকগুলোকে। খেতেই হবে একটুখানি, শোক করবার সময় তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।

খাদ ডুবেছে সকালবেলা। ঘনিয়ে এল সেই সকালের সন্ধ্যা। কালরাত্রির ছায়া পড়ল কদমডাঙার সারা ডাঙা জুড়ে। এদিক ওদিক গোটা তিনেক লণ্ঠনের আলো জ্বেলে চলতে লাগল পরিবেশনের কাজ। খয়রাতি অন্ন। সারাদিনের শ্রান্ত ক্লান্ত ক্ষুৎপীড়িত মানুষগুলো খাচ্ছে কিন্তু তৃপ্তি করে। দ্বিধা সঙ্কোচ মনের বিকার এর মধ্যেই যেন কেটে আসছে কিছুটা। খেয়ে গেল সব পাতা পেড়ে ধাওড়াবাসী অনেকেই। বাউরীপাড়ার কজন এসে নিজে থেকেই পাতা পেড়ে বসল। কষ্ট করে আর ডাকতে হল না। সন্ধ্যার মুখেই শেষ হয়ে গেল বেশ কয়েকটা বালতি। এগিয়ে আসছে শেখপাড়ার হিন্দু বুড়ো, লাঠি ঠুক ঠুক করতে করতে। সঙ্গে কটা নাতি-নাতনী। ভাতিজাটা আটকে পড়েছে খাদের নীচে। দানাপানির যোগাড় নাই, তার বাচ্চাগুলোকে এই সময় একবার খাইয়ে নেওয়া দরকার যে। এগিয়ে এল শেখ বুড়ো, হাঁক দিলে একটা ফেলারামকে লক্ষ্য করে, চক্রবর্তী না কে বটে হে, খিচুড়ি আর আছে নাকি। দিতে পার এই বাচ্ছাগুলোকে দু-এক ডাবু।

পাতা পড়ে গেল পাশাপাশি পাঁচখানা। সাগ্রহে বলে উঠল ফেলারাম, বসো চাচা বসো, তুমিসুদ্ধ বসে যাও এই সঙ্গে, যেমন পার খাও দু-এক মুঠো।

জড়োসড়ো হয়ে বসল একপাশে হিঙ্গু শেখ। জল গড়াচ্ছে দু চোখ বেয়ে। দু-এক ফোঁটা বুঝি ঝরেই পড়ল পাতার উপর। চোখের জলে বিস্বাদ হয়ে উঠছে যেন মুখের গ্রাস। ভাতিজাটা রয়ে গেল খাদের নীচে, হিঙ্গু শেখের পোড়া পেট কি তা বুঝবে।

হিঙ্গু শেখের মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে কথাটা ; পোড়া পেট কি বুঝবে। তা অবশ্য বুঝবে না। আজ না হলেও কাল থেকে আর বুঝবে না, বুঝতে চাইবে না কিছুতেই। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা, পেট যে বড় বালাই। বাঁচতে হলে ওর সঙ্গে একটা রফা না করে উপায় নেই। হিঙ্গু শেখ তাই করে নিলে। একহাত দিয়ে চোখ মুছছে, আর এক হাতে অন্নের গ্রাস। মাঝে মাঝে বাচ্চাগুলোর মুখের দিকে তাকাচ্ছে হিঙ্গু, খাচ্ছে ওরা বেশ তৃপ্তি করে।

ডাগর ডাগর হাঁ মেলে বেশ খাচ্ছে ক্ষিদের চোটে। আহা খাক, পেট ভরে সব খেয়ে নিক ; সারাদিন যে অন্ন জোটে নি।

—কে রে, ওখানে এসে দাঁড়ালি কে, মুচিপাড়ার ধনঞ্জয় নাকি। খিচুড়ি একটু খাবি নাকি ধনঞ্জয়। বসে পড়, বসে পড় সব একধারে।

ধনাই মুচির দলটাকে ওধারপানে বসিয়ে দিলে ফেলারাম। ঘড়ইমশায় ঙ্গে সঙ্গে খানকয়েক পাতা পেড়ে দিলেন।

পাশে কজন ঘোমটা দেওয়া বৌ। জড়সড়ো হয়ে বসে আছে একধারে। পশ্চিমা ধাওড়ার বৌ-বেটীরা হবে হয়তো কেউ। সঙ্গে তাদের আঁকুড়েপাড়ার মতিয়ার মা। ওরাও দুটো খাবে, না খেয়ে আর উপায় নেই। সারাটা দিন উপোস গেছে, কেঁদেকেটে হয়রান হয়ে পড়েছে সব এক ধার থেকে। পোড়া পেটে আগুন জ্বলছে যে, খেতে হবে একটুখানি।

পাতা নিয়ে এগিয়ে গেলেন ঘড়ইমশায়। লণ্ঠন একটা বাড়িয়ে দিলেন সামনের দিকে। মেয়েরাও সব এসে পড়েছে। ভালই হল, ওরাও দুটো খেয়ে যাক।

খাদ্য পড়ল মেয়েদের পাতায়। বাবুয়া গিয়ে পাতার পাশে ধরে দিলে খানিকটা করে কুমড়োর ঘণ্ট। বালতিও প্রায় শেষ হয়ে এল ফেলারামের। ঘড়ইমশায় তাকালেন একবার ফেলারামের মুখের দিকে। প্রশ্ন করলেন চাপা গলায়, কুলোবে তো ফেলারাম, আছে আর কিছু স্টকে?

ফেলারাম বললে, আছে বইকি, অনেক আছে ; স্টক খালি হতে ঢের দেরি এখনো। সেজন্যে আপনি ভাববেন না, কুলিয়ে যাবে কোন রকমে।

খালি বালতি হাতে নিয়ে ছুটল আবার ফেলারাম। ঘড়ইমশায় একটু নিশ্চিন্ত হলেন। লোক কিন্তু ক্রমশই বাড়ছে। এগিয়ে আসছে ওদিক থেকে আরও কতকগুলো। চাউর হয়ে গেছে চারিদিকে, খাদমোয়ানে লোক খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে, যার খুশি সে পাতা পেড়ে খেয়ে যেতে পারে। এতক্ষণ কিন্তু কারো তেমন আগ্রহ দেখা যায় নি। ডেকে এনে সব খাওয়াতে হয়েছে। আর হয়তো ডাকতে হবে না, নিজে থেকেই এগিয়ে আসছে।

উপর দিকে লণ্ঠনটা একবার তুলে ধরলেন ঘড়ইমশায়। এদিক-ওদিক লক্ষ্য করে দেখে নিলেন একটিবার। আন্দাজ করবার চেষ্টা করছেন সমবেত খাদ্যপ্রার্থীর আনুমানিক সংখ্যাটা। বাবুয়াকে একটা হাঁক দিয়ে বললেন, ঝাঁ করে গিয়ে নিয়ে আয় দেখি আরও গোটাকয়েক শালপাতার তাড়া।

বটতলার পথ ধরে ছুটল আবার বাবুয়া। ঘড়ইমশায় পংক্তি করে পাতা

সাজাচ্ছেন। চারদিক থেকে লোক কিন্তু জুটে গেল অনেকগুলো। পিছনে আরও আসছে, আবছা আলো অন্ধকারে সার দিয়ে সব এগিয়ে আসছে। ওরাও এসে একসঙ্গে সব পাতা পেড়ে বসে যাবে নাকি! আয়োজনে শেষ পর্যন্ত টঁ্যাক ধরলে হয়।

ঘড়ইমশায় একটু চিন্তায় পড়লেন। দল বেঁধে সব এগিয়ে আসে যে। একসঙ্গে অতিরিক্ত ভিড়টা কোন কাজের কথা নয়। দেখতে দেখতে জুটে গেল যে অনেকগুলোই। এত বড় একটা ভুখা মিছিলের মহড়া নিতে হবে নাকি শেষ পর্যন্ত। আয়োজন যে বেশি কিছু করতে পারা যায় নি, সে কথা কি বুঝবে ওরা। দলে দলে এগিয়ে আসছে যে।

জঠরাগ্নি জ্বলছে। উথলে উঠছে সব কিছুকে ছাপিয়ে। খাদমোয়ানের সারাটা মাঠ জুড়ে ধীরে ধীরে জেগে উঠছে মহাবুভুক্ষা। জেগে উঠছে মাথা চাড়া দিয়ে। এতগুলোর ঐকান্তিক দুর্জয় শোককে নিমেষে যেন গ্রাস করতে চায়। হাজার বুকে রাবণের চিতা। ধিকি ধিকি জ্বলছে। বুকগুলোকে পুড়িয়ে যেন খাক করে দিয়ে গেল। কলজেগুলো পুড়ছে এখনো, দগ্ধাচ্ছে শোকানলে। বান ঢোকা ওই গোটা একটা খাদের জলে এ আগুন কি নিভবে! গিস্‌গিসে তুষের আগুন, কিছুতেই যে নিভতে চায় না। সামনা-সামনি এগিয়ে আসছে ছদ্মবেশী আর এক হুতাশন। এগিয়ে আসছে লকলকে শিখা মেলে, অগ্নিরূপী মূর্তিমান ক্ষুধা। ছাইচাপা তুষের আগুনকে হাঁ করে যেন গিলে ফেলতে চায়। শোক আর ক্ষুধা, মুখোমুখি দুই অগ্নিবাণ। এ যেন ওকে ভস্ম করতে চায়।

পাশে নিঝুম মৃত্যুপুরী। কালরাত্রির অন্ধকারে থানা গেড়ে যেন বসে আছে উন্মত্ত শোকের বিকরাল ছায়ামূর্তি। তারি মাঝে গর্জাচ্ছে মহাবুভুক্ষা —ভুখা হুঁ, ম্যয় ভুখা হুঁ। জঠরের যজ্ঞশালায় অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে, ব্রহ্মকে এনে আহুতি দাও আমার গর্ভে—ওঁ স্বাহা। অন্ন-ব্রহ্মের উপাসক আমি, তাকে না হলে চলে না; একাধারে আহার আর ঔষধ। ব্রহ্মকে আমি উদরসাৎ করে ব্রহ্মানন্দে বিলীন হতে চাই। এই আমার তপস্যা। আমি যে তোমার ক্ষুধা। অনিত্য ইহসংসারে আমি তোমার নিত্য ধন, সর্বব্যাপী সর্বগ্রাসী হুতাশন, কুটস্থ দেহারণ্যে নিষুপ্ত দাবানল। আমি তোমার ধারক, জীবনযুদ্ধের সারথি, পরমার্থের পাথেয়। তোমার পুরুষকার যে আমারই হাতের ক্রীড়নক, দাসানুদাস ভৃত্য। আমি তোমার ক্ষুধা। নিখিল বিশ্বচরাচরব্যাপী সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ঙ্করী মহাশক্তির আধারে লুকিয়ে আছে আমারই এক শক্তিরূপী সর্বব্যাপী

সত্তা, সে আমিই···ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা। মনে প্রাণে অর্চনা কর তাকে। শোক করা তো অনেক হল, আর কেন। এবার আমায় তৃপ্ত কব, শুরু কর অন্নাহুতি—ওঁ স্বাহা, ওঁ স্বাহা।

শোকার্ত ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে। এগিয়ে আসছে দলে দলে বুভুক্ষু মানবাত্মা। দাও দুটো অন্ন। এ বস্তুটির দরকার ছিল, নিতান্তই দরকার ছিল। ব্যবস্থা যখন করেছ—দাও খানিকটা মুখের কাছে এগিয়ে, যেমন পারি খেয়ে যাই দুটো। আত্মাকে আর মিছেমিছি কষ্ট দিয়ে লাভ কি।

হাঁপিয়ে উঠল ফেলারাম পরিবেশন করতে করতে। বেড়েই চলল খাদ্যের চাহিদা। এভাবে কি বেশিক্ষণ আর যোগান দেওয়া যাবে, আয়োজন অতি সামান্য যে।

কুমড়োর ঘণ্টটা একেবারেই শেষ হয়ে গেল। বাবুয়ার ছুটি, চেঁচে পুছে খালি করে দিলে পাত্রটা। আর নেই। শালপাতার তাড়াগুলো উড়ে গেল খুলতে খুলতেই। ঘড়ইমশায়েব কাজ কিছুটা এগিয়ে গেল আপনা থেকেই। আপ্যায়িত করে পাতা পেড়ে আর বসাতে হল না। কাড়াকাড়ি করে তারা থেকে এক-একখানা টেনে নিয়ে নিজে থেকেই বসে পড়ল প্রায় শ দেড়েকের উপব। পংক্তির একধার থেকে পরিবেশন করে যাচ্ছে ফেলারাম। মাত্রা একটু কমিয়ে দিলে, আয়োজন যে শেষ হয়ে আসছে। লোক কিন্তু বাকি এখনো অনেক, পংক্তির শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে তো ফেলারাম!

এগিয়ে আসছে আরো অনেকেই। চারিদিকে কালো ছায়া। হঠাৎ যেন একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল ফেলারাম। খালি বালতি হাতে নিয়ে ছুটল আবার বটতলার হেঁসেল পানে লক্ষ্য কবে। যেত হল না বেশীদূব, কালিপড়া একটা লণ্ঠন হাতে ঝুলিয়ে খিচুড়ির হাঁড়ি নিয়ে গোলাপী এসে সামনে দাঁড়াল। বালতি দুটো গোলাপীর সামনে ধরে দিলে ফেলারাম। বললে—ঢেলে দে, যা আছে সব তাড়াতাড়ি ঢেলে দে এই বালতির মধ্যে।

হাঁড়িটা গোলাপী উপুড় করে দিলে ফেলারামের বালতির উপর। আধ-বালতিও ভরল না। মুখখানা একটু নীচু করে বললে গোলাপী, এই শেষ, হেঁসেলে আর নেই কিছু।

ফেলারাম যা আশঙ্কা করেছিল। দমে গেল ফেলারামের মনটা। হতাশ ভাবে বলে উঠল, বলিস কি গোলাপী, হেঁসেলে আর নেই কিছু? লোকগুলো যে পাতা পেড়ে বসে আছে।

সন্তর্পণে এগিয়ে এলেন ঘড়ইমশায়। "ব্যাপারু" দূর থেকেই এঁচে

নিয়েছেন। চাপা গলায় বললেন, কেটে পড় ফেলারাম, চুপচাপ গিয়ে শুয়ে পড় বাতি নিবিয়ে। করবার আর নেই কিছু।

দূর থেকে তাকাল একবার ফেলারাম অপেক্ষমাণ বুভুক্ষুদের পানে। পাতা পেড়ে ঠায় বসে আছে সব। পরিবেশনের দেরি দেখে অর্ধভুক্ত কয়েকজন এগিয়ে এল অধৈর্য হয়ে। এঁটো পাতা হাতে নিয়েই এগিয়ে এল খবর নিতে, আর কিছু পাওয়া যাবে কি? কি আর ছাই পাওয়া যাবে, হাঁড়ি হেঁসেল বাডন্ত যে। লোকগুলো তবু বিশ্বাস করতে চায় না। লোভাতুর দৃষ্টি মেলে ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে আছে ফেলারামের বালতির দিকে। মুখ ফুটে একজন বলেই ফেললে, দাও ঠাকুর আরও দু-এক ডাবু, আধ-খাওয়া করে উঠে এসেছি যে।

আরও কয়েকজন অভুক্ত দাঁড়িয়েছিল পিছন দিকে। এগিয়ে এল একজন, ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল, আর আমরা, আমরা যে এসে পাতা পেড়ে বসে আছি কখন থেকে।

ফেলারামের বালতিটাকে ঘিরে দাঁড়াল লোকগুলো। শুরু হয়ে গেল ঠেলাঠেলি, অভুক্ত বনাম এঁটো পাতা। হতচকিত ফেলারাম থ মেরে গেছে। কি বলে সে বোঝাবে যে ভাণ্ডার তার নিঃশেষ, সম্বল এই একটুখানি মাত্র।

বোঝাতে আর কিছুই হল না ফেলারামকে। বোঝাপড়া ওরা নিজেরাই করে নিলে। এঁটো পাতাকে পাশ কাটিয়ে লম্বা একটা ড্যাক ফেলে এগিয়ে এল অভুক্ত দলের এক মুখপাত্র। ফেলারামের হাত থেকে খিচুড়ির বালতিটা ছোঁ মেরে টেনে নিয়ে হনহন করে এগিয়ে চলল ময়দানের দিকে। পাতা ওদের পাড়াই আছে, পরিবেশনের কাজটুকু নিজেই ওরা সেরে নিতে পারবে।

পাতাগুলো কিন্তু ফিরে গিয়ে আর পাওয়া গেল না। কে কোত্থেকে এসে দখল করে বসে পড়েছে। ওরাই আবার পাতাগুলো হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে খাদ্যবস্তুর পাত্রটিকে ঘিরে দাঁড়াল। পরিবেশন আর করতে হল না কাউকে। একে একে সব বালতির মধ্যে হাত ডুবিয়ে যে যতটুকু পারলে হাতামুঠো বেটে নিয়ে বসে পড়ল এদিক-ওদিক। আরও কতকগুলো মালকাটা এগিয়ে এসে উঁকিঝুঁকি মারছে। একটুখানি কোনরকমে পাওয়া যায় যদি। একদানা খাদ্যের মূল্য হঠাৎ যেন আজ অমূল্য হয়ে উঠেছে এদের কাছে। করুণ একটা গুঞ্জন উঠল চারদিক থেকে, আমাদের কিছু দাও, একটুখানি দাও বাবারা, ক্ষিদের চোটে আমরা যে মারা পড়ে গেলুম।

দূর থেকে চেয়ে আছে ফেলারাম। অবস্থাটা সুবিধের নয়। মরীয়া হয়ে

উঠবে নাকি লোকগুলো। ক্ষিদের চোটে শেষ পর্যন্ত ক্ষেপে যাবে না তো। দল বেঁধে সব একসঙ্গে যদি তাড়া করে আসে। সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে উঠবে যে।

বালতি নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে গেছে। বিশৃঙ্খল ওই হৈ-হট্টগোলের মাঝখানে খালি বালতিটা উপর দিকে তুলে ধরলে একজন। উপুড় করে দেখিয়ে দিলে ওতে আর নেই কিছু।

দমে গেল লোকগুলো। হাতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলে। চাপা পড়ে গেল বিক্ষুব্ধ কলগুঞ্জন। খয়রাতি অন্ন, বলবার কারো নেই কিছু, পেট যদিও পুড়ছে। তা পুড়ুক, এ নিয়ে আর এতখানি হৈ-চৈ করা চলে না। খাদের নীচে ঘাটি গেড়ে বসে আছে মহামরণ। কালরাত্রির অন্ধকারে মিশে আছে প্রেতপুরীর ছায়া। সাহস করে তবু গায়ে গায়ে গা ঠেকিয়ে এক জায়গায় জমায়েত হয়ে বসে আছে লোকগুলো। বসে বসে সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে গেল। শোকে আর দুঃখে, উদ্বেগে আর হতাশায় ধুঁকছে ওদের অন্তরাত্মা। এ অবস্থায় সামান্য একমুঠো অন্নের জন্য এইভাবে কি ছ্যাচড়ামি করা চলে। পেট কিন্তু বোঝে না, বেয়াড়াপনার অন্ত নেই তার। ভিতর থেকে হাক ছাড়ছে, ভুখা হু, ম্যয় ভুখা হুঁ; এগিয়ে এসে মুখের কাছে একমুঠো কেউ ধরে দিতে পার বাবারা।

ঘড়ইমশাই ঠিক বুঝে গা ঢাকা দিয়েছেন। ফেলারাম আর দাঁড়াল না, খিচুড়ির খালি হাঁড়িটা তুলে নিয়ে বটতলার পথ ধরলে। গোলাপীর হাতে লণ্ঠন, বাবুসার হাতে খালি চাটু, বালতি। মালকাটা বুধন বাউরীর বৌটা গোটা তিনেক ছেলেমেয়ে সমেত সঙ্গ ধরলে ফেলারামের। বছর দুইয়ের বাচ্চাটা তার কোলে। কাতরাচ্ছে বাচ্চাটা, নেতিয়ে পড়েছে ক্ষিদের চোটে, বায়না ধরে দু খাবার জন্য। হ্যাংলা ছেলের পেটের দায়ে ফেলারামের পিছু পিছু ধাওয়া করেছে বুধনের বৌ, কয়লাকাটা জনমজুরের ঘরবাধুনী ঘরনী। কিছু দূর গিয়ে ধরে ফেললে ফেলারামকে। বেগত্তা করে বলে উঠল, হেই ঠাকুর তোমার পায়ে পড়ি, ছেলেটাকে আমার দাও কিছু।

পিছন ফিরে তাকাল একবার ফেলারাম, দাঁড়িয়ে গেল মাঝ পথে, একটু মোলায়েম সুরে বললে, হাঁড়িতে যে আর নাই কিছু বাউরী বৌ, হাঁড়ি যে একদম খালি।

কান্না জুড়লে ছেলেমেয়েগুলো। কোলের ছেলেটা বিকৃত স্বরে গোঙাচ্ছে। ফেলারামের হাঁড়িটা হঠাৎ খপ করে চেপে ধরলে বুধনের বৌ, বললে, [illegible]

ঠাকুর, ডাঁড়াও একটুন, হাত দিয়ে খানিক চেঁছে লি তোমার হাঁড়িটা, চেটেপুটে খাক ছেলেগুলোন।···কোলের বাচ্চাটাকে তাড়াতাড়ি মাটির উপর নামিয়ে দিয়ে হাঁড়ি চাঁছতে শুরু করলে বুধনের বৌ।

পিছন থেকে গুটি গুটি এগিয়ে আসছে থুরথুরে এক বুড়ী। এসেই হঠাৎ চেপে ধরলে হাঁড়ির কানায়। হাত ডুবিয়ে হাতড়াচ্ছে বুড়ী। বুধনের বৌ তলানিটুকু কোন রকমে সংগ্রহ করে একটু একটু বেঁটে দিচ্ছে বাচ্চাগুলোকে। নিতান্তই পাখীর আহার, ভাগে পড়ল দু-চার দানা করে, চেটেপুটে তাই খাচ্ছে ছেলেগুলো। বুড়ী কিন্তু থাবা দিয়ে টেনে নিচ্ছে অনেকখানা করে। সাপটাচ্ছে মুখের ভিতর মুঠো ভরে। বুধনের বৌ গজরাচ্ছে মনে মনে। ছেলের আহার কেড়ে খায় বুড়ী, লজ্জাও তো করে না।

হাঁড়িখানা চেঁছে তাড়াতাড়ি আর খানিকটা উঠিয়ে নিলে বুধনের বৌ, ধরে দিলে ছোট ছেলেটার সামনে। দু হাত দিয়ে মায়ের হাতখানাকে চেপে ধরে জিভ বের করে চাটতে লাগল বাচ্চাটা। মরীয়া হয়ে চুষতে লাগল আঙ্গুলের ফাঁকগুলো। আর একটু—আর একটুখানি যেমন করে হোক খাওয়াতেই হবে। হাঁড়ির মধ্যে হাত ডুবালে বুধনের বৌ, হাত ঠেকল বুড়ীর হাতে; চেপে ধরলে বুড়ীর হাতখানা শূন্যগর্ভ হাঁড়ির মধ্যে। অবোধ শিশুর মুখের গ্রাস খাবল মেরে কেড়ে খায় বুড়ী, হাত থেকে ওর ছিনিয়ে নিতে হবে। হাঁড়ির মধ্যে শরকাঠির মত শীর্ণ শুকনো আঙ্গুলগুলোয় টান পড়ল বুড়ীর, চেপে ধরেছে বুধনের বৌ। মুখখানা একটু বিকৃত করে কোটরগত চোখ দুটো মেলে তাকাল বুড়ী বুধন মালকাটার বৌয়ের দিকে। ভেংচি কেটে বলে উঠল, ভাতারখাকী, ভাতার পুতের মাথা খাবি যে।

হাঁড়িটা এবার জোর করে টেনে ধরলে ফেলারাম। পিছনে ওই কালো ছায়া, আরও কয়েকটা এসে পড়ল বুঝি। তাড়াতাড়ি বলে উঠল ফেলারাম, ছেড়ে দে—ছেড়ে দে এবার বুধনের বৌ, কেনে মিছেমিছি খালি হাঁড়ি নিয়ে টানাটানি করছিস।

হাঁড়িটা এবার জোর করেই ছাড়িয়ে নিলে ফেলারাম। দূরে ওই কালো ছায়ার সংকেত। গোলাপীকে তাড়া দিয়ে বললে, আলোটা নিয়ে এগিয়ে চল—এগিয়ে চল তাড়াতাড়ি, হাঁ করে দেখছিস কি।

এগিয়ে চলল ফেলারাম হনহন করে। বুধন বাউরীর ছেলেটা কিন্তু কাঁদছে এখনো। পিছু পিছু খানিক ছুটে গেল বুধনের বৌ, পথ আগলে দাঁড়িয়ে গেল ফেলারামের। হাত বাড়াচ্ছে শুকনো খটখটে হাঁড়িটার দিকে।

পাশ কাটালে ফেলারাম। এর পর আর রাতদুপুরে ঝামেলা বাড়াতে চায় না। ত্রস্ত পদে এগিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ল বটতলার আস্তানায়। ঝড়াম করে শব্দ হল একটা। ভিতর দিক থেকে ঝাঁপ ফেলে লণ্ঠনটা সঙ্গে সঙ্গে নিবিয়ে দিলে ফেলারাম।

হাতাশভাবে মধ্য পথে থমকে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল বুধনের বৌ। আর কোন আশা নেই।

কোলের ছেলেটা চিঁ চিঁ করে চেঁচাচ্ছে। আর একদফা ঘ্যান ঘ্যান করে উঠল, এঁ্যা-এঁ্যা-এঁ্যা—বাত খাবো, এ দিদি, মাকে দুটো বাত দিতে বল না।

রাতদুপুরে ভাত কোথায়। টঁ্যা টঁ্যা করে কাঁদছে তবু উনোনমুখো ছেলে। তেতোবিরক্ত করে ফেললে আবাগীর বেটা।

অধৈর্য হয়ে উঠল মালকাটা বুধনের বৌ। মাটির ওপর ধপ করে নামিয়ে দিলে ছেলেটাকে। পিঠের উপর বসিয়ে দিলে গোটা কয়েক চাপড়, খা পিণ্ডি, খা কত খাবি। বাপকে খেয়ে পেট ভরল না হাড়হাবাতের বেটা। খা এবার তোরা আমাকে, খিমচে খিমচে চিবেঁয় চিবেঁয় খা।

পাগলের মত বুক চাপড়াতে শুরু করলে বুধনের বৌ। বাচ্চাটা ককাচ্ছে। বাকি দুটোও ফঁ্যাস ফঁ্যাস করে কান্না জুড়ে দিলে।

দমে গেল বাউরীবৌয়ের মনটা। ছেলেমেয়েগুলো একসঙ্গে কাঁদে যে। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল একবার বাচ্চাটার দিকে। হাত বাড়িয়ে টেনে নিলে কোলের কাছে। পেটের জ্বালায় কাঁদছে, পিঠের উপর বাড়ি মেরে ছাই হবে।

হুঁ করে একবার কেঁদে উঠল বুধনের বৌ। চব্বিশ ঘণ্টা পার হয় নি এখনো, এর মধ্যেই এতখানি দশা। একমুঠো ভাতের লেগে কাতরাচ্ছে ছেলেমেয়েগুলো। ছটফট করছে পেটের জ্বলায়। মাথা কুটতে ইচ্ছে করছে বাউরীবৌয়ের! কেমন করে বোঝাবে সে অবোধ শিশুদের। এত রাতে ভাত পাবে কোথায়।

কে যেন একটা এগিয়ে আসছে পিছন দিক থেকে। আবছা এক প্রেতমূর্তি। শনমুড়ীর মত জটপাকানো মাথাটা। গায়ে জড়ানো কালিঝুলি মাখা চিরকুট একটা টেনা। গুটি গুটি এগিয়ে আসছে রাতচরা ডাইনীর মত। কাছে এসে দাঁড়াল। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে বুধনের বৌ। ভূতপ্রেত দানডাকিনী নয় কিছু, হাঁড়িচাঁছা সেই বুড়ীটা। পেটের জ্বালায় ফেলারামের হাঁড়ি থেকে বাচ্ছা ছেলের মুখের গ্রাস কেড়ে খাচ্ছিল এতক্ষণ। এগিয়ে

আসছে ছেলেমেয়েগুলোর কান্না শুনে। কোটরগত চোখ দুটো সামনের দিকে তাক করে প্যাঁচার মত চেঁচিয়ে উঠল বুড়ী, ধরেছে, পেটের জ্বালা ধরেছে ; মায়ে-ছায়ে না খেয়ে এবার শুকাঁই মরবি যে।

কোলের ছেলেটাকে শক্ত করে বুকের মধ্যে চেপে ধরলে বুধনের বৌ। অলপ্পেয়ে ডাইনী মাগী হঠাৎ এসে সামনে দাঁড়ায় কেন।

বাউরীবৌয়ের বাচ্ছাগুলোকে লক্ষ্য করে বলে উঠল বুড়ী, খাবি, পান্তাভাত দুটো খাবি নাকি। অনেক আছে, খেয়ে তোরা শেষ করতে লারবি।

বুধনের বৌ একটু যেন শঙ্কিত হয়ে উঠল। কে জানে কি মতলবটা বুড়ীর।

বুড়ী আবার শুরু করলে ইনিয়ে বিনিয়ে, কাল থেকে আমার আমানি ভেজা হঁড়ির ভাত হাঁড়িতেই আছে। ভুলে গেলোম, বিলকুল সব ভুলে গেলোম বাউরীবৌ। নাতির শোকে ভুলে গেলোম বেবাক, সারাদিন আজ মনেই পড়ল না।

বুধনের বৌ অবাক মেরে গেল। নাতি গেছে কয়লা কাটিতে খাদ থেকে আর ফেরে নি। এতক্ষণে মনে পড়ল বুড়ীর আমানি ভেজা পান্তাভাতের কথা। ভাত তা হলে আছে, আছে হয়তো। বুড়ীর হেঁসেলে। সত্যি সত্যি পান্তাভাত দুটো দিবে নাকি বুড়ী, ছেলেগুলো কিন্তু বেঁচে যায় তা হলে।

বছর সাতের বড় মেয়েটার হাত ধরে টানছে বুড়ী। বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধরলে, মেজোটাকে। বললে, আয়, আয় আমার সঙ্গে, পেট ভরে সব খাবি আয়। হাঁড়ি ভর্তি পান্তাভাত, নুন তেল দিয়ে মেখে মেখে যত পারিস খাবি আয়।

তাকাল বুড়ী বুধন মালকাটার বৌয়ের দিকে, বললে, চল, চল আমার সঙ্গে, ছেলেগুলোন খেয়ে বাঁচুক। আমি কিন্তু খাব না, এই দুটি চোখের কিরা করে বলছি তোকে বাউরীবৌ, আমি কিন্তু আর খাব না। এত বড় জলজ্যান্ত নাতিটাকেই খেয়ে ফেললোম পেটের জ্বালায়, কোন্‌মুখে তার খাব বল।

এ যেন এক অন্য বুড়ী। চেতন কিছু ফিরেছে। ছেলেমেয়েগুলোর হাত ধরে টানছে বুড়ী, আয় আয়, তোরা সব খাবি আয়, আয় বাছারা—আয়।

বুধনের বৌ উঠে দাঁড়াল। এই বুড়ীই না পাতচাটা কুকুরের মতন কাড়াকাড়ি করে হাঁড়ি চাটছিল এতক্ষণ। এর বুকেও এত জ্বালা। এ জ্বালা কি জুড়োবে আর কোনদিন। এই আগুনে একসঙ্গেই পুড়ছে যে আজ

কলিয়ারির বেবাকগুলো।

দলবল নিয়ে এগিয়ে চলল বুড়ী। অন্ধকারে ধাওড়ায় যাবার পথটা কিন্তু ঠিক দেখতে পাচ্ছে। বুধন বাউরীর ছেলেগুলোকে পেট ভরে আজ খাওয়াবে বুড়ী। খাক, আহা খাক দুটো। কিন্তু যার জন্যে এই হাঁড়িভরা পান্তাভাত যত্ন করে তুলে রেখেছে বুড়ী—সে তো কই আর ফিরল না। ফিরবে, সময় হলেই ফিরবে; বাবুদের খাদে গাঁইতি দিয়ে কয়লা কাটছে যে। মালকাটাদের সদ্দার যে বুড়ীর লাতি, তাই হয়তো কাজের চাপে ছুটি পায় নি এখনো। ছুটি পেলেই ফিরবে, এক গেঁজে টাকা নিয়ে ফিরে আসবে ধাওড়ায়। লাতবৌকে গিনিসোনার নাকছাবি একটা কিনে দিতে হবে যে। চাঁদিরুপোর বালা দিয়ে লাতির বেটার মুখ দেখবে বুড়ী।

কিন্তু খাদ থেকে ওদের ফিরতে এত দেরি হচ্ছে কেন। চৌপর রাত বয়ে গেল যে। খাদের ডুলি এখনো কি নামে নি!

যেতে যেতে থমকে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল বুড়ী। চমকে উঠল আচমকা। রাতদুপুরে মাথার উপর প্যাঁচা ডাকে কেন? ধরেছে, পেটের জ্বালা ধরেছে। খাবি—খাবি দুটো পান্তাভাত, ছাই দিব। আ মলো, তবু চেঁচায় যে। খা—খা, লাতির মাথা খা।

॥ ৬ ॥

কদমডাঙা কলিয়ারির তিন নম্বর পিট। ডুবে আছে অথৈ জলে। দেখতে দেখতে কেটে গেল চব্বিশ ঘণ্টা। লোকগুলো কিন্তু উঠল না। অন্ধকারে হয়তো পথ খুঁজে পায় নি। কিংবা হয়তো খাদের নীচে কয়লা কাটছে এখনো। মাঝে মাঝে ভেঁপু বাজছে সারফেসের উপর। কলিয়ারির সময় সংকেত, পালি বদলের সিটি। লোকগুলোর কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই এতটুকু। পাহাড়খানেক কয়লা না কেটে ওরা সুড়ুং থেকে বেরোবে বলে মনে হয় না। হনুমানের গন্ধমাদন, ধরে দেবে এনে কোম্পানীর ইয়ার্ডে; কালো কুচকুচে চাঙড় চাঙড় কয়লা। দাও পয়সা মালিকবাবুরা। ওভারটাইমটা এই সঙ্গে জুড়ে দিও যেন কাঁটায় কাঁটায় ঘড়ি মিলিয়ে। কিন্তু এতখানি ধৈর্য ওরা পেল কোত্থেকে। একুনে এক শ বাষট্টি জন, রয়েই গেল খাদের নীচে; ওঠবার আর নামগন্ধ নেই। লোকগুলোর কি ক্ষিদেও পায় না! কারো কায়ো

পেয়েছিল হয়তো, অন্ধকারে সিঁড়ি খুঁজে পায় নি। ভুলি বিগড়ে বসে আছে যে, পাতাল থেকে মর্ত্যে ওঠবার সিঁড়ি। কোম্পানী কিন্তু তৈরি করে দিয়েছিল, লোহা-লক্কড় মাল-মশলা দিয়ে। আজ হঠাৎ ভেঙে পড়ল, লোকগুলোর দুর্ভাগ্য। কিংবা হয়তো সৌভাগ্যই বলতে হবে, ওদের জন্য তৈরি হচ্ছে সোনায় বাঁধা স্বর্গের সিঁড়ি। মর্ত্যে হয়তো আর পা ফেলতেই হবে না, মাঝের ধাপটা টপকে গিয়ে একেবারে স্বর্গে। এতক্ষণ সব একে একে যে যার আপনার ঠিকানায় গিয়ে পৌঁছে গেল কি না—তাই বা কে বলতে পারে। স্বর্গের খবর মর্ত্যে আসতে একটু সময় লাগে কি না। এই তো সবে চব্বিশ ঘণ্টা পার হল।

অবরুদ্ধ বর্ষার জল অন্ধ আবেগে পথ খুঁজছে। পথ খুঁজছে দূরের টানে। নদী নালা খাল বিল ডুবে ছিল সব অগাধ জলে। পথ-ঘাটের নিশানটুকু পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় নি। অতি বর্ষণ বিদায় নেওয়ার আগে দেখিয়ে দিয়ে গেল—কি ভীষণ তার বিধ্বংসী রূপ। গ্রাম-বাংলার একান্তে ধ্বসে পড়ল অগণিত দরিদ্রের কুটির, ধ্বসে পড়ল ধনীর প্রাসাদ। অবলুপ্ত হয়ে গেল কত শত দেবায়তন, লক্ষী ষষ্ঠী চণ্ডীতলা। ভেসে গেল দেববিগ্রহ, মাটির নীচে চাপা পড়ল সাত-পুরুষের শালগ্রামশিলা। নদনদী উপনদীর আকস্মিক বন্যায় ভেসে গেল কত গৃহস্থের গৃহপালিত গো-ধন, শ্রমজীবী কৃষকের স্বর্ণপ্রসূ শস্যক্ষেত্র ভেসে গেল কত অসহায় মানুষ। হাহাকার উঠল দিকে দিকে, হতচকিত বিপর্যস্ত মানুষের মর্মভেদী হাহাকার। অতিবন্যার তাণ্ডব চোখের উপর দিয়ে বয়ে গেল দারুণ একটা দুঃস্বপ্নের মত। মাটির বুকে রেখে গেল উন্মত্ত মহাকালের নিষ্ঠুর পদচিহ্ন।

ধাক্কা একটা দিয়ে গেল কদমডাঙা কলিয়ারিকে। প্রচণ্ড এক ধাক্কা। ডুবে গেল তিন নম্বর পিট, লোকলস্কর কুলিকাবাড়ি সমেত। আট শ ফুট খাদের নীচে কোলাকুলি করছে বাঁধভাঙা বেনো জল আর সুড়ুং ভরতি কয়লা।

কলিয়ারিকে আফত থেকে উদ্ধার করবার ব্যবস্থা প্রায় করে ফেলেছে কোম্পানী। জলনিকাশী পাম্প একটা পৌঁছে গেছে এসে। পাতালপুরীর খবরটা এবার পাওয়া যাবে হয়তো। দিন তিনেকের মধ্যেই সারা মুলুক চুঁড়ে পাম্প একটা যোগাড় করে ফেলেছে। এই তো সবে বার তিনেক সূর্য উঠল দুর্ঘটনার পর। এর মধ্যে এর বেশী আর কি হতে পারে। ট্রাক ভরতি লোহার পাইপ, শিকল রসি চাবা আরও কত বিচিত্র সব সাজ-সরঞ্জাম,

বিলকুল এসে জমা হয়ে গেছে পিটমাউথের সামনে। চিন্তার আর কারণ নেই, উদ্ধারকার্য শুরু হল বলে। লোকগুলো যদি ভয় পেয়ে থাকে অন্ধকার খাদের নীচে, সে ভয় হয়তো কেটে যাবে এবার। আসল কাজ শুরু হয়ে গেছে। মালকাটাদের একটাকেও খাদের নীচে ফেলে রাখবে না কোম্পানী। তুলবেই ওরা যেমন করেই হোক। সেই ব্যবস্থাই করা হচ্ছে।

তা হলে আর চিন্তা কি, ব্যবস্থা তো হচ্ছে। পাম্প আমদানির সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়েছে ভাড়া করা উদ্ধারকারী দল। কোম্পানীর পক্ষ থেকে মোটা টাকা কবুল করে বাব থেকে ওদের আনা হয়েছে। খনি অঞ্চলের নামকরা ট্যাণ্ডেল সর্দার হিম্মত সিংয়েব দুর্ধর্ষ পাঞ্জাবী গ্যাংটাকে পিটারমাউথে এনে ছেড়ে দিয়েছে কোম্পানী। সংখ্যায় প্রায় ডজনখানেক। বিপদ-আপদ অনেক কিছু ঝুঁকি নিয়ে দুঃসাহসিক কাজকর্মে মদত দিতে অতিমাত্রায় পারদর্শী এরা। আসমান থেকে পাতালপুরী পর্যন্ত অবারিত দ্বার। সারফেস আর আণ্ডার-গ্রাউণ্ড দুটোই সমান এদের কাছে। এ-ঘর আব ও-ঘর। এই কর্মেই চিরটা কাল অভ্যস্ত এরা।

মোটা তারেব দড়ি খাটানো হয়ে গেল হেডগিয়ারের খাম্বায়, বিরাট একটা ঘড়ঘড়ি সমেত। ঢাবা নামবে পিটমাউথে। ঢাবা মানে বৃহৎ আকারের লোহার এক রকম বালতি। চলতি ও চালু নাম ঢাবা। প্রয়োজন হলে ওই দিয়েই চানকপথে ওটা-নামার কাজটুকু কোনরকমে চালিয়ে নেওয়া যায়। যতদিন না কেজ বা ডুলি মেবামতের ব্যবস্থা হচ্ছে, কাজ চলবে এই ঢাবা দিয়েই। ক্ষতিগ্রস্ত যন্ত্রাদি মেরামতের কাজ, অবরুদ্ধ খনি-শ্রমিকদের উদ্ধারের কাজ। লেগে পড়েছে হিম্মত সিংয়ের দল। পাম্পের সঙ্গে পাইপ জুড়ছে ঢাবায় চড়ে। শূন্যের উপর ঝুলছে ঢাবা পিটমাউথের কাছাকাছি। ঢাবা ঝুলছে চানকপথে, নাগরদোলার ঝুলন্ত খাটলার মত।

নতুন করে আবার লোকসংঘট্ট শুরু হয়ে গেল পিটমাউথের সামনে। দিন দুই তিন মাথা ঠুকে আর বুক চাপড়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল কলিয়ারির লোকগুলো। একটু যেন ঝিমিয়ে পড়েছিল। সজাগ হয়ে উঠল আবার। হেডগিয়ারে ঢাবা ঝুলছে। লোক নামবে চানক দিয়ে, খবর একটা আনবে কিছু নিশ্চয়ই; অবরুদ্ধ মানুষগুলোর খবর। লোকগুলো যে বেঁচে নাই তাও তো এখনো জোর করে কেউ বলতে পারে না। কোন্ সুড়ুং-এর ফাঁক-ফাটলে কোথায় যে কে পিলার ঠেস দিয়ে বসে আছে, সে খবর কি জানে কেউ। এরাই গিয়ে হদিশ করবে, হিম্মত সিং-এর ট্যাণ্ডেলের দল।

ভাগ্যিস এরা এসে পড়েছে, অশেষ এদের দয়া। পর হয়ে কেউ পরের জন্যে এতটা কি করে! জান পর্যন্ত কবুল করে লাফিয়ে গিয়ে ঢাবায় উঠল লোকগুলো। ধন্য এদের সাহস। এরাই হয়তো পারবে লোকগুলোকে উদ্ধার করতে। তুলে এরা আনবেই যেমন করে হোক।

শোরগোল পড়ে গেছে পিটমাউথে। উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে আছে অপেক্ষমাণ জনতা। কাদের একটা বৌ হঠাৎ কেঁদে উঠল পিছন দিক থেকে। বাগতি-পাড়ার মঞ্জরী, কালীচরণ মালকাটার সাঙালে বৌটা। নতুন বৌ, বয়েসটা একটু কাঁচা, ধাক্কাটা তাই সামলে উঠতে পারে নি। চোট খেয়েছে ভীষণ, কান্নাকাটি একটু করবে বইকি। কালীচরণ যে খাদের নীচে কয়লা কাটতে গেছে। কোমরে বেঁধে নিয়ে গেছে গেঁজেভরা কুড়ি তিনেক টাকা। যাবার আগে গেঁজেটাও যে বৌয়ের হাতে তুলে দিয়ে যায় নি। এমন জানলে ওটা অন্তত রাতারাতি হাতিয়ে রাখত মঞ্জরী। নিজে তো মিস্নে গেলই, সেই সঙ্গে পথে বসিয়ে দিয়ে গেল মঞ্জরীকে। বরবাদ করে দিয়ে গেল তিন তিন কুড়ি টাকা।

হুঁ করে একবার কেঁদে উঠল মঞ্জরী। তার বুকের ভিতর খোল বইছে কালীচরণের গেঁজে।

চারদিক থেকে হা-হা করে উঠল সব সেপাই-সান্ত্রীর দল। হঠ যাও—হঠ দাও, খাদমোয়ানসে বিলকুল সব হঠ যাও। দেখতা নাহি, কেতনা ভারি কাম শুরু হুয়া।

কাম অবশ্য শুরু হয়ে গেছে। বহুত ভারী কাম। কাল সন্ধ্যার মুখে ঢাবার উপর উঠে বসল হিম্মত সিং, জনতিনেক সঙ্গী নিয়ে। খাদে নামতে হবে, চটপট গিয়ে এই সময় একবার তদন্ত করে আসতে হবে চানকের নীচের দিকটা।

পিটমাউথে দাঁড়িয়ে আছেন পাণিগ্রাহী, কলিয়ারির ম্যানেজার সাহেব। সঙ্গে তাঁর কয়েকজন সহকর্মী। ম্যানেজার সাহেব তাকালেন একবার হিম্মত সিংয়ের দিকে। উৎসাহ দিয়ে বলে উঠলেন, চিয়ার আপ—চিয়ার আপ সর্দারজী, হারি আপ।

হাত উঁচিয়ে সেলাম দিলে হিম্মত সিং। উপর থেকে একটা আওয়াজ দিলেন ইনচার্জবাবু, লো—ও—র্—।

ঘ্যাস ঘ্যাস শব্দে চালু হয়ে গেল গিয়ারের চাকা। লোল পড়ল রশিতে। নীচের দিকে নেমে চলল ঢাবা, অন্ধকার চানকপথ দিয়ে। টর্চলাইটের আলো

ফেলছে হিম্মত সিং, নীচের দিকে তাক করে। চানকপথে জল উঠে গেছে সওয়া-শ ফুট, ঠেলে উঠেছে উপর দিকে। ঢাবা গিয়ে থেমে গেল তার কাছাকাছি, ফুট তিনেক প্রায় উপরে। টর্চের আলো ফেলে এপাশ-ওপাশ চারিদিক একবার লক্ষ্য করে দেখে নিলে হিম্মত সিং। কোথাও কিছু নাই, শুধু জল। চানক ভরতি অফুরন্ত অবরুদ্ধ জলরাশি, নিঃসাড় নিস্তরঙ্গ। কোথাও একটু বুদবুদের চিহ্ন পর্যন্ত দেখা গেল না। তীব্র তীক্ষ্ণ শ্যেন দৃষ্টি মিলে নীচের দিকে উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছে ট্যাণ্ডেলের দল। পাতালপুরীর অতলস্পর্শী রহস্যটাকে শুঁকছে যেন নাক বাড়িয়ে। এ রহস্য ভেদ করাই যে কাজ এদের।

নিঃসুপ্ত গহ্বরের সীমাহীন স্তব্ধতাকে নাড়া দিয়ে সাড়া দিলে হঠাৎ ট্যাণ্ডেল সর্দার, তেজা সিং।

—জি সর্দার।

—কুদ যাও দরিয়ামে, দেখো দু-একঠো মুর্দা-উর্দা মিলে তো।

সঙ্গে সঙ্গে ঝুলন্ত ওই ঢাবা থেকে ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ল তেজা সিং। তলিয়ে গেল অগাধ জলে। টর্চের আলো ফেলে নীচের দিকে তাকিয়ে আছে হিম্মত সিং। চেয়ে আছে উৎসুক দৃষ্টি মেলে। ট্যাণ্ডেল গেছে পাতালপুরী, খবর আনতে। ফুট পঞ্চাশ না হাতড়ে সহজে কি উঠবে?

ঢাবা থেকে ঝাঁপ মেরেছে তেজা সিং। জলের উপর আথাল-পাথাল হিল্লোলটা থেমে গেল অল্পক্ষণের মধ্যেই, একেবারে শান্ত হয়ে গেল। কান পেতে যেন শোনা যায় নিঝুমপুরীর নৈঃশব্দ্য। তেজা সিংয়ের সাড়া নেই, ডুবল তো ডুবলই। লোকটাকে আবার খুঁজতে যেতে না হয়।

ঝানু ডুবুরী ট্যাণ্ডেলকে খুঁজতে কিন্তু যেতে হল না। নিজে থেকেই আবার প্রকট হয়ে উঠল। জলের উপর ভেসে উঠল তেজা সিংয়ের ঝুঁটিবাঁধা মাথাটা। তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করলে হিম্মত সিং, কা সমাচার?

উপর দিকে মুখখানা উঁচিয়ে জবাব দিলে তেজা সিং, বিলকুল সব পানি, মুর্দা-উর্দাকা কোই তরফ কুছ পাতা নাহি।

সকলে মিলে ধরাধরি করে ঢাবার উপর চাপিয়ে নিলে ট্যাণ্ডেলকে। উপর দিকে টর্চের আলো ফেলে নাড়া দিলে হিম্মত সিং।

রসির টানে উপর দিকে উঠতে লাগল ঢাবা। কিছুক্ষণের মধ্যেই থামল এসে পিঠমাউথের সামনে। সারফেসের উপর একে একে উঠে এল হিম্মত সিংয়ের দল। ম্যানেজার সাহেবকে লম্বা-চওড়া একটা সেলাম দিয়ে পিট-

বটমের অবস্থাটা জানিয়ে দিলে ট্যাণ্ডেল সর্দার। পাওয়া গেল না কিছুই, বিলকুল সব পানি।

ম্যানেজার সাহেব একটু চিন্তায় পডলেন বুঝি। কিংবা হয়তো আশ্বস্তই হলেন খানিকটা, ভাব দেখে ঠিক বোঝা গেল না। ইনচার্জবাবু বিস্ময়ের স্বরে বললেন, বিলকুল সব পানি, এ আর এমন নতুন কথা কি হল ?

নতুন কথা কিছুই হল না। পাতালপুরীর সদর দোরের সীমানায় গিয়ে গোটা কয়েক ঝাঁউ চালিয়ে যেটুকুখানি জেনে এল তেজা সিং—অর্থ তার ওই দাঁড়ায়, বিলকুল সব পানি। তার বেশি আশা করাই ভুল। তেজা সিংয়ের গলায় যদি মন তিনেক একটা পাথর বেঁধে ঢাবা থেকে নীচের দিকে ঠেলে দেওয়া হত—তা হলে হয়তো জানা গেলেও যেতে পারত সওয়া-শ ফুট জলের নীচে পিট-বটমের যথার্থ অবস্থাটা। সেটা যখন সম্ভব হয় নি—ও নিয়ে আর তর্ক করা মিছে। আপাতত এইটুকুই জানা গেল, বিলকুল সব পানি।

খাদের পানি বাষ্প হয়ে জমল নাকি হাজার চোখে। খাদ-মোয়ানে আঁশু ঝরছে। লোকগুলো সব হতাশ হয়ে কান্না জুড়ে দিলে। এরা তো কই খবর কিছু আনতে পারলে না।

এত বড় একটা দামী খবর এরা কি কেউ আনতে পাবে! খবর আনতে যাবে এবার কোম্পানী নিজে। ঢাবাব উপব চডে বসলেন ম্যানেজার সাহেব। সঙ্গে তাঁর সহকারী ইনচার্জবাবু। সরকারের পক্ষ থেকে সঙ্গী হলেন এক মাইনিং ইন্সপেক্টর। রেসক্যু পার্টির ক্যাপটেনকেও সেই সঙ্গে চাপিয়ে নেওয়া হল। পাতালপুরীর রগ ঘেঁষে দুঃসাহসিক তদন্ত-কার্যের চমকপ্রদ রিপোর্ট একটা স্বচ্ছন্দে দাখিল করা যেতে পারে এবার। ঢাবায় চড়ে জলটা একবার ছুঁয়ে আসা যাক তো। বর্তমান এই সঙীন মুহূর্তে সেইটাই কি একটা কম কথা হল। সংবাদপত্রে ফলাও করে বেরিয়ে যাবে খবরটা—আশাতিরিক্ত সাফল্যের সহিত পিট-বটমে তদন্ত কার্য শুরু হয়ে গেছে। ইনাম বাড়বে ইনস্‌পেক্টার সাহেবের, নাম কিনবেন কলিয়ারির ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার। জান কবুলকে আগ বাঢ়নেবালা হিম্মত সিংয়ের কথা পুছবেই না কেউ। তেজা সিং শুধু ঢাবা থেকে ঝাঁপ দিয়েই খালাস। এতটুকু কৃতিত্বের যৎকিঞ্চিত ছিটেফোঁটাও লাগবে না গিয়ে পাতালপুরীর প্রেতপুরুষ হিম্মত সিংয়ের ট্যাণ্ডেলদের গায়ে। আসল যাঁরা নাম কিনবার অধিকারী—ঢাবায় চড়ে এই তো সবে নামছেন। নতুন খবর এঁরাই দেবেন এসে।

পিটারমাউথে দ্বন্দ্ব চলছে আশা আর হতাশার মধ্যে। বহু আশায় বুক

বেঁধে সব খবর নিতে এসেছে। কেউ চায় তার ছেলের খবর, কেউ চায় তার বাপের। স্বামীর খবর শুনবার জন্য ধন্না দিয়ে বসে আছে মালকাটাদের বৌয়েরা। এখনো কেউ সিঁথির সিন্দুর মোছে নি। খাঁটি খবর যে পাওয়া যায় নি পর্যন্ত। ওরা আবার ফিরে এলেও আসতে পারে যে। সেই খবরটাই আনতে যাচ্ছেন ম্যানেজার সাহেব। কতক্ষণে ফিরবেন ওঁরা কে জানে। ঢাবা এত আস্তে নামছে কেন? রশি ছাডবার লোকগুলো সব গেল কোথায়। ইঞ্জিনঘরের হেডখালাসী ঘুমিয়ে পড়ল নাকি?

ঘুমোয় নি কেউ, জেগেই আছে। ওই তো নীচে নামছে ঢাবা। মালকাটাদের সঙ্গে ম্যানেজার সাহেবের দেখা এবার হল বলে। এঁদের যে অনেক কলকৌশল জানা আছে। লোকগুলোর তত্ত্বতলাস না নিয়ে কি ফিরবে। সরকারী লোক গেছে সঙ্গে, খবর একটা না এসে কি পারে? নতুন খবর আসছে।

ঢাবা নামছে পাতালপুরীর পথে। নীচের থেকে জোর গলায় একটা হাঁক উঠল, হাবিস।

নীচে গিয়ে থেমে গেছে ঢাবা। সেপাই দলের হাবিলদার গম্ভীর গলায় হেঁকে উঠল আর এক দফা, হঠ যাও—খাদমোয়ানসে হঠ যাও।

কালরাত্রিব প্রথম প্রহর গত হল বুঝি। ফেউ ডাকছে রেললাইনের ধারে।

জোড়াতালির কাজ চলছে সমস্ত রাত ধরে। পশ্চিম দিকের ভাঙনটা ডুবে আছে বহালের জলে। বিধ্বস্ত সুড়ঙ্গ মুখ জলের নীচে অদৃশ্য। এই পথ দিয়ে জল ঢুকেছে কলিয়ারিতে। গ্যালারিগুলো ডুবে আছে খাদের নীচে। বয়ালের এই অথৈ জলের চাপে কানায় কানায় ঠেসে আছে তিন নম্বর পিট। পাম্প একখানা রাতারাতি ফিট হয়ে গেল ভাঙনের দিকটায়। সকাল থেকে শুরু হল জলনিকাশের কাজ। বয়ালের জল শেষ হলেই টান পড়বে খাদের জলে। কমতে কমতে শেষ হয়ে যাবে একেবারেই। পিটভরতি বেনো জলের শেষ ফোঁটাটি পর্যন্ত তুলে নেওয়া হবে পাম্প দিয়ে। তার পরই যে কে আবার সেই। ফুর ফুর করে হাওয়া খেলবে খাদের নীচে, মগবাতি আর গাঁইতি-ধারী মজুর নিয়ে ডুলি নামবে পিটারমাউথে। নতুন করে আবার চালু হয়ে যাবে কলিয়ারি। তার পর আর মালকাটাদের পায় কে? চালাও গাঁইতি, কাটো কয়লা, টব গাড়িতে বোঝাই দিয়ে ঠেলে দাও ঐ ট্রামলাইনে। কয়লা কাটো, কাটো কয়লা দনাদ্দন।

শুরু হয়ে যাবে কয়লা কাটা। জলটুকু শুধু নিকাশ হতেই যা একটু দেরি। বয়ালের জল পাম্প করে উপর দিকে টেনে নেওয়া হচ্ছে। হড হড শব্দে বয়ে যাচ্ছে সরজমিনের উপর দিয়ে। ঢালু বেয়ে পথ ধরেছে বেনোজল। রেললাইনের কালভার্টটা পাব হয়ে পডবে গিয়ে গাড়ুই নদীর গর্ভে। গাড়ুই থেকে নুনিয়া, নুনিয়া থেকে দামোদর। নদ দামোদর পডল গিয়ে গঙ্গা নদীর পাথারে। তাব পবেই সোজা গিয়ে কালাপানির বন্দর। মা গঙ্গা হাবিয়ে গেলেন কপিল মুনির আশ্রমে গিয়ে। খান ডোবানো বেনোজল মাঝপথে আর রেহাই পাবে না। তিন নম্বর পিট থেকে একেবারে গঙ্গাসাগব। বেনোজলেব শেষ ফোঁটাটি পর্যন্ত দেশছাড়া করে ছেড়ে দিবে এই জলনিকাশী পাম্প। কোম্পানী কি ছাড়বে সহজে ?

অন্ধকারে আলেয়ার ঝিলিক। আবার সেই মতিভ্রম। ঘুরে ফিবে সে এক প্রশ্ন তোলপাড কবছে আমজনতার মনের মধ্যে। লোকগুলো কি উঠবে এবার ? এখনো যদি বেঁচে থাকে কোন গতিকে, তা হলে আব চিন্তা নেই। চালু হয়ে গেছে জলনিকাশী পাম্প, শুষে নেবে হাতিব শুঁডেব মত। এইটুকুই যে দরকার ছিল অনেক আগে। সে যাগ গে, দেবিতে হলেও পাম্প তো একটা বসেছে।

সকাল থেকে চালু হযে গেছে পাম্প। তাই দেখতে চাবদিক থেকে লোক জমেজে বিস্তব। বয়ালেব পাডে ভিড কবে সব দাঁডিয়ে গেছে সার দিয়ে। পাম্প দিযে কয়লা খাদেব জল তোলা দেখছে। জল কিন্তু বেশী টানতে পারছে না পাম্পটা। ধুঁকতে ধুঁকতে টানছে কোন মতে। কলকবজাব ব্যাপার, টানছে ওব যতটুকু সাধ্য।

লোকগুলো কিন্তু মনে মনে বেশ ভবসা পাচ্ছে না। সন্দিগ্ধ দৃষ্টি মিলে চেয়ে আছে বোকার মত। জলনিকাশেব বহব দেখে হতাশ হয়ে পডল বুঝি। এই পাম্প দিয়ে কলিয়ারি খালাস কববে কেমন করে কোম্পানী। জল পডছে কলেব জলের মত, বালতির মুখে ধবে নেওয়া যায়। এইভাবে যদি চলতে থাকে জলনিকাশের কাজ, খাদের জল কি শেষ করা যাবে মাস ছয়েকেব আগে ? ছ মাস তো লাগবেই। তা হলে আর হলটা কি ? লাভ কি হল বয়ালের পাড়ে ছেতো-পড়া একটা পাম্প গেডে মিছেমিছি এই টাটকবাজির খেলা দেখিয়ে! এত বড একটা কোম্পানী, তাব কি এই কাজের ব্যবস্থা ?

শেখপাডার হিঙ্গু বুডো, মালকাটা ওই আনসুর মিযাব চাচা, খোলসা করে বলেই ফেললে কথাটা। লাঠিব উপব ভর দিয়ে কাঁপছে বুডো। ভিড়ের মধ্যে

গলা উঁচিয়ে বলে উঠল, ভাঁওতা—ভাঁওতা—এসব হল কোম্পানীর ভাঁওতা, লোকগুলোকে না মেরে কি ছাড়বেক ওরা ?

ভুল নয় হয়তো কথাটা। দিন চার-পাঁচ হয়ে গেল যে। লোকগুলো কি আর বেঁচে আছে এখনো ? অনেকেই বলছে বেঁচে নেই, কেউ কেউ আবার অন্য কথাও বলে। কে বলবে কার কথা সত্য ? চাক্ষুষ কোন হদিস তো কেউ দিতে পারে নি। এই তো সবে শুরু হল জলনিকাশের কাজ, লোকগুলোর হদিস পেতে এখনো ঢের দেরি।

ধারণাটা কিন্তু সত্য নয়। হদিস একটা পাওয়া গেছে খুব সম্ভব। হল্লা চলেছে পিটমাউথে, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে কতকগুলো লোক। হাওয়ার বেগে ছড়িয়ে পড়ল নতুন একটা হদিসের খবর। চানক দিয়ে কে একটা লোক নাকি উঠে এসেছে। উঠে এসেছে খাদের নীচে থেকে। সারফেসে এসে পৌঁছে গেছে লোকটা। খাদমোয়ানে শোরগোল পড়ে গেছে তাই নিয়ে।

বোম পড়ল যেন বয়ালের পাড়ে। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল লোকগুলো। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটল সব পিটমাউথের মেঠো পথটা ধরে। লোক উঠেছে চানক বেয়ে, চার-পাঁচ দিন খাদের নীচে কাটিয়ে উঠেছে এক মালকাটা। এইমাত্র উঠে এল লোকটা। কারো যদি বিশ্বাস না হয়—নিজের চোখে দেখে এস গিয়ে।

লোক ছুটছে আলপথের উপর দিয়ে। লাঠির উপর ভর দিয়ে হন্ হন্ করে এগিয়ে চলল হিঙ্গু শেখ। পা হড়কে আলের উপর আছাড় খেলে একটা। বাউরীপাড়ার জগন এসে তুলে ধরলে বুড়োকে। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল হিঙ্গু. এগিয়ে চলল হাঁপাতে হাঁপাতে। কাঁপাগলায় বলে উঠল হিঙ্গু শেখ, লোকটা কে বটে রে, কে উঠল খাদ থেকে ? নামটা কি তার শুনলি নাকি জগন ?

জগন বাউরী জবাব দিলে, তা তো কই কিছু শুনলোম না চাচা, লোক কিন্তুক উঠেছে একটা।

সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল হিঙ্গু শেখের। লোক উঠেছে চানক বেয়ে। কে লোকটা, হঠাৎ কে আজ উঠে এল খাদের নীচ থেকে। আনসুর নয় তো, শেখজীর ভাতিজা ! তাও হয়তো হতে পারে, আনসুর মিয়াই হতে পারে হয়তো। আল্লার দয়া, বলা যায় না কিছুই।

বুড়ো হাবড়া গতর নিয়ে ছুটতে আরম্ভ করলে হিঙ্গু শেখ। হাঁপিয়ে পড়ল

দু-চার কদম গিয়েই। বিড় বিড় করে বকতে লাগল। ভাঙা গলায় বলে উঠল নিজের মনেই, আনসুর—আনসুর, কয়লা কেটে ফিরলি নাকি বাপ? হে আল্লা তাই যেন হয়, খাদমোয়ানে গিয়ে দেখতে পাই যেন আনসুর মিয়াকে। ও আমার আনসুর, নিঘ্যাত আমার আনসুর; মা-হারা বাচ্চাগুলোকে ছেড়ে বেশীদিন কি ও থাকতে পারে খাদের নীচে?

লোক ডুবেছে এক শ বাষট্টি জন। তার মধ্যে এই লোকটাই আনসুর, জোর করে কেউ বলতে পারে কি। বলছে কিন্তু হিঙ্গু শেখ, হলপ করেই বলছে। কি বিচিত্র আশার কুহক।

জোর গুজব লোক উঠেছে। গুজব নয়, সত্য। পিটমাউথে উঠেছে একটা মালকাটা। চারদিক থেকে লোকটাকে ঘিরে আছে উন্মুখ জনতা। লাঠি ঠুক ঠুক করতে করতে সবার শেষে পৌঁছল গিয়ে হিঙ্গু বুড়ো। জগন বাউরীকে পেয়ে গেল সামনেই। তাড়াতাড়ি বলে উঠল হিঙ্গু, কি দেখলি, কি দেখলি জগন, লোকজন কি সত্যিই কেউ উঠেছে?

জবাব দিলে জগন বাউরী, উঠেছে, উঠেছে একটা মালকাটা। লোকটা কিন্তু বেঁচে নেই, চানক বেয়ে উঠেছে একটা মড়া।

চমকে উঠল হিঙ্গু শেখ। চোখ দুটো বিস্ফারিত করে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, এঁ্যা—মড়া, খাদ থেকে শেষে মুর্দা উঠল নাকি! কার মুর্দা, কার মুর্দা জগন, আমার আনসুর বাপজান লয় তো? জগন—জগন—কার মুর্দা দেখে এলি বল!

জগন বাউরীকে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলে হিঙ্গু শেখ। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে জগন, কার মুর্দা চিনবার কি উপায় আছে চাচা, ফুলে ফেঁপসে ঢাক হয়ে গেইছে। তবে আনসুর মিয়া নয় তোমার, অন্য কারো লাস এটা।

অন্য কারো লাস নাকি? তাই হয়তো হবে। বেঁচে গেছে, বেঁচে গেছে আনসুর মিয়া। মেহেরবান খোদা—!

এগিয়ে গেল হিঙ্গু শেখ। ভিরের মধ্যে ঠেলাঠেলি করে ভিতর দিকে কোনরকমে মাথা গলিয়ে দিলে। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস নেই কাউকে। কে বলবে কার লাস, কে বলবে কার দুনিয়াদারি একেবারেই খতম হয়ে গেল। খাদের নীচে কয়লা কাটতে গিয়ে মুর্দা হয়ে ফিরে এলি কে রে। আধাম জলের সুড়ুং বেয়ে উঠে এলি কেমন করে?

উঠে কাউকে আসতে হয় নি। নীচের থেকে উঠিয়ে আনা হয়েছে। চানকের জলে সকাল বেলা ভেসে উঠেছিল মৃতদেহটা। হিম্মত সিংয়ের

ট্যাণ্ডেলরা তুলে এনেছে ঢাবায় করে। লোকটা এখনো সনাক্ত হয় নি ঠিকমত। চার-পাঁচদিন জলে থেকে ফুলে উঠেছে অতিমাত্রায়। বিকৃত হয়ে গেছে মুখখানা। জলচর কোন প্রাণী—খুব সম্ভব বেনোজলের মাছ, খুবলে খেয়েছে অষ্টাঙ্গ। খোসা ছাড়া খোস-পাঁচড়ার দাগের মত দাগ পড়ে গেছে সারা গায়ে। এ অবস্থায় সনাক্ত করা মুশকিল।

সনাক্ত অবশ্য হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। চেনা গেল লোকটাকে, মালকাটা কালীচরণ বাগতি। সেই মুখ, সেই চেহারা, মাথায় একমাথা টেরিকাটা বাবরী চুল। কালো রঙের ডোরাকাটা গেঞ্জিটা ফেটে গেছে লাসের চাপে। একে একে চিনে ফেললে অনেকেই, অনেক দিনের চেনা মানুষ, না চেনবার কারণ নাই। পাশের গাঁয়ের ক্ষীরি কামিন, কালীচরণের আগপক্ষের শাশুড়ী, সেও এসে উঁকি মেরে দেখে গেল কালীকে। কেঁদে গেল একটুখানি চোখের জল ফেলে। হাজার হোক জামাই তো। এই কালী বাগতিই উঠতে বসতে পায়ের ধুলো নিত একদিন ক্ষীরির, মান্য করত গুরুজন বলে। ফটকে মদের বোতল এনে ধরে দিত সামনে। সেই কালী আজ ডুবে মলো খাদানে, হায় রে কাপাল।

খবর দেওয়া হয়ে গেছে কালীচরণের বৌকে। যা হোক কিছু ব্যবস্থা একটা করতে হবে তো। দেখতে দেখতে সেও এসে পৌঁছে গেল খাদমোয়ানে। দুলে পাড়ার যথাই বাগতিকে সঙ্গে নিয়ে। গলা ফাটিয়ে কান্না জুড়েছে মঞ্জরী। ভিড় ঠেলে ওকে এগিয়ে দেওয়া হল কালীচরণের মৃতদেহের সামনে। কম্বল দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে দেওয়া হয়েছিল লাসটার। মুখ থেকে ওটা সরিয়ে নিতেই ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল একবার মঞ্জরী। আঁতকে উঠল কালীচরণকেই দেখেই। ফেটে পড়ল বুক ফাটা কান্নায়, ওগো আমার ঘরের লোক গো—।

লুটিয়ে পড়ল কালীচরণের বুকের উপর। পিটমাউথে টান পড়ল হাজার বুকের নাড়ীতে। কান্না ঝরছে হাপুস নয়নে। আসমানের উপর থেমে গেছে হেডগিয়ারের চাকা দুটো পর্যন্ত। কালী মালকাটার বৌটা বড় কাঁদে যে।

চোখ দুটো মুছতে মুছতে এগিয়ে গেল যথাই বাগতি। মঞ্জরীকে দু হাত দিয়ে টেনে ধরলে। অতিরিক্ত কান্নার চাপে নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসছে মঞ্জরীর। তাকড়া জোয়ান যথাই বাগতির হাত ফসকে দড়াম করে পড়ে গেল মাটির উপর। অচৈতন্য হয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে, মুখ দিয়ে আর কথা নেই। কলিয়ারির ম্যানেজার সাহেব পাশ থেকে বলে উঠলেন ইনচার্জবাবুকে লক্ষ্য

করে, ডাক্তারকে খবর দিন।

কলিয়ারির কতকগুলো কামিন এসে দাঁড়িয়েছিল একপাশে। ওদের মধ্যে বলে উঠল বর্ষীয়সী একজন, মালপাড়ার বিমলী কামিনকে লক্ষ্য করে, এগিয়ে একটু দেখ না বিমলী, দাঁতিটাঁতি লাগল নাকি মেয়েটার।

হুঁশিয়ার মেয়ে বিমলী কামিন। এগিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। মঞ্জরীর গাল দুটোকে টিপে মুখের মধ্যে আঙ্গুল পুরে দাঁতি ছাড়াতে লাগল।

ডাক্তারবাবু এসে পড়েছেন। নাড়ী টিপে পালস্ দেখতে লাগলেন। ঠিকই আছে সে সব, চিন্তার কোন কারণ নেই। মঞ্জরীর নাকটা একটু টিপে ধরতেই দাঁতি ছেড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। চোখ চাইতে না চাইতেই আবার সেই কান্নার রোল। বিমলী আর যথাই বাগতি মিলে দু হাত দিয়ে তুলে ধরল মঞ্জরীকে। বিমলীর বুকে মুখ গুঁজে হুঁকরে উঠল মঞ্জরী, ওগো আমার বিমল দিদি গো—।

ইনচার্জবাবুকে এগিয়ে দিলেন ম্যানেজার সাহেব। থামাতে হবে কান্নাটা, কাজ এখনো অনেক বাকি।

এগিয়ে গেলেন ইনচার্জবাবু। বললেন একটু মোলায়েম স্বরে, মঞ্জরীকে লক্ষ্য করে, ওগো ও মা-লক্ষ্মী, কেঁদে আর কি হবে বল, যা হবার তা তো হয়েই গেল। এখন কোম্পানীর কাছ থেকে খরচা নিয়ে মৃতদেহের সৎকার করে ফেল গিয়ে।

মঞ্জরীর সাড়া নাই। খিঁচিয়ে উঠলেন ইনচার্জবাবু যথাই বাগতিকে, এই বেটা—হাঁ করে দেখছিস কি, ধরে পাকড়ে অফিস-ঘরে নিয়ে চল না। মেয়েটা কে হয় রে তোর ?

এবার বুঝি কাঁদবার পালা যথাইয়ের। কাপড় দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে হু করে উঠল যথাই, আমার মাসতাইতো বুন গো।

গর্জে একটা দাবড়ি দিলেন ইনচার্জবাবু, আঃ—তুই বেটা আবার গলা ফাটিয়ে কান্না জুড়লি যে, মাসতাইতো বুনের শোকে নাকি ? চল তাড়াতাড়ি, টিপসইটা দিয়ে আসবি।

ম্যানেজার সাহেব হাঁক দিলেন, হারি আপ।

যেতে হল মঞ্জরীকে। অফিস পর্যন্ত যেতে হল টিপসইটা দিতে। মৃতদেহ সৎকারের খরচা দেবে কোম্পানী। এটা সেটার দাম জুড়ে সবসুদ্ধ তিরিশ টাকা। মুদ্দোফরাস ফ্রি, শ্মশানঘাট পর্যন্ত মৃতদেহ পৌঁছে দিয়ে আসবে ; সে খরচ কোম্পানীর।

দু হাত দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে টাকা ক'টি বাঁধতে হল মঞ্জরীকে আঁচলের খুঁটে। টিপসই দিয়ে যথাইয়ের সঙ্গে বেরিয়ে এল অফিস থেকে। কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে চলল পিটমাউথের দিকে। ততক্ষণে ডোমেরা বাঁশ আর দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে মড়াটাকে। ঝুলিয়ে নিয়েছে কাঁধের উপর। সঙ্গ ধরলে মঞ্জরী, এগিয়ে চলল গাড়ুই নদীর পথ ধরে। পিটমাউথ থেকে চেয়ে আছে সব হাঁ করে, কান্না জুড়েছে কতকগুলো স্ত্রী-পুরুষে মিলে। খাদের নীচে এই দশাই তো ঘটে গেছে বাকিগুলোর। কালীচরণ যে সেই কথাটাই জানান দিয়ে গেল। যমের দোরে কাঁটা দিয়ে আর তো কেউ ওরা ফিরবে না।

কলিয়ারির সীমা ছেড়ে ফাঁকার দিকে এগিয়ে চলল মুদ্দোফরাস দুটো। পাগলের মত বুক চাপড়াচ্ছে মঞ্জরী। হাঁটতে হাঁটতে লুটিয়ে পড়ছে মাটির উপর। মাথা খুঁড়ছে কালীচরণের শোকে, তুমি আমাকে সঙ্গে লাও গো, ওগো আমার হিয়েব হিয়ে গো—।

ব্যথাতুর দৃষ্টি মেলে দূর থেকে চায় চেয়ে আছে খাদমোয়ানের লোকগুলো। মঞ্জরীর আজ কপাল পুড়ল। কপাল কদিন আগেই পুড়েছে, সেই আগুন আজ ছড়িয়ে গেল বুকের ভিতব। এ জ্বালা কি কোন দিন আর জুড়োবে!

রেল লাইনের কালভার্টটা পার হয়ে গাড়ুই নদীব কাছাকাছি পলাশ বনের সুঁড়ি পথটায় ঢুকতেই আড়াল হয়ে গেল কালীচরণের শবযাত্রা। বাহক দুটো কালীচরণকে কাঁধে নিয়ে এগিয়ে চলল হন্ হন্ করে। মন-মেজাজটা শরিফ আছে আজ। সকাল বেলা বৌনিটা বেশ ভালই হয়ে গেল। নগদ কড়ি হাতে হাতে, ধার উধারের বালাই নেই। খাদের নীচে জমে আছে আরও অনেকগুলো। একে একে সব আসতে হবে কালীচরণের মতই। কাঁচা বাঁশের দোলায় চড়ে পৌঁছতে হবে ঠিকানায়। বহুদিন পর দাঁও একটা মারা গেল বইকি। রেটটা নেহাত খারাপ দেয় নি কোম্পানী, মুর্দা পিছু তিন টাকা। তা হলে ওই সব মিলিয়ে আটকুড়িতে কত হয়। ভাবতে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

প্রাপ্তিযোগের মহালগ্ন। সচরাচর এমনটা বড় ঘটে না। মেতে উঠল মুদ্দোফরাশ দুটো। চোখের উপর ঝলকাচ্ছে চাঁদি রূপোর চাঁদ। তার উপর কিনা নিরালা এই সবুজ বনের ছোঁয়াচ। আর একদফা কাঁধ পালটে প্রেমসে হঠাৎ গলা ছেড়ে গান ধরে দিলে মুদ্দোফরাশ দুটো—

৬

যোগীন্ বন্ যাউঙ্গি সৈঁইয়া তোরে খাতির,
সৈঁইয়া তোরে খাতির।
সৈঁইয়া রে—

পিছন থেকে চমকে উঠল মঞ্জরী। এ আবার কি আদিখ্যেতা মুখ-পোড়াদের। পোড়া ঘায়ে নুনের ছিটে। এমন দিনেও গান গাইতে পারে মানুষ। মঞ্জরী হঠাৎ থমকে একটু দাঁড়াল। পাশ ফিরে একটু চাইলে যখাই, বললে, কি দেখছিস অমন করে?

রাগের চোটে ফেটে পড়ল মঞ্জরী। বললে, গায়েন করতে উয়োদিকে মানা কর যখাই। এই কি একটা গায়েন গাইবার সময়!

সময় না হলে গাইবে কেন। কালীচরণের দৌলতে পাঁইট দুয়েক মদের দাম আজ আদায় হয়ে গেছে। গান গায় কি সাধে। চলছে ওদের হুল্লোড়—

ছোড়কে উঁচে মহল দু মহলে
ধুঁইয়া রামাউঙ্গি সৈঁইয়া তোরে খাতির,
সৈঁইয়া তোরে খাতির।
সৈঁইয়া রে—

পিত্তিসুদ্ধ জ্বলে উঠল মঞ্জরীর। হন্ হন্ করে এগিয়ে চলল গাড়ুই নদীর পথ ধরে। কাছে গিয়ে ধমক দিলে ডোম দুটোকে, চোখ তেড়ে বলে উঠল, নামা, নামা এইখানে মুখপোড়ারা, নামা। সৈঁইয়ার তোর নিকুচি করেছে।

গাড়ুই নদীর পাড়ের উপর মড়াটাকে নামিয়ে দিলে মুদ্দফরাসরা। ডিউটি ওদের খতম। আমতা আমতা করে বলে উঠল একজন, বকশিশ কিছু মিলবে?

হায় রে কপাল। এখানেও চায় বকশিশ। গাড়ুই নদীর শ্মশানঘাটে দাঁড়িয়ে। সিঁথির সিন্দুর মুছতে এসেছে এরা, শাঁখা চুড়ি নোয়ার ভার আজ হালকা করে দিয়ে গেল যে। বকশিশ কিছু পেতে পারে বইকি।

দেখে-শুনে অবাক মেরে গেল মঞ্জরী। বুকখানা যেন পাথর হয়ে গেছে। মঞ্জরী যে পথে বসতে চলল। মরদটা তার মঞ্জরীকে হড়পা বানে ঠেলে দিয়ে গেল যে। বোঝ গে এবার ঠেলাটা। এত দিকের এত ঝামেলা সামলায় সে কেমন করে? তার উপর কিনা মড়া বওয়ার বকশিশ চায় হারামজাদারা। যেন বিয়ের রাতে জামাইবাবুর পালকি বয়ে এসেছে। এও কি প্রাণে সয়!

সয়ে একটু নিতেই হল মঞ্জরীকে। পাথর চাপা দিতে হল বুকের উপর। উপরি পাওনা যা হোক কিছু আদায় না করে সহজে কি ছাড়বে ওই

আঁটকুড়ীর বেটারা। যেমন করে হোক ঝাড়ু মেরে বিদেয় করে দেওয়া ভাল।

কাপড়ের খুঁটে হাত পড়ল মঞ্জরীর। সিকি একটা ছুঁড়ে দিলেই চলত, খুচরো কিন্তু সঙ্গে আনা হয় নি। হাত পড়ে গেল কোম্পানীর থোকে। খুঁট থেকে টাকা একটা বের করে ডোমগুলোর দিকে ছুঁড়ে দিলে মঞ্জরী। দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠল, বেরো মুখপোড়ারা, বেরো এখান থেকে। ফের যদি গায়েন গেয়েছিস তো তোদেরি একদিন কি আমারি একদিন। হেঁড়ে গলায় কুড়োমাতনির আর জায়গা পাস নি মুখপোড়ারা ?

ডোমগুলো কিন্তু চটল না। দাঁত ফাড়ছে নিজের মনেই। এখন কি আর মঞ্জরীর মাথার ঠিক আছে ! কি বলতে কি বলছে নিজেই কি ও জানে ? এ অবস্থায় রাগের মাথায় গালমন্দ একটু করেই থাকে।

ছোঁ মেরে টাকাটা হঠাৎ কুড়িয়ে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কেটে পড়ল মঞ্জরীর সামনে থেকে। আড়াল হয়ে গেল পলাশ বনের সুড়ি পথে। হেঁড়ে গলার মাতন কিন্তু থামে নি, চেগে উঠল আর এক দফা—

ছোড়কে উঁচে মহ্‌ল দু মহলে ধুঁইয়া রামাউঙ্গি
সেঁইয়া তোরে খাতির, সেঁইয়া তোরে খাতির···

ঐ যে আবার ! বিষ ঢালছে মঞ্জরীর কানে। এমনধারা নির্লজ্জও হতে পারে মানুষ ? ঘুরে ফিরে আবার সেঁইয়া, আকবাড়িতে শেয়াল ডাকছে যেন।

অবাক হয়ে চাইলে একবার মঞ্জরী যখাইয়ের দিকে। পলাশবনে গুমরোচ্ছে 'হেইয়া মেরে সেঁইয়া।' যখাইরে হঠাৎ প্রশ্ন করলে মঞ্জরী, সেঁইয়া মানে কি রে যখাই, জানিস নাকি, কি বলছে মুখপোড়ারা ?

যখাই যেন একটু কেমন কেমন হয়ে উঠল। আড়চোখে চাইলে একবার মঞ্জরীর দিকে, বললে, সেঁইয়া—সেঁইয়া মানে কি জানিস, বলব—কিছু মনে করবি না তো ?

বিরক্তির সুরে বলে উঠল মঞ্জরী, তাড়াতাড়ি তাই বল না, আদিখ্যেতা করছিস কেনে এত ?

সাহস পেয়ে বলে উঠল যখাই, সেঁইয়া মনে হল গিয়ে—নাগর গো —নাগর, যাকে বলে মনের মানুষ। এই আমি যেমন তোর—

কি সর্বনাশ, সেঁইয়া মানে তাই বুঝি। এ যে একেবারে আঁতের কথা, রসের কথা গো। মুখপোড়ারা এত কথাও জানে!

সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে উঠল মঞ্জরীর। হো হো করে হঠাৎ হেসে উঠল নিজের মনেই। পোড়ার মুখে হাসিও পায়। মুখ ফসকে দাঁতের

ঝাঁকে ছিটকে পড়ছে যে।

যখাই বুঝি বাট চেয়েই ছিল। হো হো করে ফেটে পড়ল হাসির চোটে। বোঝ এইবার সেঁইয়া কাকে বলে।

গম্ভীর হয়ে উঠল হঠাৎ মঞ্জরী। কটমট করে তাকাল একবার যখাইয়ের দিকে। ঝাঁজালো স্বরে বলে উঠল, হি হি করে হাসছিস যে বড। আমার জলজ্যান্ত এই দুক্কের দিনে দাঁত বের করে হাসবার জন্যে তোকে ডেকে এনেছি খালভরা! মানুষটার যে গতি হয় নি এখনো—সেদিকে একটু হুঁশ আছে?

যখাই বাগতির বেয়াদপি দেখে সত্যি সত্যি এবার কান্না পেয়ে গেল মঞ্জরীর। কালীচরণের সদ্‌গতির যে ব্যবস্থা করতে হবে। তার ঘরের লক্ষ্মী মঞ্জরী যে বেঁচে আছে এখনো। যখাইকে একটা ধমক দিয়ে বললে, ইদিকে আয় খালভরা, ইদিকে আয়।

যখাই বাগতি ভয়ে ভয়ে কালিচরণের শবদেহের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। মঞ্জরী বললে, খোল এইবার দড়িটা, কোমরটা খানিক আলগা করে দে।

কম্বল দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ছিল কালিচরণ। একটুখানি আলগা হতেই কোমরের দু পাশ দিয়ে তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে দিলে মঞ্জরী, হাতডাতে লাগল কালিচরণের গেঁজেটা। গেঁজে কিন্তু নেই, কোমর একদম খালি।

মুখখানা হঠাৎ কালীচরণের চেয়েও ফ্যাকাশে হয়ে গেল মঞ্জরীর। গেঁজে নেই, উধাও হয়ে গেছে তিন-তিন কুড়ি টাকা। মঞ্জরী যা ভেবেছিল তাই। খাদে নামবার আগে শতেকখোয়ারী ওই ফুলটুশির হাতেই টাকাগুলো হয়তো তুলে দিয়ে গেছে মিন্সে। এ আফসোস রাখবার কি আর ঠাঁই আছে।

বেলা বাডছে মেঘের ফাঁকে। সজাগ হয়ে উঠল যখাই বাগতি, মঞ্জরীকে তাড়া দিয়ে বললে, টাকা-পয়সা দে তা হলে, কাঠ কয়লা যোগাড করে নিয়ে আসি। চিতে সাঁজাই ডাহ করতে হবেক তো?

ডাহ করে লাভ? ডাহ কর আর নাই কর—লোকটা তো আর ফিরছে না। ভেবে চিন্তে বলে উঠল মঞ্জরী, অত সব করে দরকার নাই। কোদাল নিয়ে আয় একটা, নদীর ধারে পুঁতে দিয়ে যাব।

সেই ব্যবস্থাই ভাল। কি হবে আর মিছেমিছি কতকগুলো টাকা-পয়সা খরচ করে। সায় দিয়ে বলে উঠল যখাই, আমিও তাই ভাবছিলোম। তুই তা হলে বস খানিক, ঝাঁ করে আমি কোদাল একটা নিয়ে আসি।

মঞ্জরী বললে, দাঁড়া একটু এইখানে, হাত দুটো আমি নদীর জলে পাখালে আসি। গা-টা যেন ঘিন ঘিন করছে পচা মড়া ঘেঁটে।

হাত-পাগুলো নদীর জলে ধুয়ে এল মঞ্জরী। বসল গিয়ে আরও খানিকটা দূরে। বললে—যা এবার তুই, কোদাল নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরবি যেন।

বান কমেছে গাড়ুই নদীর, মাঝখানে হাঁটুজল। চবং চবং শব্দ করতে করতে এগিয়ে চলল যখাই। গাঁ-টা ওদের দূর নয় বেশী, গাড়ুই নদীর ঠিক ওপারে। মঞ্জরীকে পাড়ের উপর বসিয়ে নদী থেকে উঠে ছুটতে লাগল যখাই।

নির্জন ওই গাড়ুই নদীর পাডে মড়া আগলে বসে আছে মঞ্জরী। জনমনিষ্যির সাড়া-শব্দ নাই। পলাশ বনের একান্তে নিষ্কর্মা এক কাঠঠোকরা পাখী ঠক ঠক করে আওয়াজ করছে মাঝে মাঝে। গা ছম ছম করে উঠল মঞ্জরীর। দূর থেকে একবার তাকাল কালীচরণের মৃতদেহটার দিকে। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকের মধ্যে। ওটা যদি দাঁত মুখ খিঁচে উঠে দাঁডায়? আধপোড়া ওই খিঁচনো দাঁড়িটা হাতে নিয়ে হঠাৎ যদি তাড়া করে আসে মঞ্জরীকে? এ সময় আবার ফুলটুশির নাম করতে গেল কেন মঞ্জরী। পুরুষমানুষের যে রাগ হয় পরিবারের মুখে ওসব কথা শুনলে। রাগের চোটে মঞ্জরীর গলাটা যদি টিপে ধরে এসে? তা হলেই হল আর কি।

কাঁটা দিয়ে উঠল মঞ্জরীর সারা গায়ে। চমকে উঠল হঠাৎ। ঢিব ঢিব করছে বুকের মধ্যে। মঞ্জরী কি ভাবতে লাগল নিজের মনেই, কিছুটা আবার সামলে নিলে নিজেকে। দূর ছাই—তাও কখনো হয়, মরা মানুষ জ্যান্ত হবে কেমন করে?

এতক্ষণে ঠিক ধরেছে মঞ্জরী, মরা মানুষ জ্যান্ত হবে কেমন করে? সে কথা কিন্তু পরে। জ্যান্ত হোক আর নাই হোক, ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল মঞ্জরী। সাবধানের মার নেই। এগিয়ে চলল গাড়ুই নদীর পাড ধরে। শ্মশানের দিকে পিছন ফিরে বসল গিয়ে আরও খানিকটা দূরে।

সঙ্গে সঙ্গে আবার মুখ ফেরালে মঞ্জরী। লাসটার দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। আশপাশাড়ী ঝোপ-জঙ্গল থেকে শেয়াল-কুকুর বেরিয়ে পড়ে যদি। গন্ধ ওরা পেয়ে গেছে যে। হন্ হন্ করে এগিয়ে এসে দাঁত দিয়ে যদি টানাটানি শুরু করে দেয়। তাড়াতে হবে ঢিল মেরে, ভয় করলে তো চলবে না মঞ্জরীর, ঢিল মেরে ওদের তাড়াতেই হবে।

শেষ পর্যন্ত তাই হয়তো করতে হত মঞ্জরীকে। কিন্তু ঢিল ফাবড় আর দরকার হল না। গন্ধলোলুপ শিবাকুল ও শবাহারী সারমেয় দল শ্মশানে এসে আবির্ভূত হওয়ার আগেই যখাই এসে পেঁীছে গেল পাঁচসেরী একটা কোদাল

হাতে নিয়ে। মঞ্জরী যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

তাকড়া জোয়ান যখাই বাগতির কোদালের ভার সইল না মাটি। হ্যাঁস হ্যাঁস করে ধ্বসে গেল অতি সহজেই। কবর একটা খোঁড়া হল কালীচরণের জন্য। মঞ্জরী কি ভাবছে যেন। আকাশ-পাতাল কি ভাবছে কে জানে। মনে মনে ভাবছে হয়তো একটা কিছু, কিংবা হয়তো কিছুই ভাবছে না, যখাই বাগতির কবর খোঁড়াই দেখছে হয়তো ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে। এগিয়ে গেল মঞ্জরী। কবর খোঁড়া শেষ করে কোদাল হাতে দাঁড়িয়ে আছে যখাই। ধরলে গিয়ে মঞ্জরী শবদেহের একটা দিক, দুজনে মিলে ধরাধরি করে গর্তের মধ্যে ফেলে দিলে কালীচরণকে। কয়েক মুঠো মাটি মঞ্জরী আগে ছুঁড়ে দিলে মৃতদেহের উপর, বাদবাকিটা কোদাল দিয়ে শেষ করে দিলে যখাই। ঝুরো মাটির স্তূপটা চাপিয়ে দিলে কালীচরণের উপর। কালীচরণ শেষ, ভবের খেলা একেবারেই সাঙ্গ হয়ে গেল।

মনে মনে গুম হয়ে গেল মঞ্জরী। কথা নেই আর মুখে। কালীচরণকে মাটি চাপা দিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে কবরটার দিকে। লোকটাকে জীবনে কোনদিন সুখ দেয় নি মঞ্জরী। একটা না একটা অশান্তি লেগেই ছিল। ভোগান্তি বড় কম ভুগতে হয় নি, মঞ্জরীকে ঘরে আনার পর থেকে। রূপবতীর চটকদার এই রূপের আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিল কালীচরণ, বর্ষাতি গঙ্গা ফড়িং-এর মতন। তিলে তিলে পুড়তে হয়েছে। খাদের জলে ডুবে এসে সে জ্বালা কি জুড়ল আজ? মরে আজ ও শান্তি পেলে কি?

পরম শান্তি পেয়ে গেছে কালীচরণ। আজ আর কোন ক্ষোভ নেই ওর মনের মধ্যে। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে সর্বংসহা মাটি মায়ের কোলে। এ ঘুম আর ভাঙবে না কোনদিন। ফিরেও কোনদিন তাকাবে না মঞ্জরীর দিকে। তার গয়না কাপড় বিলাসব্যসন ফাইফরমাশ মেটাতে দিনের পর দিন কয়লা খাদে ওভার-টাইম খেটে গায়ের রক্ত জল করতে হবে না আর কালীচরণকে। রাত-বেরাতে ছটতে গিয়ে মদের বোতল হাতে নিয়ে ফুলটুশির জানলার ধারে উঁকিঝুঁকি মারবে না আর কোনদিনই। অসময়ে বাড়ি ফিরে সাঙালে বৌ মঞ্জরীর মুখঝামটা লাথি ঝাঁটাও খেতে হবে না আর এখন থেকে। মঞ্জরীকে ছুটি দিয়ে গেল কালীচরণ। যখন-তখন বাড়ি থেকে পালিয়ে যত খুশি এবার মনের মানুষ খুঁজে বেড়াকগে। কালীচরণ আর রাগের মাথায় থালা বাটি ছুঁড়তে যাবে না। গাঁইতি নিয়ে তাড়া করবে না আর কোনদিনই। মঞ্জরী এবার নিশ্চিন্ত। পাঁড় মাতাল আর

হাড়হাবাতে ছুঁলী-পাগলা কালীচরণ ভুলেও কখনো তাকাবে না আর রঙজমানী ডবকা কোন মেয়েমানুষের দিকে। সে দোষটা আজ কেটে গেল কালীচরণের। সে লোকটা আজ মাটির তলায় চাপা পড়ে গেল যে, ঘুমিয়ে গেল একেবারেই।

চারিদিক নিঝুম। পলাশ বনের বাতাসটুকু পর্যন্ত হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। কুল কুল করে বয়ে চলেছে গাড়ুই নদী, শ্মশানঘাটের ছাইপাঁশগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে। ধীরে ধীরে মঞ্জরীকে একটা ডাক দিলে যখাই। মঞ্জরী কোন সাড়া দিলে না। যখাই বললে, আর কেনে, চল এবার—ঘরে যাবি চল।

এতক্ষণে বুঝি সম্বিৎ ফিরল মঞ্জরীর। ঘরে ফিরতে বলে নাকি যখাই। কোথা ঘর, ঘর আবার কোথা। দিন কয়েকের জন্যে ভাঙাফুটো তালিমারা ঘর একটা বেঁধেছিল মঞ্জরী। তাও যে গেল ঝড়ো হাওয়ায় উড়ে। ঘর বলতে আর নাই কিছু। তবু হয়তো ফিরতে হবে মঞ্জরীকে, ফিরতে হবে এই শ্মশান থেকে। তার আগে যে কাজ একটু বাকি এখনো, সেটুকখানি শেষ করতে হবে। ঘর-বাঁধার ভাগের কড়ি হাতে হাতে চুকিয়ে দিয়ে যেতে হবে যে।

রঙিন শাড়ির আঁচলটা ডান হাত দিয়ে চেপে ধরলে মঞ্জরী। তুলে ধরলে কপালের উপর। নিজের হাতেই ঘষে ঘষে মুছে ফেললে সিঁথিভরা ডগডগে সিন্দুরটা। ভারী গলায় বলে উঠল মঞ্জরী, শাঁখা দুটো যে ভাঙতে হবে যখাই, দে তোর ওই কোদালের টাশা দিয়ে এ দুটো আমার ভেঙে।

পাথরের উপর মঞ্জরীর হাত দুখানা রেখে পট পট করে শাঁখা দুটো ভেঙে দিলে যখাই। মঞ্জরীর চোখ দুটো যেন ঝাপসা হয়ে আসছে। ভাঙাগলায় বলে উঠল, আর বেলোয়ারি চুড়িগুলোন, এগুলোন আবার রেখে দিলি কার জন্যে?

ভাঙা পড়ল হাতভরতি কাচের চুড়ি। খালি হয়ে গেল মঞ্জরীর হাত দুটো। শুধু বাঁ-হাতের কব্জির কাছে ঘাগরবুড়ীর মেলায় কেনা এক আনা দামের নোয়াটা এখনো ঝুলছে। উদ্‌ভ্রান্তের মত বলে উঠল মঞ্জরী, আর এটা, এটা নিয়ে এবার করি কি বল দেখি যখাই?

যখাই বললে, ওটা নিয়ে আর কি করবি, ছুঁড়ে ফেলে দে গাড়ুই নদীর জলে।

চোখ দুটো হঠাৎ বুজে এল মঞ্জরীর। চারিদিক যেন ঝাপসা দেখছে। কোন রকমে হাত থেকে নোয়াখানা খসিয়ে দু চোখ বুজে ছুঁড়ে দিলে সামনের

দিকে। মোয়া নয়, মেয়েমানুষের অঙ্গের সোনা, খসে পড়ল অঙ্গ থেকে। মঞ্জরীর হৃৎপিণ্ডটা যেন ছিঁড়ে পড়ল নদীর জলে! দুঃসহ আবেগে রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠল মঞ্জরী, এটা একদিন কালীচরণ আমায় নিজের হাতে পরিয়ে দিয়েছিল। সে কথা আমি কোনদিন ভুলব না যখাই, এ আমি কোনদিন ভুলব না।

ডাঁটা কাটা শুশনি শাকের লতার মত এক মুহূর্তে নেতিয়ে পড়ল মঞ্জরী। ভেঙে পড়ল অঝোর কান্নায়।

অবাক হয়ে চেয়ে আছে যখাই। চেয়ে আছে মঞ্জরীর মুখের দিকে। মঞ্জরীও কাঁদে, এমন করেও কাঁদতে জানে মঞ্জরী। ওর কাজলটানা কালো ভোমর চোখ দুটিতে এত কান্না লুকিয়ে ছিল কোথায়; যখাইয়ের কাছে এও যে একটা হেঁয়ালি।

বেলা বাড়ছে। ভোঁ বাজল কদমডাঙার খাদে।

ঘেঁটু ফুলের ঝাড় একটা কোত্থেকে যেন ভেসে আসছে গাড়ুই নদীর জলে। শ্মশানঘাটের কাছাকাছি এসে ঠেকে গেল তীরের দিকে। ওর শিকড় বুঝি মাটি খুঁজছে। ছোট্ট একটা ঢেউ এসে ঠেলে দিয়ে গেল একটুখানি। ঠেকতে ঠেকতে এগিয়ে চলল, গাঁটে গাঁটে ফুলের বাহার ছড়িয়ে। ডাঙায় গিয়ে ঠেকে গেল আর এক ঢেউয়ের ধাক্কায়। ঝাড়টা আবার গজাবে নাকি পলিমাটির চরের উপর?

মঞ্জরী হঠাৎ চকিতের মত বলে উঠল—যখাই!

হকচকিয়ে তাকাল একবার যখাই বাগতি।

মঞ্জরী বললে, চল, এবার ঘরে চল।

॥ ৭ ॥

কালীচরণের ছুটি হয়ে গেছে। কোম্পানীর সেরেস্তা থেকে একেবারেই খারিজ হয়ে গেল নামটা। বাকিগুলো ঝুলছে। উঠবে হয়তো একে একে। কোম্পানীর কাজে ইস্তফা দিয়ে বেশ একটু সময় থাকতেই রিটায়ার করে যেতে হবে ঠিক কালীচরণের মতই। বিদায়কালীন সম্বর্ধনার কিছুমাত্র ত্রুটি হবে না, তৈরি হচ্ছে কাঁচা বাঁশের চৌদল। কেউ বা যাবে গাড়ুই নদীর পথ ধরে; কেউ বা গিয়ে আস্তানা গাড়বে ভাইসাহেবদের কবরখানায়। সেখান

থেকে উর্ধ্বলোক। একেবারে বৈকুণ্ঠ, কিংবা হয়তো বেহেস্ত ; যার যেটাতে এক্তিয়ার। বৈকুণ্ঠের যাত্রী হয়ে সবার আগে এগিয়ে গেছে কালীচরণ। দুনিয়ার মায়া একেবারেই কাটিয়ে দিয়ে গেছে। যাবার বেলা কাঁদতে দেখে নি কেউ, ফেলতে দেখে নি এক ফোঁটা দীর্ঘশ্বাস পর্যন্ত। মুক্তপুরুষ কালী। প্রাণ-পাখীটা নিজের হাতে উড়িয়ে দিয়ে খাঁচাটাকে মাটির তলায় গেড়ে দিয়ে গেল। দিয়ে গেল আরও অনেক কিছু। দধীচি মুনি দেবকুলহিতায় দেহ থেকে শুধু একটুকরো হাড় দিয়েছিলেন। কালীচরণ তার হাড় মাংস নখ চুল থেকে শুরু করে কয়লাকাটা গাঁইতিটা পর্যন্ত অনায়াসে দান করে দিয়ে চলে গেল পরার্থে। স্বর্গে তো সে যাবেই। আর কে কোথায় গেল না গেল সরকারী ভাবে জানা যায় নি এখনো। জানা যাবে একে একে। টিকিট কাটা হয়ে গেছে সকলেরই। আগে পিছে কে কোন্ দিকে এগোচ্ছে, সেইটুকুই শুধু জানতে বাকি। পরেরটা কি কালীচরণের সঙ্গী নাকি? টিকিটখানা কোথাকার, বৈকুণ্ঠ না বেহেস্ত, কে আসছে কালীচরণের পিছু পিছু!

সাতদিনের দিন আজান দিয়ে দিলো ডাইকমিস্ত্রী আলতাব মিয়া। বেহেস্ত, বেহেস্ত।

পাওয়া গেল আর একজনের হদিস। ভেসে উঠেছিল চানকের জলে, ঠিক কালীচরণের মতই। ঢাবায় চড়ে উঠে এল সবেজমিনে। চেহারাটা একেবারে পুরোপুরি পাল্টে এসেছে আলতাব মিয়া। ধরা কিন্তু পড়ে গেল হাতে হাতেই। বারুদ-মিস্ত্রী মঞ্জুর মিয়ার চোখ দুটোকে ফাঁকি দেবে কেমন করে। এক মায়ের পেটের ভাই যে, লুকোচুরি খেলবার কি উপায় আছে? হুঁ করে একবার কেঁদে উঠল মঞ্জুর, বুকের উপর একটা চাপড় মেরে বললে, এ যে আমার ভাইজান, ডাইকমিস্ত্রী আলতাব মিয়া।

তাই হয়তো হবে, ডাইকমিস্ত্রী আলতাব মিয়াই হবে হয়তো। কলিয়ারি কিন্তু বন্ধ আছে এখন, ডাইকমিস্ত্রীর দরকার হবে না। রেকর্ডটা অবশ্য ভালই ছিল আলতাব মিয়ার। ইলেম ছিল কোম্পানীর ঘরে। তা আর কি করা যাবে, এ অবস্থায় সসম্মানে বিটায়ার করা ছাড়া উপায় কি। কদমডাঙার মায়া কাটিয়ে এগিয়ে চলল আলতাব মিয়া, বেহেস্তের পথ ধরে। একটা খবর শুনে গেল না আলতাব। কি সুন্দর একটা মেয়ে হয়েছে আলতাব মিয়ার, বয়েস হল সাতদিন। খাদমোয়ানে বিইয়েছে ওর বিবি। যাবার বেলা একটুখানি উঁকি মেরে কচি মেয়ের চাঁদপানা মুখখানি একবার দেখে যাওয়া হল না। কই আর হয়ে উঠল, সময় কোথায়, বেহেস্তের ফুকার হয়ে গেল যে।

বাকিগুলোও একে একে এল বলে। গোটাচারেক পাম্প চালু হয়ে গেছে, হপ্তাখানেকের মধ্যে। জল টানছে হুড় হুড় শব্দে, বেশি দিন আর লাগবে না হয়তো। বড় জোর আর কদিন। কে জানে ছাই কদিন, মোদ্দা কথা খুব বেশি আর দেরি হবে না। খাদের জল তো কমছে বই আর বাড়ছে না। পাম্প চারটে লেগে আছে চিড়িকামুড়ি দিয়ে; মাঝে মাঝে বিগড়াচ্ছেও দু-একটা, সময় কিছু লেগে যাচ্ছে মেরামতের কাজে। জোড়াতালি মেরে চলছে তবু, চলবেও হয়তো শেষ পর্যন্ত। কলিয়ারি খালাস হতে আর কদিন।

আটদিনের দিন আরও দুটো মালকাটা নিজে থেকেই খালাস হয়ে এল। ভেসে উঠেছিল ঘণ্টা-চারেক আগে পিছে। তার পর আর নিজে থেকে ওদের করতে হয় নি কিছু। সঙ্গে সঙ্গে ঢাবা গিয়ে হাজির, তুলে নিয়ে এল নীচের থেকে। চেনা গেছে ওদের একটাকে, মাথায় লম্বা টিকি, আর কোমরে বাঁধা ঘুনসি দেখে। ঘুনসির মধ্যে বাঁধা ছিল একটা ফুটো পয়সা, আর একটা ঘিয়ে কড়ি। ধরা গেল তাই সহজে. মালকাটা রামভোরস সিং। নিয়ে গেল ওর জরু বেটা এসে। আর একটা যে কে ঠিক মত চিনতে পারা গেল না। কেউ বলছে বিলাসপুরি, কেউ বলছে সাঁওতাল। খুব সম্ভব জবদি মুলুকের সাঁওতালরাই হবে কেউ। বাঁ হাতে শিসের বালা, আর গলায় এক ছড়া ডবল সুতীর বেলমালা, এই দুটো তার মোক্ষম প্রমাণ। কিসকু মাঝি হতে পারে লোকটা, মাঝি ধাওড়ার লাগরা বাজুয়ে। শেষ বাজনা বাজিয়ে দিয়ে গেল। দামোদরে হাড় কিন্তু ওর দেওয়া চলবে না। সাঁওতাল কি না কে জানে, সন্দেহ একটু রয়ে গেছে কি না। আপাতত কম্বল বেঁধে চালান করে দেওয়া হল কোম্পানীর মর্গে। পরে একটা যা হোক কিছু ব্যবস্থা করা যাবে। মারাং বুরু ওর মঙ্গল করুন।

জল কমছে একটু একটু করে। পিটমাউথের শওয়া শ ফুট বেশ খানিকটা নেমে গেছে নীচের দিকে। ভেসে কিন্তু আর উঠছে না কেউ। কিসকু মাঝির পর থেকেই বিলকুল সব চুপচাপ। একটুখানি এগিয়ে এসে নিজে থেকে যে সাড়া দিবে, তেমন গরজ দেখা যাচ্ছে না কারো। টেনে হিঁচড়েই আনতে হবে বাকিগুলোকে। একুনে এক শ বাষট্টি. গোটাচারেক উঠল মোটে। জল কমছে দিনে দিনে, চানকের গায়ে দাগ পড়ছে ঘণ্টায় ঘণ্টায়। ফিতে ধরে মাপজোখ চলছে পিটমাউথের নিশান ধরে, ক ফুট জল কমল, আরও কতফুট কমতে বাকি। অঙ্ক কষে হিসেব চলছে মোট সময়ের সম্ভাব্য পরিমাপ নিয়ে। গজ ফুট আর ইঞ্চি ধরে মাপ করা হচ্ছে ঘণ্টা মিনিট সেকেণ্ডকে। অথৈ জলের

থৈ পেতে আর দেরি কত।

থৈ নিতে কিন্তু নেমে গেছে হিম্মত সিংয়ের দল। লেগে পড়েছে এদিক ওদিক। সারফেস থেকে আণ্ডারগ্রাউণ্ড, লেগে আছে হরেক কাজে। পাম্প চালাচ্ছে, পাইপ জুড়ছে, ঢাবায় চড়ে নেমে যাচ্ছে পাতালপুরীর কাছাকাছি। ডর-ভয় নেই এতটুকু, কোন কিছুকে পরোয়া করে না। মওকা পেলে বেশ দু পয়সা পুষিয়ে নেয় মুঠি ভরে। হিম্মতের ইনাম। রুপেয়া ছোড়, জান কবুল ; দেখে নাও একবার তামাশাটা। কেউ যেখানে ঘেঁষতে চায় না, সেইখানেই তো কেরামতি এদের।

কলিয়ারি সাফ করবার ভার নিয়েছে এই টণ্ডেলের দল। কাজ চলছে উপর নীচে। এটুখানি জল কমতেই শুরু হয়ে গেল নতুনতর অভিযান। পিটবটম আর কতদূরে, মুর্দাগুলো খাদের নীচে কে কোন্ দিকে ছড়িয়ে আছে কে জানে। সেইটাই এখন জানতে হবে। তুলতে পারলে মোটা টাকা বকশিশ। এক-একটি মৃতদেহের জন্য পঞ্চাশ টাকা ঠিকে। জলে ডুবে তুলে আনতে হবে, হাতে হাতে নগদ টাকা, বাকি বকেয়ার কারবার নাই। যেমন করে হোক তুলে আনতে হবে মুর্দাগুলোকে। আস্ত না হলেও ক্ষতি হবে না, কঙ্কালগুলোও চলতে পারে, যে অবস্থায় পাওয়া যায় যাকে। বকশিশের কোন ইতরবিশেষ করা হবে না তার জন্য, মুডগুনতি এই পুরোপুরি পঞ্চাশ। হিম্মত থাকে নিয়ে এস তুলে।

হিম্মত সিংয়ের হিম্মত কিছুটা আছে বইকি। ঢাবায় চড়ে নেমে গেছে নীচে। অন্ধকারে সাঁতার কাটছে চানকের জলে। মৃতদেহ হাতড়াচ্ছে নীচের দিকে গিয়ে। ডুবছে আর উঠছে। একটাও যদি হাতে ঠেকে কোনদিক থেকে, তুলে ওরা আনবেই যেমন করে হোক। একটা হোক দুটো হোক, দশটা হোক বিশটা হোক, হাতের কাছে শুধু পেলেই হল। ডুবছে তো ডুবছেই, বিরাম নাই—বিরতি নাই, একটানা শুধু ডোবা আর উঠা। প্রেতপুরী থেকে মৃতদেহ ছিনিয়ে আনবার জন্য প্রেতের সঙ্গে ওরা লড়াই দিতেও প্রস্তুত। আটকায় কোন্ বেটার ছেলে, সামনে এগোয় কোন্ শূয়ারকা বাচ্চা। সাঁতার কাটে খাদের নীচে, হিম্মত সিংয়ের টণ্ডেলের দল ; তুলতে হবে মুর্দাগুলোকে। মুর্দা নয় এ—সোনা চাঁদি, মূল্য যে ওর অনেক। এক একটি মুর্দা পঞ্চাশটি রুপেয়া। কোম্পানী থেকে রিওয়ার্ড, সাহসিকতার পুরস্কার, দুর্ধর্ষ হিম্মতের ফালতু এটা কিস্মত। জমে আছে অনেকগুলো, সুড়ংয়ের মধ্যে এদিক-ওদিক ছিটকে আছে দেড়শর ওপর মালকাটা। মালকাটা নয়, রুপেয়াকা হুণ্ডি

খাদের নীচে ছড়িয়ে আছে থোকবন্দী কয়েক হাজার টাকা। টেনে হিঁচড়ে তুলতে পারলেই হল।

আটশ ফুট খাদের নীচে প্রেতপুরীতে ডুব মারছে হিম্মত সিংয়ের দল। অন্ধখনির অতল গহ্বর ভেদ করে সুড়ুংয়ের মুখে হানা দিচ্ছে সোনার তালের খোঁজে। পিটমাউথে তৈরি আছে বাঁশের দোলা। ম্যানেজার সাহেব অফিস থেকে নিজে এসে মাঝে মাঝে খবর নিয়ে যাচ্ছেন, ডেডবডি কিছু উঠল কি না। নিউমারিকেল স্ট্যাটিসটিক্স্ দিয়ে দৈনন্দিন রিপোর্ট লিখবার দায়িত্বটা তাঁরই উপর কি না। ইস্তক কটা উঠল আর রইলই বা কতগুলো, হরদম তাই খবর নিতে হচ্ছে।

কে জানে ওটা কাদের ছেলে। কেঁদে কেঁদে হায়রান হয়ে গেল। কোথায় যেন ওর বাবা হারিয়েছে। খুঁজে বেড়াচ্ছে পথে পথে। রেল লাইনের পাশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে কলিয়ারির পথ ধরে। বছর চার পাঁচ বয়েস মোটে ছেলেটার। সঙ্গী সাথী কেউ নেই, একা একাই ঘুরছে। ছুটকে হয়তো বেরিয়ে পড়েছে বাড়ি থেকে, কাউকে কিছু না বলে। কিংবা হয়তো কাছাকাছি কোথাও আছে ওর বাবা, দেখা হলেই থেমে যাবে কান্না। ও নিয়ে আর মাথা ঘামায় কে? পথের মানুষ পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। ছেলেটা কিন্তু থামছে না, কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে যাচ্ছে নিজের মনেই। কারো সঙ্গে দেখা হলেই থমকে একটু দাঁড়ায়, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় তার মুখের দিকে। প্রশ্ন করে কান্নার সুরে, বাবা কই, আমার বাবা?

কারো বাবার খবর তো কেউ রাখে না। কে আর ওকে জবাব দিতে যাবে। পথে ঘাটে এমনতর কত ছেলেই তো ঘুরে বেড়াচ্ছে; কার ছেলে তা কে জানে। জানবারই বা দরকারটা কি, পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবার পথটা তো কেউ আগলে রাখে নি। বাচ্ছা ছেলে অমন কেঁদেই থাকে। ও নিয়ে আর মাথা ঘামায় কে।

একে একে পাশ কাটাল অনেকেই। এগিয়ে চলল ছেলেটা। কারো সঙ্গে দেখা হলেই থেমে যায়, প্রশ্ন করে সঙ্গে সঙ্গে, বারে বারে ওই এক প্রশ্ন, বাবা কই, আমার বাবা?

জবাব কিন্তু পাওয়া যায় না। গ্রাহ্য করে না কেউ বাচ্চা ছেলের কথা। পাশ কাটিয়ে যায় একে একে। ঠোঁট দুটো হঠাৎ ফুলতে থাকে ছেলের, ছলকে ওঠে চোখ দুটো। অভিমানে ফেটে পড়ে দামাল ছেলে, রাগ হয় তার

বাবার উপর। বাড়ি ফিরতে এত দেরি করছে কেন, সেইজন্যই তো ওর মা-টা এত কাঁদে।

এদিক-ওদিক তাকায় একবার ছেলেটা। তাকায় দূরে কয়লাখনির হেড গিয়ারের দিকে। জোর গলায় ডাক পাড়তে থাকে, বাবা, বাবাগো—ও বাবা!

সাড়া দিবার নেই কেউ। বারে বারেই ব্যর্থ হয়ে হাওয়ার বুকে মিলিয়ে যায় কচি কণ্ঠের করুণ আহ্বান, বাবা গো—বাবা—।

কালভার্টটার পাশ দিয়ে মেঠো পথ ধরে এগিয়ে চলল ছেলেটা। সামনা-সামনি এগিয়ে আসছে একটা লোক। পথ আগলে দাঁড়িয়ে গেল বাচ্চাটা। প্রশ্ন করলে, বাবা কই?

লোকটা একটু দাঁড়াল। জবাব দিলে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে, তোর বাবা? তাকে তো কই দেখি নি বাপু, কে তোর বাবা?

সে কথার কোন জবাব নেই। ছেলেটা আবার এগুলো। ভাঙনের মাথায় পাম্প চলছে বয়ালের পাড়ে। লোক কতকগুলো কাজ করছে সেইখানে। এগিয়ে গেল ছেলেটা, সাহস করে এগিয়ে গেল আরও খানিক। সামনে পড়ল পাম্প খালাসী নৈমুদ্দি সারেং। সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই প্রশ্ন, বাবা কই, আবার বাবা?

কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে তাকাল একবার নৈমুদ্দি ছেলেটার দিকে। বললে, কি কইলি, তোর এহানে বাবা কেডারে। কাগো পোলা তুই?

সে কথার কোন জবাব দিলে না ছেলেটা। কাঁদছে শুধু ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে। আশে-পাশে জমল এসে আরও কয়েকজন। নৈমুদ্দি মিয়া জিজ্ঞাসা করলে ওর সঙ্গীদের, পোলাডারে কেউ চেনো নাকি রে?

কেউ চেনে না। ঠিকাদারের নতুন লোক সব, বাচ্চা একটা ছেলেকে আবার চিনতে যাবে কে?

মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল নৈমুদ্দি মিয়ার। ঢের দিন হল দেশের ভিটে ছেড়ে এসেছে, ছেড়ে এসেছে তার বাচ্ছাটাকে; দেখতে ঠিক এত বড়টাই হবে। সেইটা এসে মনের মধ্যে উঁকি মারে যে! একটু মোলায়েম সুরে বলে উঠল নৈমুদ্দি, কাঁদস ক্যান্ রে খোকন, চুপ দে।

ছেলেটা যেন ফেটে পড়ল রাগের চোটে, বাবা কই, আমার বাবা?

হাতুড়ির একটা ঘা পড়ল নৈমুদ্দির ছাতির উপর। বাবা কই,. ছেলেটার ওই এক কথা—বাবা কই। সুরটা বড় করুণ ঠেকে যে। কে জানে ঠিক এরই

মতই গাঁয়ের ভিটেয় বাচ্চাটা তার হামলাচ্ছে কিনা। বাপের কথা মনে হলে এইভাবে ঠিক পাড়ায় পাড়ায় খুঁজে বেড়ায় কিনা কে জানে।

নৈমুদ্দি ভাবছে। ছেলেটার দিকে তাকালে আর একবার, বললে, কি কইতেছিস, ভাল করে কই ক দেখিরে খোকন।

অপর একজন প্রশ্ন করলে, কোন্ পাড়ায় তুই থাকিস রে, গেছে কোথায় তোর বাপ ?

জবাব দিলে ছেলেটা, খাটতে গেইছে কয়লা খাদে।

খাদ কোথায় যে খাটতে যাবে। এইখানে, না অন্য কোথাও। কে জানে কি বলতে চায় ছেলেটা। লোকগুলো একটু ধাঁধাঁয় পড়ল। ছেলেটা শুধু কেঁদেই চলেছে।

মনের মধ্যে ঝড় বইছে নৈমুদ্দি সারেঙের। কে এই পোলার বাপ, কোথায় তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে ?

খুঁজে আর তাকে পাওয়া যাবে কি ? নৈমুদ্দি ঠিক খবর রাখে না, এরই মত আরও কত বাচ্চা ছেলে কাতরাচ্ছে আজ ঘর ঘরে। বাবা তাদের হারিয়ে গেছে কদমভাঙার খাদে। মুখে মুখে ওই এক প্রশ্ন, বাবা কই ? এই খাদে একদিন খাটতে এসেছিল এরই মত আরও কত ছেলেমেয়েদের বাপেরা, খাদ থেকে আর বাড়ি ফেরে নি। মায়ের বুকে মুখ গুঁজে তাই কাঁদছে কত ছেলে মেয়ে। থেকে থেকে খোঁজ করছে, বাবা কই ? ধাওড়াগুলোর আশেপাশে কান পাতলে শুনতে পাওয়া যাবে, আওয়াজ উঠছে ওই একই সুরে, বাবা কই ? দোরের সামনে মুখ বাড়িয়ে খুঁজছে যেন, বাবা কই ? ঘরে ঘরে রোল উঠছে কোমল কচি করুণ কণ্ঠে, বাবা কই ? ঘুমের ঘোরে কে যেন ওই চমকে উঠে স্বপ্ন দেখে, বাবা কই ? কদমডাঙার আকাশ-বাতাস ফেটে পড়ল অবুঝ মনের বোবা কান্নায়, বাবা কই ? পিটখাদের ওই অন্ধকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে গেছে আকুল করা ব্যাকুল সুর, বাবা কই, আমার বাবা ?

কাপড়ের খুঁট দিয়ে বাচ্চাটার চোখ দুটো একবার মুছে দিলে নৈমুদ্দি। প্রশ্ন করলে অপর একজন, কি নাম তোর বাপের রে, নামটা কি তার বল্ দেখি ?

কাঁদতে কাঁদতে জবাব দিলে ছেলেটা, বাউরী মুখুজ্যে।

ভদ্রলোকের ছেলে নাকি, বাপের নাম যে মুখুজ্যে। একটু বিস্ময়ের সুরে বলে উঠল নৈমুদ্দির সঙ্গীটা, কি বললি, কি বললি রে খোকন, বাপের নাম তোর বাউরী মুখুজ্যে ? বাউরী আবার মুখুজ্যে হয় নাকি রে !

লোকটাকে একটা ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলে নৈমুদ্দি। বললে, পোলাপানের লগে তর্ক করিস ক্যান। বাপের নাম ওর বাউল মুখুজ্যা, তাই নারে খোকন?

হেডমিস্ত্রীর ডাক পড়েছে কাজের মাথায়। ছেলেটা আবার এগিয়ে চলল খাদমোয়ানের পথ ধরে।

তুলতুলকে খুঁজতে বেরিয়েছে কাজলী। একটুখানি চোখের আড়াল হতেই কোন্ ফাঁকে যে বেরিয়ে গেল দামাল ছেলে, তার আর কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। পাড়ার ধারে রেল লাইন, ছটকে কোন্ দিকে গিয়ে পড়ল কে জানে। খসলা বাউরীকে সঙ্গে নিয়ে এদিক-ওদিক খোঁজ করছে কাজলী। দাঁড়াল গিয়ে রেল লাইনের ধারে। চারদিকে একবার তাকাল। হুস হুস শব্দে সামনের দিক থেকে এগিয়ে আসছে একটা মালগাড়ি। থামল একটু কাজলী, খসলা বাউরীকে একটুখানি আড়াল করে দাঁড়াল। গাড়িটা আগে পাস হয়ে যাক, ছোঁড়াটাকে বিশ্বাস নেই। বয়ালের জলে বাতাসী যেদিন নিখোঁজ হয়ে গেল, সেই রাত্রেই ডাকগাড়ির নীচে মাথা দিতে গিয়েছিল খসলা। কোনরকমে ধরে ফেলে কোঁড়া পাড়ার মালকাটারা। সে ভাবটা অবশ্য কেটে গেছে অনেকখানি, এই যা একটু ভরসা। আজও তবু একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারে নি কাজলী। খসলা যে তার নিজের বোনাই, তাই এতখানি ভাবতে হচ্ছে ছোঁড়াটার জন্যে। বাতাসীকে হারিয়ে চোটটা বড় কম পায় নি খসলা। কিন্তু তুলতুলটা হঠাৎ গেল কোথায়? এ যে আবার এক নতুন ফ্যাসাদ।

মালগাড়িখানা পাস হয়ে যেতেই নীচের দিকে নজর পড়ল খসলার। কচি পায়ের দাগ পড়েছে নরম মাটির উপর। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল খসলা, কাজল-দিদি, এই দ্যাখ—ছেলেমানুষের পায়ের দাগ, এ আমাদের তুলতুল না হয়ে যায় না।

নীচের দিকে তাকাল একবার কাজলী। তুলতুলের পায়ের দাগ এ হতে পারে। তা হলে কি এদিক পানেই গেছে কোথাও?

খসলা বললে, এইখানে তুই দাঁড়া খানিক। সাঁকোটার ওই নীচের দিকে নুড়ি পাথরের চাতালটা একবার খুঁজে আসি আমি।

নুড়ি পাথরের চাতাল তক আর যেতে হল না খসলাকে। ওদিক থেকে বাউরীপাড়ার একটা ছোকরা এসে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, কাজলপিসি,

তোর ছেলেটা যে খাদমোয়ানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একা তুকা এমন করে ছেড়ে দিইছিস কেনে।

চমকে উঠল কাজলী। কাউকে না বলে পালিয়ে গেছে দস্যি ছেলে। এতখানি আল-ফাবড় ডিঙ্গিয়ে খাদমোয়ান তক গেল কেমন করে?

কালভার্টের উপর থেকে চোখ পড়ল কাজলীর—খাদমোয়ানে চুপচাপ গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাদের একটা ছেলে। আর কেউ নয়, তুলতুল। কি আশ্চর্য, ওখানে গিয়ে অমন করে দাঁড়িয়ে আছে কেন?

ডানহাতি আলপথটা ধরে তাড়াতাড়ি ছুটল কাজলী। দূর থেকে জোর-গলায় ডাক পাড়তে লাগল—তুলতুল, ও তুলতুল রে।

পিটমাউথে কাজ চলছে। এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে কতকগুলো লোক। একটুখানি ফাঁকার মধ্যে দাঁড়িয়ে হেডগিয়ারের প্রকাণ্ড চাকাগুলোর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে তুলতুল। এ চাকা সে এর আগে ঘুরতে দেখেছে, এ জায়গা তার চেনা। মায়ের সঙ্গে কতবার এসে দেখে গেছে। ডুলি চড়ে খাদের নীচে নামতে দেখেছে ওর বাবাকে। সে ডুলি আজ গেল কোথায়, আসমানের ওই চাকা দুটো ঘুরছে না কেন। সবই যেন আজ গোলমাল ঠেকছে তুলতুলের কাছে। ডুলি হয়তো নেমে গেছে খাদের নীচে। ওরা এসে নীচের থেকে ঘণ্টা মারলেই বন্ বন্ করে ঘুরবে আবার চাকা। তবু ওরা উঠতে এত দেরি করছে কেন, ঘ্যাটাং ঘ্যাটাং আওয়াজ দিলেই তো পারে।

আশেপাশের লোকগুলোর দিকে ঘুরে ফিরে একবার তাকাল তুলতুল। ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। একটুখানি ফাঁকা পেয়ে ঝুপ করে বসে পড়ল খাদমোয়ানের রগ ঘেঁষে। পাটাতনের ফাঁক দিয়ে নীচের দিকে তাকাল। সমস্তটাই অন্ধকার, দেখতে কাউকে পাওয়া গেল না। ওইখানেই কেউ আটকে রেখেছে নাকি তুলতুলের বাপকে, ঘুটঘুটে ওই অন্ধকারের মধ্যে। হুকরে একবার কেঁদে উঠল তুলতুল, নীচের দিকে মুখ করে জোর গলায় হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, বাবা, বাবা গো—।

তাড়াতাড়ি ছুটে এল একটা খাদমোয়ানের খালাসী। হাত ধরে সরিয়ে দিলে খানিক পাশের দিকে। ঝাঁজালো গলায় বলে উঠল, তুম কোন্ আছে রে, চানকপর আকে চিল্লাচ্ছে কাহে?

এগিয়ে এল চাপরাসী ধুমকি সিং। চোখ পাকিয়ে বললে, কোন্ হ্যায়, তুম কোন্ হ্যায় রে।

পাগলের মত হন্ হন্ করে ছুটে আসছে কাজলী। দূর থেকে ডাক পাড়ছে, তুলতুল, ওরে তুলতুল।

লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করে আসছেন ইনচার্জবাবু, কার ছেলে, ওটা কার ছেলে রে?

তুলতুলকে তাড়াতাড়ি কোলের ওপর তুলে নিলে কাজলী। হাত জোড় করে বলে উঠল, আমার ছেলে, ঘর থেকে আজ মনের দুঃখে পালিয়ে এসেছে বাবুগো।

চোখ পাকিয়ে বলে উঠলেন ইনচার্জবাবু, তাই বলে এই খাদমোয়ানে এনে ছেড়ে দিবি নাকি, বিপদ হলে তুই দায়ী হবি হারামজাদী?

কাজলীর গায়ে সপাং করে পড়ল যেন একটা চাবুকের কশা। চাপরাসী ধুমকি সিং আর এক কাঠি ওপরে যায়। এগিয়ে এসে খসলা বাউরীর গর্দানটা চেপে ধরে তড়পে উঠল, এই হারামজাদা, উল্লুকাবাচ্ছা, ইধার আকে ক্যা করতা হ্যায়।

ঘাড় ধরে একটা ধাক্কা মেরে দিলে। রুখে দাঁড়াল খসলা বাউরী। ঝাঁকড়া এক মাথা চুলসুদ্ধ মাথাটা একবার ঝাঁকি দিয়ে চোখ পাকিয়ে তাকাল একবার ধুমকি সিংয়ের দিকে। ইনচার্জবাবু এগিয়ে এলেন লাঠি উঁচিয়ে। দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলেন, কি, এত বড় আস্পর্ধা!

কাজলী গিয়ে খসলাকে আড়াল করে দাঁড়াল। বললে, এবারটির মতন মাপ কর হুজুর, কি হবে আর লাঠি পেটা করে। আধমরা তো এমনিতেই হয়ে আছি আমরা, তার উপর এ যে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা।

ইনচার্জবাবু চোখ তেড়ে বললেন, মুখ দিয়ে যে খই ফুটছে। কথার পিঠে কথা দিয়ে লেকচার তো খুব ঝাড়তে শিখেছ। বলি আর কিছু বলবে?

জবাব দিলে কাজলী, বলবার কি উপায় আছে হুজুর, এর পর কিছু বলতে গেলে তোমাদের ওই পিয়ারের নোকর ধুমকি সিংকে দিয়ে এই ছুঁচো মুখটা যে বুঁচো করে ছেড়ে দেবে হুজুর। কিন্তু মাথার উপর ধর্ম সাক্ষী বাবুগো, এখনো ওই খাদের জলে পচছে। বুক থেকে নিজের পাঁজর খুলে ছুঁড়ে দিয়েছি ওই চানকের নীচে। সুড়ুং থেকে আজও সেটাকে তুলতে পার নি তোমরা। এর উপর কি উঠতে বসতে চোখ রাঙালে চলে হুজুর। নিদেন দুটো মিষ্টি কথাও বল, অন্তত এই বুকের চিতেয় ধিকি-ধিকি আগুনটা যতক্ষণ না একটুখানি নিবছে।

দুর-দুর করে কাঁপছে কাজলী। হু-হু করে কেঁদেই ফেললে। তুলতুলকে

বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে খাদমোয়ান থেকে সরে পড়ল তাড়াতাড়ি।

ইনচার্জবাবু বক্র একটা দৃষ্টি হেনে তাকালেন একবার কাজলীর দিকে, বললেন, ওগো ও বাউরী মুখুজ্যের বৌ, বলি শুনছ ?

এগিয়ে গেলেন খানিকটা, ডাক দিয়ে বললেন, শোন শোন, কথা আছে একটু। ইনচার্জবাবুর ধমক-ধামকটাই যে শুনে গেলে শুধু, সেই সঙ্গে একটা ভাল কথাও শুনে যাও। শুভ সংবাদ আছে একটা।

পিছন ফিরে তাকাল কাজলী। ইনচার্জবাবু বলে উঠলেন, যাবার আগে জেনে যাও যে ইচ্ছে করলে আমরা তোমাদের ভালও কিছু করতে পারি। আর সেই চেষ্টাই করা হচ্ছে। সরকার থেকে দুঃস্থদের সাহায্যকল্পে মঞ্জুর করা হয়েছে জনপিছু আরও তিনশ করে টাকা।

কাজলী বললে, কিসের টাকা বাবু ?

জবাব দিলেন বাবু মশায়, খয়রাত, অর্থাৎ কিনা দয়ার দান। এই খাদে যারা জলে ডুবে মারা পড়েছে কাজের মাথায়—মঞ্জুরি ওই টাকাটা দেওয়া হবে তাদের বিধবাদের হাতে। জনপিছু ওই তিন শ, বুঝলে ? বিকেলবেলা টিপসই দিয়ে অফিস থেকে নিয়ে যেও টাকা কটা।

বিধবাদের তিন শ করে টাকা দেওয়া হবে। এক কুড়ি নয়, দু কুড়ি নয়, এক মুষ্টে তিন শ। খবর একটা জবর বটে। কাজলী যে নিজেও একজন সেই তিন শ'র হকদার।

বুকের ভিতরটায় মোচর দিয়ে উঠল কাজলীর। উদ্‌ভ্রান্তের মত বলে উঠল, ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন হুজুর, তোমাদের এই দয়ার কথা কোনদিন আমরা ভুলব না। জয় হোক, জয় হোক তোমাদের।

মুহূর্ত আর দাঁড়াল না কাজলী। হন্ হন্ করে এগিয়ে গেল তুলতুলকে কোলে নিয়ে। চোখের জলে পথ-ঘাট যেন ঝাপসা হয়ে আসছে। মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে হুজুরদের ওই দয়ার দান তিন-তিন শ টাকা। কে মুছল সিঁথির সিন্দুর, কার হাত থেকে খসে পড়ল বিয়ের নোয়া, টিপসই দিয়ে দাঁড়াও গিয়ে কোম্পানীর অফিসে। বিধবাদের পোয়াবারো, সরকার থেকে মোটা টাকা বকশিশ, বকশিশ না ঘুষ, নাকি হাতে হাতে নগদ দামটা চুকিয়ে দিতে চায়। জলজ্যান্ত এক-একটা মানুষের দাম তিন শ টাকা। এমন কথা ভূ-ভারতে কেউ কখনো শুনেছে ? বড় মুখ করে বলতে একটু লজ্জাও তো করে না !

যেতে যেতে থমকে হঠাৎ দাঁড়াল একটু কাজলী। পিছন ফিরে তাকাল

একবার খাদমোয়ানের দিকে। দূর থেকেই হয়তো বা ওই হেডগিয়ারের চাকা দুটোকে শুনিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল কাজলী, ওগো শুনছ, বলি শুনছ নাকি তুলতুলের বাপ, শুনতে পাচ্ছ খাদের নীচে থেকে? তোমার দাম আমরা পেয়ে গেলুম, একসঙ্গে অনেকগুলো টাকা। এখন তুমি নিশ্চিন্তে মরতে পার, সুড়ুংয়ের জলে হাবুডুবু খেয়ে। শুনছ—বলি শুনছ নাকি?

চমকে উঠল খসলা বাউরী। কাজলীর হঠাৎ হল কি আজ। পাগল-টাগল হয়ে যাবে না তো?

কাজলীকে দু হাত দিয়ে একটা ঝাঁকি দিয়ে বলে উঠল খসলা, কাজলদিদি, এ তুই কি করছিস? ছেলেটা তোর হেদুসে যাবেক যে।

তাড়াতাড়ি আবার সামলে গেল কাজলী। চোখ দুটো একটু মুছে নিয়ে বললে, না ভাইটি, কাঁদব না আর, চল। আমাকে যে বাঁচতে হবেক এই তুলতুলের জন্যে। তা ছাড়া যে আমার আর কোন উপায় নাই ভাইটি।

এগিয়ে চলল আলপথ ধরে। উঠল গিয়ে রেললাইনের কালভার্টটার উপর। হুস্ হুস্ শব্দে সামনের দিক থেকে এগিয়ে আসছে কোল্ডফিল্ড এক্সপ্রেস, এগিয়ে আসছে ঝড়ের বেগে। কাজলীকে আড়াল করে থমকে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল খসলা। কি জানি ওকে বিশ্বাস নেই, গাড়িটা আগে ভালোয় ভালোয় পাস হয়ে যাক। খাদে যেদিন জল ঢুকল—ঠিক সেইদিন দুপুর রাতে আফিঙ খেতে চেয়েছিল কাজলী, বাউরী মুখুজ্যের শোকে। ধরে ফেলেছিল ময়না-বুড়ি, তাই সে-যাত্রা বেঁচে গেছে কোন রকমে।

এসে পড়ল গাড়িখানা। গার্ডসাহেবের দরজার জানালাটা খোলা। ডিসট্যান্ট সিগন্যালটা লক্ষ্য করে বাঁরদিক পানে চেয়ে আছেন একদৃষ্টে। কাজলীর কোল থেকে তুলতুল হঠাৎ সাড়া দিয়ে উঠল গার্ডসাহেবকে লক্ষ্য করে, সেলাম সাহেব, সেলাম।

বারে বারেই হাত নাড়ছে, সেলাম সাহেব, সেলাম।

ওই ওদের এক খেলা! বাউরীপাড়ার পাশ দিয়ে রেলগাড়ির শব্দ পেলেই ঘর থেকে সব ছুটে বেরোয় ছেলেমেয়ের দল। গার্ডসাহেবকে দু হাত নেড়ে সেলাম দিতে থাকে, সেলাম সাহেব, সেলাম।

সামনের ওই রেল লাইনের কালভার্টটাকে চাকার নীচে ঠোক্কর মারতে মারতে লহমার মধ্যে পাস হয়ে গেল কোল্ডফিল্ড এক্সপ্রেস।

তুলতুলের মুখের দিকে দু চোখ ভরে চেয়ে আছে কাজলী, শুনছে বুঝি অবাক হয়ে, সেলাম সাহেব, সেলাম।

॥ ৮ ॥

ফেলারামের ছুটি হয়ে গেছে। একেবারেই ছুটি। এক মাসের নোটিস দিয়েছে কোম্পানী। এর মধ্যে চায়ের দোকান উঠিয়ে নিয়ে এখান থেকে সরে পড়তে হবে। কোম্পানীর ত্রিসীমানায় ফেলারামের আর ঠাঁই হবে না। রেভিনিউ কিছু বেড়ে গেল কোম্পানীর। বটতলার খাজনা বাবদ বাৎসরিক মোটে দুটি করে টাকা দিত ফেলারাম। সেই জায়গায় হেড-চাপরাসী ধুমকি সিংয়ের ভাতিজা সাড়ে সাত টাকায় রাজী হয়ে গেছে। অতএব ফেলারামের ছুটি। কদমডাঙা রেস্টুরেন্টের অক্ষয় বটাশ্রিতা মা বটেশ্বরীও এই সঙ্গে পড়ে গেছেন ইজেক্টমেন্ট নোটিসের আওতায়। তাঁর সিন্দুরলিপ্ত শিলাময়ী চামুণ্ডা মূর্তিখানিও বটতলা থেকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে হবে ফেলারামকে। পা তুলেছেন বটেশ্বরী মা, অক্ষয়বটের মায়া কাটিয়ে। পোঁটলাপুঁটলি তাঁর বাঁধা হয়ে গেছে। কদমডাঙা কলিয়ারি ছেড়ে ফেলারামের ঘাড়ে ভর করে কোথায় গিয়ে এখন উঠতে হবে—সেইটুকুই শুধু জানা যায় নি। নতুন কোন কোম্পানীর আওতায় ফাঁকা দেখে একটা বটতলা জুটে যাবে নিশ্চয়ই। যার ভাবনা ভাবছে সে, কোম্পানীর নোটিসখানা মা বটেশ্বরী সেবাইতের নামে। যা হোক কিছু ব্যবস্থা একটা করতেই হবে তাকে। সেই ব্যবস্থাই করছে ফেলারাম। মনে মনে দিন গুনছে নোটিসের মেয়াদ ধরে। যেতে যখন হবেই—ঘর-সংসার জরু-গরু নিয়ে মানে মানে সরে পড়াই ভাল। বোঝার উপর শাকের আঁটি, সেই সঙ্গে মা বটেশ্বরীও যাবেন। সাক্ষাৎ মা চামুণ্ডা, চটের থলেয় পিঠমোড়া করে বেধে খাদের জলে তো আর ভাসিয়ে দেওয়া যায় না। মাও যাবেন সঙ্গে।

কথায় কথায় উত্তেজিত হয়ে উঠলেন খাদমুন্সী ঘড়ুইমশায়। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন—সইবে না, এ পাপ কিন্তু সইবে না ফেলারাম, এ আমি তোমাকে বলে রাখছি। ভগবানের নোটিস ঝুলছে যেন কোম্পানীর মাথার উপর। বাজ হয়ে একদিন ভেঙে পড়বে!

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে গর্জে উঠলেন ঘড়ুইমশায়। ফেলারামকে নাকি অন্যায়ভাবে নোটিস দেওয়া হয়েছে। প্রতিবাদ করতে সাহস পায় নি ফেলারাম, দোকানপাট বন্ধ করে তৈরী হচ্ছে নোটিসওয়ালাদের হুকুম তামিল করবার জন্য। বিক্ষোভে তাই ফেটে পড়েছেন ঘড়ুইমশায়। যদিও তিনি ভাল ভাবেই জানেন যে বৃথা তাঁর এই অরণ্যে রোদন নিরুপায়

ফেলারামের এই চরমতম দুঃসময়ে বিশেষ কোন কাজে লাগবে না। তবু একটু মনের ঝাল তিনি মিটিয়ে নিলেন কদমডাঙা কর্তৃপক্ষের ভয়াবহ ভবিতব্যের কথা স্মরণ করে। বাজ হয়ে একদিন ভেঙে পড়বে, আপাতত এইটুকুই সান্ত্বনা।

চায়ের পাত্রে দু-একটা চুমুক দিয়েই পেয়ালাটা টুলের উপর নামিয়ে দিলেন ঘড়ইমশায়। বটতলার মৌতাত যে শেষ হয়ে আসছে, মুখ দিয়ে আর গলতে চায় না ফেলারামের চা।

এগিয়ে এল ফেলারাম হাতের কাজ ফেলে। বললে, ওকি, চা খাওয়া আপনি বন্ধ করলেন কেন? না-না—সে হবে না, বের করুন আপনার আফিঙের কৌটো, যে কটা দিন আছি—চা আপনাকে খেতেই হবে এই বটতলায় বসে।

পিয়ালাটা এগিয়ে দিলে ফেলারাম। ঘড়ইমশায়ের পকেটের মধ্যে হাত গলিয়ে বের করলে তাঁর আফিমের কৌটোটা। গুঁজে দিলে ঘড়ইমশায়ের হাতে, বললে, এই নিন ধরুন, সকালবেলা আর মন-মেজাজ খারাপ করবেন না।

কলিয়ারির কাজকর্ম বন্ধ। বটতলার সামনে দিয়ে লোক-চলাচল কিন্তু বন্ধ হয় নি। কুলিকামিন মালকাটারা হামেশাই যাওয়া আসা করছে। কেউ কেউ এসে থমকে একটু দাঁড়াচ্ছে, করুণভাবে চেয়ে যাচ্ছে ফেলারামের রেস্টু-রেন্টটার দিকে। কোম্পানীর কপাল ভেঙেছে, সেই সঙ্গে ফেলারামেরও হাটবাট আজ ভাঙল। পান বিড়ি চা জলখাবারের দোকানটাও আজ বন্ধ হয়ে গেল। খদ্দেরগুলো কিন্তু ঠিকই ছিল এ পর্যন্ত, ঝাঁপ-ঝাঁপড়ি বন্ধ দেখে হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছে একে একে।

ঘড়ইমশায় গম্ভীর হয়ে কি ভাবছেন। ভাবছেন শুধু ফেলারামের দণ্ড-মুণ্ডের কর্তাদের কথা। কিন্তু ও বেচারার অপরাধটা কি, কি কারণে এখান থেকে নোটিস দিয়ে তাকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সে কথা তো কেউ কাগজে-কলমে খুলে বলছে না।

কাগজে-কলমে অনেক কথাই খুলে বলবার দরকার হয় না। আঁচে ইঙ্গিতে বুঝে নিতে হয়। ফেলারাম আজ অবাঞ্ছিত, অপরাধ তার গুরুতর। কয়লাখাদের বিপর্যয়ের মুখে কোম্পানী যখন দায়িত্বভার লঘু করার জন্য ব্যাপারটাকে কোন রকমে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করছে, সেই সময় কিনা জটলার একটি আড্ডা হয়ে উঠল ফেলারামের ওই বটতলার রেস্টুরেন্ট। চা

বিস্কুট তেলেভাজার আদ্যশ্রাদ্ধ করতে করতে রাতারাতি গজিয়ে উঠল ভুঁইফোড় এক খনি-কল্যাণ সমিতি। বাইরের লোকের আস্কারা পেয়ে নিষ্কর্মা ওই বকাটের দল বারে বারে গিয়ে হানা দিলে কোম্পানীর অফিসে। দাবি-দাওয়ার অন্ত নেই—অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, ক্ষতিগ্রস্ত খনিশ্রমিকদেব উচ্চ রেটে ক্ষতিপূরণ চাই। এটা চাই, ওটা চাই, হেন-তেন হাজার কিসিম ফ্যাচাং। চাই তো না হয় বোঝা গেল, উপর থেকে মালিকপক্ষের হুকুমনামা না এলে দাবি-দাওয়াটা মেটে কেমন করে। তাই নিয়ে কি না হুল্লোড়, অফিসঘরে চড়াও হয়ে বেপরোয়া ঝাণ্ডাবাজি। নিষ্কর্মা বকাটের দল রাতারাতি সঙ্ঘ গড়ে কোম্পানীর সঙ্গে যেন পাঞ্জা লড়তে এসেছে। অন্ন চাই আর বস্ত্র চাই। বে-ফালতু এই অন্ন-বস্ত্রটা আসে কোত্থেকে। ঝাণ্ডা লাগানো ওই ডাণ্ডাটা দিয়ে অফিসঘরে খোঁচা দিলেই কি অন্নবৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে? বাতুলের প্রলাপ আর কাকে বলে!

চলছে যখন এই টাগ অব ওয়ার—দাবি বনাম 'দাবা দেও', অন্ন বনাম 'নিকাল যাও', ভিক্ষা বনাম 'নৈব নৈবচ', আর ঝাণ্ডা বনাম ডাণ্ডা—ঠিক সেই মুহূর্তে হাঁড়ি-হেঁসেল কেড়ে বসল বটতলা রেস্টুরেন্টের চা-ওয়ালা ফেলারাম। অন্নসত্র খুলে বসল বখাটেগুলোর জন্য। মায়ের চেয়ে মাসী বেশি দরদী। ইনচার্জবাবু গোড়াতেই ধরেছেন, কলিয়ারিব ডামাডোলের সুযোগ নিয়ে ইস্তক যারা কোম্পানীকে হেয় করবার চেষ্টা করে আসছে, ফেলারামকে তাদের থেকে পৃথক করা যায় না। ওরই আড্ডায় সর্বপ্রথম ঝাণ্ডাবাজদের খানাপিনার ব্যবস্থা করা হয়। আস্পর্ধার চরম। এই সঙ্গে আছে কয়েকটা কলিয়ারির চাঁই, মাসে মাসে যারা কোম্পানীর নিমক খায়। খাদ বন্ধের অবকাশে আদাজল খেয়ে খনি কল্যাণ করে বেড়াচ্ছেন কদম-ডাঙার ডাঙা ডহর ঘুরে। মতিভ্রম আর কাকে বলে। একধার থেকে বিলকুল সব ছাঁটাই। সেই ব্যবস্থাই করা হচ্ছে বাবাজীবনদের জন্য। আপাতত তিন কড়ার এক ফোকটিয়া প্রজা ফেলারামকেই নোটিস দেওয়া হয়েছে। কলিয়ারি চালু হওয়ার আগেই অন্যান্য সব চাঁইপুঙ্গবরাও একে একে খসবেন। ফেলারামটা তো বিদেয় হোক আগে।

চাপরাসী ধুমকি সিং এসে চড়াও হয়ে গেল সকাল বেলা। এসেই একটা নতুন খবর শুনিয়ে দিলে ফেলারামকে। রেস্টুরেন্টের সাইনবোর্ডটা নামিয়ে ফেলতে হবে। ওটা নাকি আইনমত বাতিল হয়ে গেছে। এ জমি এখন কোম্পানীর খাসে। এখানে কারও সাইনবোর্ড আর ঝুলতে দেওয়া হবে না।

ফেলারাম ঈষৎ আপত্তি জানিয়ে বললে, মেয়াদ তো এখনো শেষ হয় নি আমার, এখনি ওটা হঠাতে হবে কেন!

ধুমকি সিং একটা হুমকি দিয়ে বললে, বড়া সাবকা মর্জি।

এর উপর আর কথা কি, বড়া সাবকা মর্জি। আড়চোখে একটু তাকালেন ঘড়ইমশায় ধুমকি সিংয়ের দিকে।

চাপরাসীজী চোখ তেড়ে বলে উঠল, হঠাও এ চিজ হিঁয়াসে, জলদি হঠাও।

ফেলারাম বললে, তাই বলে তোমার মুখের কথা খসতে না খসতেই হঠাতে হবে নাকি, তার জন্যে একটু সময় দিতে হবে তো। সকালবেলা এসে এমনধারা জুলুম করছ কেনে বল দেখি সিংজী।

বটগাছের ডালে ঝুলন্ত ওই সাইনবোর্ডটার দিকে গর্জে একবার তাকাল ধুমকি, বললে, উতার লেও, জলদি হুঁয়াসে উতার লেও।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে ফেলারাম, জলদি-টলদি হবে না সিংজী, বল গে তোমার বড সাহেবকে। ওটা খুলতে অনেক সময় লাগবে, সন্ধ্যার আগে সাইনবোর্ড আমি নামাতে পারব না।

কুদে উঠল ধুমকি সিং। বটগাছের ডালে ঝুলন্ত ওই সাইনবোর্ডখানা লক্ষ্য করে ভোজপুরী তার পাকা বাঁশের লাঠিখানা দিয়ে ভুমাদুম বাড়ি মারতে শুরু করে দিলে। চোখ পাকিয়ে বললে, হঠা লেও, আভি এ চিজ হঠা লেও হিঁয়াসে।

ধুমকি সিংয়ের বাড়াবাড়ি দেখে থ মেরে গেল ফেলারাম। এতটা সে আশা করে নি। জন চার-পাঁচ মালকাটা দূর থেকে লক্ষ্য করছে ধুমকি সিংয়ের কেরামতিটা। পিছন দিক থেকে এগিয়ে এল ফুলটুশি কামিন। ফেলারামকে লক্ষ্য করে বললে, বলি কি হল কি ঠাকুর, ধুমকি সিংয়ের এত দাপটটা কিসের?

ফেলারাম নীরব, বলবার তার কিছু নাই। চেয়ে আছে শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে। সাইনবোর্ডখানা তুমড়ে তেপড়ে রদ্দি হয়ে গেল, ধুমকি সিংয়ের লাঠির চোটে। করুণভাবে চেয়ে আছে ফেলারাম। ধাঁই ধাঁই করে ঘা পড়ছে সাইনবোর্ডের লোহার চাদরে। এক-একটি কুলিশ হয়ে পড়ছে যেন ফেলারামের বুকের উপর।

গর্জে উঠলেন ঘড়ইমশায়। গম্ভীরভাবে হেঁকে উঠলেন, ধুমকি সিং!

পালোয়ানজীর লাঠিটা হঠাৎ আপনা থেকেই নেমে গেল নীচের দিকে।

ধুমকি সিংকে লক্ষ্য করে তড়পে উঠল ফুলটুশি কামিন, এখানে এসে তোকে ঠেঙ্গা লাচাতে কে বলেছে রে মুখপোড়া? খাদের জলে বাসমড়া হয়ে কোম্পানী তোর পচছে। সেইখানে যেঁয়ে ঠেঙ্গা লাচা গা যা।

দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠল ধুমকি সিং, তুম শালী ফিন কৌন হ্যায় রে, নিকালো হিঁয়াসে।

ফুলটুশি জবাব দিলে, মুখ সামলে কথা বলিস মুখপোড়া। ফেলারামের আমি খদ্দের, দেনা-পাওনার হিসেব করতে এসেছি; তুই আঁটকুড়ো চোখ রাঙাবার কে রে? নিকালকে হয় তুই নিকাল যা, বেরো আঁটকুড়ো এখান থেকে।

ধুমকি সিং আবার শক্ত করে চেপে ধরলে লাঠিটা। চোখ পাকিয়ে বলে উঠল, কিয়া, কিয়া বোলা হারামজাদী?

চোখ মুখ তেড়ে ফুঁসে উঠল ফুলটুশি, কি বললি কি বললি রে আঁটকুড়ো, যত বড় মুখ না তার তত বড় কথা! তোর সাতগুষ্টির আজ নিকুচি করেগা, তবে ছাড়েগা। তুই কি মনে করেছিস কি রে হারামজাদা।

রেস্টুরেন্টের আড়াইসেরী বঁটিখানা পড়েছিল এক পাশে। তুলে নিয়ে হন হন করে ছুটে এল ফুলটুশি। হাঁ-হাঁ করে উঠল ফেলারাম, ফুলটুশিকে বাধা দিয়ে বললে, ও কি, ও আবার কি করছিস তুই ফুলটুশি?

যা করবার তা ঠিকই করছে ফুলটুশি। বঁটি উঁচিয়ে হনহন করে এগিয়ে গেল ধুমকি সিংয়ের দিকে। ফুলটুশির ওই রণচণ্ডী মূর্তি দেখে পিছু হঠতে আরম্ভ করেছে ধুমকি সিং। বঁটি তুলে চিৎকার ছাড়ছে ফুলটুশি, আয়—আয় মুখপোড়া এগিয়ে আয়, দেখি একবার কত বড় তুই ধুমকি সিং। ফের যদি মুখ খালি করে গালিগালাজ করেছিস তো তোরি একদিন কি আমারি একদিন। হারামজাদা শূয়োর কোথাকার।

হারামজাদীর মুখ থেকে শুনতে হল আজ হারামজাদা। তার উপর কিনা শূয়োর, ফাউ দিলে এটা ফুলটুশি। এর পর আর এ হেন জায়গায় ইজ্জতবালা কোন খানদানি আদমীর দাঁড়িয়ে থাকাই চলে না। সোজা পথ ধরে কেটে পড়ল ধুমকি সিং। যেতে যেতে নিজের মনেই গজরাচ্ছে। ফেলারামের উপর বেড়ে গেল হয়তো আক্রোশটা।

মনে মনে কি যেন বুঝি ভাবছে ফেলারাম। ফুলটুশিকে লক্ষ্য করে বললে, তুই আবার এসব ফ্যাচাং বাড়াতে গেলি কেনে ফুলটুশি, অফিসে গিয়ে বেটা কি বলতে কি বলবেক কে জানে। একেই তো ওরা আমার উপর

খাপ্পা হয়ে আছে।

চাঁচা গলায় বলে উঠল ফুলটুশি, তা বলে কি করবেক কি শুনি। মাথাটা তোমার কেটে লিবেক নাকি? লুটিস দিয়েছে—উঠে যাবে, কদমডাঙার এই বটতলার মুখে লাথি মেবে চলে যাবে অন্য কোথাও। দুকান করবার জায়গার অভাব নাকি?

লাঠিপেটা তোবড়ানো ওই সাইনবোর্ডটার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে গোলাপী। ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে কাঁদতে আরম্ভ করেছে। এগিয়ে এল ফেলারামের দিকে, বললে, তখনি আমি বলেছিলুম, হাতের পাতের সব খোয়াতে যেও না। গায়ের কটা গয়নাগাঁটি পর্যন্ত খুলে নিয়ে গিয়ে বেচে দিলে স্যাকবাব দোকানে। পাঁচ দিন ধবে হেঁসেল ঠেলে হাজাব লোককে পিণ্ডি গেলালে। লাভটা কি হল শুনি? কোন্‌দিক এখন সামলাবে সামলাও!

কথাটা নেহাত ভুল বলে নি গোলাপী। অন্নসত্রে যোগান দিতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে বসে আছে ফেলারাম। ভেবেছিল এই কলিয়ারি থেকেই আবার একদিন কড়ায় গণ্ডায় উসুল হয়ে যাবে। কাজে কিন্তু ঘটে গেল আর একরকম। তা হোক গে, সেজন্য কোন আপসোস নেই ফেলারামের। গোলাপীকে একটু সান্ত্বনা দিয়ে বললে, ও নিয়ে আর দুঃখ করিস না গোলাপী। ভাগ্যে যদি থাকে—গতর খাটিয়ে আবার করে নেব সবই। সেজন্যে এত ভাবছিস কেনে তুই?

ঘড়ইমশায় মাঝখান থেকে বলে উঠলেন, তোমার হিসেব বাকির খাতাখানা একবার বের কর দেখি ফেলারাম। এই সময় সব টাকাকড়ি পেয়েছে কিছু, বাকি বকেয়া যতটা পার আদায় করে নাও।

ঠিকই বলছেন ঘড়ইমশায়। টাকাকড়ি কিছু কিছু পেয়ে গেছে অনেকেই। খনি বিভাগের চাপে পড়ে কোম্পানীকেও ছাড়তে হয়েছে যৎকিঞ্চিৎ। তা ছাড়া ওই সরকারী সাহায্য, বিধবাদের মাথা পিছু তিন শ করে টাকা। সে টাকা ওরা পেয়ে গেছে হাতে হাতে।

লাসগুলো কিন্তু পায় নি এখনও। খাদ থেকে তোলা হলেই নাকি পাওয়া যাবে একে একে। শ্মশানঘাটের খরচটাও সেই সঙ্গে ধরে দেবে কোম্পানী। যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য, বৈতরণী পারের কড়ি, জমা আছে কোম্পানীর খাতায়।

ঘড়ইমশায়ের অনুরোধে ধারবাকির খাতাখানা খুলে বসল ফেলারাম। বাকি পড়ে আছে অনেকগুলো টাকা। আর কি সে সব আদায় হবে? তবু কজন দিয়ে গেল নিজে থেকেই। বাকিগুলোও আসবে হয়তো একে একে।

কিংবা হয়তো আর নাও আসতে পারে, দোকানটা একেবারে উঠে গেল কিনা।

ঘড়ইমশায় ফেলারামকে একটু তাড়া দিয়ে বললেন, তাড়াতাড়ি একটা লিস্টি করে ফেল দেখি, ঘুরে এস একবার ধাওড়াগুলো, দেখ যদি এই বেলা কিছু আদায় হয়ে যায়।

গোলাপীর সঙ্গে সুখ-দুঃখের দুটো কথা হচ্ছিল ফুলটুশির। হিসেব বাকির কথা শুনে এগিয়ে এল খানিক। ফেলারামকে লক্ষ্য করে বললে, কালীচরণের কিছু ধার উদোর আছে নাকি ঠাকুর, দেখ দেখি একবার খাতাটা।

চাইলে একবার ফেলারাম ফুলটুশির দিকে। একটু হ্যাঁক টেনে বললে-কেনে বল্ দিখি?

জবাব দিলে ফুলটুশি, ওর কুড়ি তিনেক টাকা গেঁজেসুদ্ধ গচ্ছিত আছে আমার কাছে। যা পাবে তা এইবেলা কেটে লাও।

অবাক হয়ে গেল ফেলারাম। কালীচরণের গচ্ছিত টাকা, তাই থেকে সে ঋণমুক্ত করতে চায় আজ কালীচরণকে। তার চেয়েও বড় কথা ফেলারামের এই দুঃসময়ে যৎসামান্য পাওনাটা তার আদায় করে দিতে চায় কালীচরণের কাছ থেকে। অথচ তার নিজের বাকি শোধ করতে দফায় দফায় কথার খেলাপ করেছে এই ফুলটুশি। আজ সে হঠাৎ নিজে থেকে এগিয়ে এসে কালী মালকাটার ধার শুধতে চায়।

কি যেন একটু ভেবে নিলে ফেলারাম। ফুলটুশিকে লক্ষ্য করে বললে, কিন্তু ও টাকা তো মঞ্জরীর লাগনা, মঞ্জরী কাল তিন শ টাকা পেয়ে গেল যে।

চোখ দুটো হঠাৎ কপালে উঠল ফুলটুশির। বললে, তা হলেই হল আর কি, মঞ্জরী দিবেক টাকা? উ লচ্ছারীকে আমি চিনি না। যখাই বাগতিকে আবার সাঙা করবেক বলছে সে আঁটকুড়ী।

হকচকিয়ে উঠল যেন ফেলারাম। চমকে উঠলেন ঘড়ইমশায়। এর মধ্যেই সাঙা, কালাশৌচটা পর্যন্ত পার হয় নি যে এখনও।

ওপাশ থেকে গোলাপী একটু মুখ টিপে হেসেই ফেললে, ফুলটুশির সাঙার কথা শুনে। লবযৌবনী মঞ্জরীর আর তর সইছে না, মরণ আর কি।

হল্লা উঠছে কোম্পনীর অফিসঘরের সামনেটায়। খনিকল্যাণ চড়াও হয়েছে। খই ফুটছে শ্রমিক নেতার কণ্ঠে। খাদ থেকে আজও মৃতদেহগুলো তুলে আনবার ব্যবস্থা হয় নি কেন, কোম্পানীর এ গাফিলতির জবাবদিহি

চাই। দিতে হবে এ ক্ষয়ক্ষতির উপযুক্ত খেসারত। খাদ যতদিন চালু না হচ্ছে—খনিকর্মীদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করতে হবে কোম্পানীকে। দিতে হবে লে-অফ কমপেনসেশন, শতকরা অন্তত আশী টাকা হারে। মালিক-পক্ষের প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হবে না খনিকল্যাণ। ঝড়ের বেগে চলতে থাকবে আন্দোলন। কদমডাঙার বুকের উপর গণদেবতার কর্‌জির রক্তে লেখা হবে এক নতুনতর ইতিহাস। প্রলয় কাণ্ড না ঘটিয়ে খনিকল্যাণ ক্ষান্ত হবে না। হৈ-হৈ শব্দে মহড়া চলছে মহতী সেই প্রচেষ্টার।

শুরু হয়ে গেছে ঠেলাঠেলি ধস্তাধস্তি। চীৎকার উঠছে কর্ণভেদী কুলিশ-কণ্ঠে, মানতে হবে, মানতে হবে।

মানতে হোক আর না হোক—ব্যাপারটা একটু জানতে হয়েছে। তৈরি হয়ে গেছে অপর পক্ষ। মানতে হবের মোকাবিলায় শেষ পর্যন্ত কাঁদতে না হয় বাবাজীবনদের।

ফেলারামের রেস্টুরেন্টটা থেকে থেকে যেন কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল, গগনভেদী ইনক্লাবের ধাক্কায়। ' ঘড়ইমশায় বলে উঠলেন, এক কাণ্ড না করে এরা ছাড়বে না ফেলারাম। এরাই দেখো ঠাণ্ডা করে ছেড়ে দেবে কোম্পানীকে।

ফুলটুশি একটু ভয় পেয়ে বললে, গুলিগালাজ চলবেক না তো বাবু, ওরা যে আবার পুলিস মোতান করেছে।

ঘড়ইমশায় জবাব দিলেন, গুলি করবে কটাকে শুনি, এরা হল রক্তবীজের ঝাড়, এক যাবে তো আর এক গজাবে। মহাবিপ্লব এল বলে দেশে, এ আর কেউ ঠেকাতে পারবে না।

ফুলটুশি একটু চিন্তিতভাবে বললে, তা হলে কি হবেক মুন্সীবাবু, বোম-টোম কিছু পড়বেক নাকি খাদমোয়ানে?

চমকে উঠল গোলাপী, ফুলটুশির কথা শুনে। বোম তো একবার পড়েছিল সেই লড়াইয়ের বাজারে। আবার সেই সব শুরু হল নাকি?

ব্যস্ত হয়ে উঠল গোলাপী। এ সময় আবার বাবুয়াটা গেল কোথায়? ঝাণ্ডা নিয়ে দলের সঙ্গে বেরিয়ে যায় নি তো?

বাবুয়া একটা মজা পেয়ে গেছে। ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে বেরিয়ে যায় মাঝে মাঝে। ভিড়ে যায় ওই ঝাণ্ডাওয়ালা বাবুদের দলে। একসঙ্গে সুর মিলিয়ে আওয়াজ দেয়, মানতে হবে, মানতে হবে। বাবুয়ার কাছে এ যেন একটা তামাশা।

জোর একটা আওয়াজ উঠল আর একদফা। গোলাপী একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। ফেলারামকে তাড়া দিয়ে বললে, বাবুয়াকে দেখ না একটু এগিয়ে। এ সময় আবার গেল কোথা ছোঁড়াটা?

ফেলারাম একটু বিরক্তির স্বরে বললে, কে জানে বেটা কোন্ চুলোয় গেছে। বিপদের উপর ওই আবার এক আপদ। ও বেটাকে আবার খুঁজতে যাবেক কে?

চায়ের দোকানের বে-ওয়ারিশ বাচ্ছা একটা চাকর। খুঁজবার ওকে দরকার হয় না। গোলাপীর নেহাত আদিখ্যেতার চাপে উঠতে হল কিন্তু ফেলারামকে। এগিয়ে একটু দেখে আসাই ভাল।

গোলমাল ক্রমশ বাড়ছে অফিসঘরের সামনেটায়। সারবন্দী লাল পাগড়ি। শুরু হয়ে গেছে লাঠি চার্জ। ধোঁয়া ছাড়ছে কাঁদুনে গ্যাস। চারদিক থেকে বেটন চলছে পাইকারী হারে। আওয়াজ উঠছে, ফট ফট ফটাশ।

ঝিমিয়ে পড়ল জিন্দাবাদ। ছিটকে পড়ল কে কোন্ দিকে। হাত ভাঙল, পা ভাঙল, ভাঙল কারো মাথার খুলি। থান ইঁটের চোটে লাল হয়ে গেল গোটাকয়েক লালপাগড়ির নাঙ্গা শির। ঘায়েল হলেন পুলিস সাহেব। এগিয়ে এল আর্মড পুলিস, উঁচিয়ে ধরলে সারবন্দী গোটাকয়েক রাইফেল। গুলি চলবে, চলবে গুলি দরকার হলে। ওয়ান—টু-উ-উ—

ভেঙে পড়ল খনিকল্যাণ। এদিক-ওদিক কে কোন্ দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে দে দৌড়। বিলকুল সব ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যেই।

দূর থেকে হঠাৎ চোখে পড়ল ফেলারামের—বাবুয়াকে তাড়া করে আসছে বেটনধারী এক পুলিস। লোহার একটা ডাণ্ডা হাতে ধাওয়া করেছে ধমকি সিং। সেপাই এসে ধরে ফেললে ছোঁড়াটাকে। ফেলারাম গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল যেন, কাতর ভাবে বলে উঠল, এবারটির মতন মাপ করুন জমাদার সাহেব,আর কখনো এমন কাজ ও করবে না।

বাবুয়ার হাত থেকে টান মেরে শুধু ঝাণ্ডাটাই কেড়ে নিলে সেপাইজী। এই মওকায় ধুমকি সিং তার ঠ্যাং একটা প্রায় খোঁড়া করেই ফেললে ডাণ্ডার বাড়ি মেরে। মুখ থুবড়ে ছিটকে পড়ল বাবুয়া। মাটিতে পড়ে গড়াচ্ছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে ধরে ফেললে ফেলারাম। গর্জে একবার তাকাল ধুমকি ফেলারামের দিকে। চোখ পাকিয়ে বলে উঠল, ভাগো, ভাগো হিঁয়াসে উল্লুককা বাচ্ছা।

অফিসঘরের জানলার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছেন কলিয়ারির ইনচার্জবাবু.

টিট ফর ট্যাট, সাবাস বেটা ধুমকি সিং।

তন্‌খা হয়তো কিছু বেড়ে গেল সিংজীর। আস্ত একটা বাঘ মেরে ফলেছে, সামান্য একটা লোহার ডাণ্ডা দিয়ে। সাবাস বেটা ধুমকি সিং— সাবাস!

এক মুহূর্ত আর দাঁড়াল না ফেলারাম। বাবুয়াকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিলে দু হাত দিয়ে। নামিয়ে দিলে গিয়ে একেবারে গোলাপীর খাটিয়ায়। ফাবড় খাওয়া খরগোশের বাচ্চার মত দম টেনে টেনে হাঁপাচ্ছে বাবুয়া। কাতরাচ্ছে মুখখানা বিকৃত করে।

চমকে উঠল গোলাপী, বাবুয়ার দশা দেখে। পিঠের উপর কালশিটে এই দাগগুলো কিসের! বাঁ পায়ে একটা খোঁচার আঘাত, রক্ত ঝরছে হাঁটুর নীচে।

গলা ফাটিয়ে চিৎকার জুড়লে গোলাপী, এমন করে কে মারলেক আমার ছেলেকে? কোন্ আঁটকুড়োর পাকা ধানে আমরা মই দিতে গেইছিলোম গো!

হতাশভাবে বলে উঠল ফেলারাম, শোধ তুলে নিয়েছে ধুমকি সিং, লোহার একটা ডাণ্ডা দিয়ে বাচ্চাটাকে ঘায়েল করে দিয়েছে।

রাগের চোটে ফেটে পড়ল গোলাপী। চীৎকার ছেড়ে বলে উঠল, ওই ডাণ্ডা গাঁদব আমি ধুমকি সিংয়ের বুকে, কলজেটা ওর ছিঁড়ে আনব দাঁত দিয়ে। ও আঁটকুড়ো কি মনে করেছে কি?

তাকাল আবার বাবুয়ার দিকে। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল গোলাপী।

তড়পে উঠল এবার ফুলটুশি, তখনি আমি বলেছিলোম, দিই আঁটকুড়োর গলাটাকে বঁটি দিয়ে দু ফাঁক করে। ওর মাথাটো আমি ফাটাব একদিন, থান ইঁট দিয়ে ভেঙে দিব ওর চুবাল দুটো। সেইদিন আমার মনের ঝাল মিটবেক।

করুণ ভাবে চেয়ে আছে বাবুয়া, গোলাপীর মুখের দিকে। নেতিয়ে পড়েছে একেবারে, জল গড়াচ্ছে দু চোখ বেয়ে। দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলে গোলাপীর গলাটা। হুঁ করে একবার কেঁদে উঠল গোলাপী, বাবুয়া, আমার বাবুয়ারে।

ঘড়ইমশায় গম্ভীর ভাবে বলে উঠলেন, থানায় একটা ডায়েরি করে দিয়ে আসবে নাকি ফেলারাম?

সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে উঠল ফেলারাম, না—না—না, সে কি হয়,

আমি যে একজন কোম্পানীর প্রজা। ও কাজ কি আমি জেনেশুনে করতে পারি মুন্সীবাবু। মাথার উপর এখনো চন্দো-সূয্যি উঠছে যে।

চোখ বুজে হঠাৎ ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন ঘড়ইমশায়। মাথার উপর চন্দো-সূয্যি সত্যি সত্যি উঠছে নাকি? তা হয়তো উঠছে এখনো। কিন্তু আর বেশীদিন উঠবে কি? মহাপ্রলয়ের জলোচ্ছ্বাস গর্জাচ্ছে পায়ের নীচে। ফুঁসছে দূরে প্রলয়পয়োধি। কোন্ দিন এবার তারই নীচে তলিয়ে যাবে তামাম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। হাজারটা পাম্প চালু করেও সেদিন কিন্তু আর থৈ পাবে না কোম্পানী। চারিদিকে শুধু জল আর জল, আকাশ মাটি একাকার। জলের নীচে থিতিয়ে যাবে লাখো লাখো মালকাটা আর হাজার হাজার মনিব মুন্সী ম্যানেজার। পাশাপাশি একসঙ্গে। অথৈ জলের মায়' কাটিয়ে মড়াগুলো আর উঠবেই না সেদিন।

॥ ৯ ॥

খাদ ডুবেছে জ্যান্ত মানুষ পেটে পুরে। লোকগুলোর খবর নেই। আশপাশাড়ি ঝোপে-ঝাড়ে ওত পেতে আছে শেয়াল-শকুন, মহাভোজের প্রতীক্ষায়। পলাশ বাগান পার হয়ে গাড়ুই নদীর ধারে আজকে হঠাৎ মাদল বাজে কেন! শ্মশানঘাটের সামনাসামনি ওপারের ওই ডুলে পাড়ায় ঘেঁটু ফুলের বাহার দিয়ে কারা যেন বাসর সাজাচ্ছে। যখাই বাগতির বিয়ে যে। কনে খুঁজতে বাইরে কোথাও যেতে হয় নি যখাইকে। তৈরি ছিল মঞ্জরী, পাড়ার সেরা দামী চিজ। দয়া করে যখাইকে সে বিয়ে করেছে, নইলে যখাইয়ের বাপের সাধ্য কি যে মঞ্জরীকে বিয়ে করে। গাঁটের কড়ি খরচা করে ভোজ দিয়েছে যখাই, গয়না কাপড় তাও দিয়েছে। বাজনা-বাদ্যির খরচাটাও ধরে দিতে হবে যখাইকে, টোপর মাথায় গাঁ ঘোরবার পর। মঞ্জরী শুধু কনে সেজেই খালাস।

রেল লাইনের পাশে পাশে চলল সিধে দিং দাহাতাং। ডাগুালে স্বরে গান ধরেছে মেয়েরা। মাদল পিটছে যখাই বাগতির কাকা। জোড়াপায়ে ঘুঙুর বেঁধে লাফ পাড়ছে মঞ্জরীর এক ভাসুরপো, কালীচরণের ভাতিজা। কাকীর বিয়েতে ভোজ খেয়েছে প্রচুর। ভোজ এরা সবাই খেয়েছে, মদ খেয়েছে যার যতটা খুশি।

বাউরীপাড়ার মোড়ে এসে কাঠি পড়ল ঢোলে। কুদে উঠল ঘোড়া নাচের দল। ঢোল বাজছে তাং কুড় কুড়, তালে তালে নাচছে দুটো প্রমাণ সাইজের কাগজের তৈরি ঘোড়া। ঘোড়া অবশ্য নাচছে না, নাচছে ওদের সোয়ার দুটো, টাট্টু ঘোড়ার কাঠাম বেঁধে কোমরে। গান ধরেছে নাচুনীরা। ঢোল মাদল আর নাচে-গানে বাউরীপাড়া গুলজার। থামল গিয়ে একেবারে মা মনসার থানে।

মায়ের থানে যখাই নাকি জোড়া পাঁঠা মানত করেছে। জোড়ে এসে আজকে শুধু প্রণাম সেরে গেল। এই সঙ্গে গাঁ-টা একবার ঘুরে যেতে হয়। ঢাক ঢোল নিয়ে পড়ল গিয়ে সদর কুলিতে।

খসলা বাউরীর কাঁধে চড়ে ঘোড়া-নাচ দেখছে বাউরী মুখুজ্যের ছেলেটা। মুখ টিপে টিপে নিজের মনেই হাসছে খসলা। কনের বেশে মঞ্জরীকে দেখতে কিন্তু লাগছে খুব চমৎকার। ফেরতা দিয়ে শাড়ি পড়ার বাহার কি। সিঁথেয় সিন্দুর, কপালে টিপ, হাতে একটা কাজললতা। যখাই বাগতির বরাত জোর, বৌয়ের মত বৌ একখানা বাগিয়ে ফেলেছে। টেঁকলে হয় শেষ পর্যন্ত।

ওই এক প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে অনেকের মনে। শেষ পর্যন্ত টেঁকলে হয়। গুঞ্জন চলছে আশেপাশে। কে একজন প্রশ্ন করলে চাপা গলায়, মঞ্জরীর ওই সাঙালেটা কে গো খুড়ো, কে বটে ও ছোঁড়াটা ?

জবাব দিলে বাউরীপাড়ার ছিমন্ত, নদী পারের দীনে বাগতির বেটা। এক নম্বর হাড়বজ্জাত। কালী মালকাটার ঘর ভাঙবার কি কম চেষ্টা করেছিল শুখোবেটা।

ঘর কিন্তু আপনি ভেঙেছে। সেই ভাঙা ঘর রাতারাতি আবার জুড়ে নিয়েছে মঞ্জরী। ঢাকে ঢোলে সেই কথাটাই জানান দিয়ে গেল।

ভিড় জমে গেছে বাউরী মুখুজ্যের সদর দোরের সামনেটায়। খসলা বাউরী ওদের সঙ্গ ছাড়ে নি। ওর মনের মধ্যে কেমন যেন একটা নতুনতর আঁকুপাকু ভাব। মঞ্জরী আর যখাইকে অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছে।

কাজলীর আঁচল ধরে ঘর থেকে তাকে টানতে টানতে নিয়ে এল তুলতুল। বললে, দেখবি আয়, কি সুন্দর ঘোড়া নাচছে দেখবি আয়।

কাজলী গিয়ে সদর দোরের সামনে দাঁড়াল। মঞ্জরীর সাঙার কথা আগেই শুনেছে, চাক্ষুষ আজ দেখে নিলে।

কাজলীকে দেখেই হাসতে হাসতে এগিয়ে গেল মঞ্জরী। কপাল থেকে ঘোমটাটা একটু সরিয়ে দিয়ে বললে, কাজলদিদি, ভাল আছিস।

ঠোঁটের কোণে ঈষৎ একটু হাসি টেনে বললে কাজলী, ভালই আছি, খুব ভাল আছি।

কাজলীর পায়ের উপর টিপ করে একটা প্রণাম করলে মঞ্জরী। পা-টা একটু সরিয়ে নিলে কাজলী, বললে থাক থাক, ওই হয়েছে।

গাঁট ছড়ার কাপড়খানায় হ্যাঁচকা একটা টান দিলে মঞ্জরী। দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠল যখাইকে, দিদিকে একটা পেন্নাম কর না রে খালভরা, হাঁ করে দেখছিস কি?

যখাই বাগতির টোপরটা সুদ্ধ ঠেকল গিয়ে কাজলদিদির ছিচরণে। চোখ দুটো হঠাৎ বুজে গেল নাকি কাজলীর।

বাদ্যিভাণ্ড এগিয়ে চলল সদর কুলি ধরে। শেখ সাহেবদের কবরখানা ডাইনে রেখে পড়ল গিয়ে নামুপাড়ার দিকে।

সদর দোরে ঠেসান দিয়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাজলী। খসলা বুঝি একটু রসিয়ে উঠেছে, আমতা আমতা করে বলে উঠল, ওদের ডেকে এনে একটু গুড়জল খাওয়ালে হত না কাজলদিদি?

কাজলী একটু টেরচা স্বরে বললে, খাওয়াগা তুই, বাজার থেকে সন্দেশ কিনে, দায় পড়েছে আমার।

হন্‌হন্ করে বাড়ির মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়ল কাজলী। মনটা যেন উদাস হয়ে গেল খসলার। দূর থেকে ভেসে আসছে ডাঙালে গানের স্বর। মাদল বাজছে নামুপাড়ায়—দিং দাহাতাং—ধাতিং ধিং। নামুপাড়ায় বাজছে কি না কে জানে, মাদল বাজছে খসলা বাউরীর মনের মধ্যে—দিং দাহাতাং-ধাতিং ধিং। শোলার টোপর মাথায় দিয়ে যখাই এক খেল খেলে গেল বটে। ওই যে আবার—দিং দাহাতাং, ধাতিং ধিং।

ও কি, বেতালে হঠাৎ চাঁটি দেয় কে? দূর বেটা তালকানা কোথাকার, তাড়ি টেঁসে মাদল পিটছিস নাকি! ঢুলী বেটারা কি করছে, ঘুমিয়ে পড়ল নাকি সব? লাগা না একবার তাং কুড় কুড়। তাং টিডিগ টিসো—তাং টিডিগ টিসো—।

ঢোল কিন্তু বাজছে না, বোল বাজছে টিডিগ টিসো। খসলা বাউরীর মুখের আওয়াজ ওটা।

টিডিগ টিসোর ধুয়ো ধরে, নিজের মনেই হো-হো করে একবার হেসে উঠল খসলা।

সে-রাত্রে আর ঘুম এল না খসলার। মনের মধ্যে তোলপাড় করছে ঘুরে ফিরে ওই টিডিগ টিসো। কানের কাছে বাজছে যেন জোড়ামাদল, দিং দাহাতাং ধাতিং ধিং। বাজছে তো বাজুক না, ক্ষতি কি। কি হবে আর আকাশ-পাতাল ভেবে। ব্যবস্থা একটা করে ফেলাই ভাল। একটা কথা কদিন থেকেই ভাবছে খসলা। মনে মনে শুধু এগোচ্ছে আর পিছোচ্ছে, কেমন যেন বুক ঠুকে বেশ সাহস পাচ্ছে না। সাহস একটু করা ভাল, এস্পার নয় উস্পার। এইভাবে আর একা একা চলবে না খসলার। চলবারই বা দরকারটা কি, রয়েছে তো হাতের কাছেই, একটুখানি সাহস করে বুকের কাছে টেনে নিলেই হয়।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল খসলা। পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। নিষুতি রাত নিচাল হয়ে গেছে, চার-চতুর্দিক অন্ধকারে ঢাকা। আলো জ্বলছে পাশের ঘরে, কাজলী এখনো ঘুমোয় নি বুঝি।

দোরগোড়ায় গিয়ে থমকে দাঁড়াল খসলা। গুন গুন করে কিসের যেন আওয়াজ উঠছে। পুঁথিপত্তর পড়ছে হয়তো কিছু কাজলী। পড়ছে হয়তো রামরাবণের গল্প, কিংবা হয়তো প্রভাস খণ্ড খুলে বসেছে। মুখুজ্যে ওকে হাত ধরে ধরে চিনিয়ে গেছে আখরগুলো, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে পারে কাজলী। রাত জেগে ওর পুঁথি পড়া একটা বাতিক। এটা কিন্তু বেশ ভাল বোঝে না খসলা। বাউরীর মেয়ে আবার পুঁথি পড়ে পণ্ডিত হয় নাকি?

কিসের যেন একটা আওয়াজ শুনে চমকে উঠল খসলা। সিটির আওয়াজ, রাত বারোটার ভোঁ পড়ছে কদমডাঙার খাদে। বাউরীপাড়া নিঝুম। ঘুমিয়ে আছে পশুপক্ষী গাছপালাটা পর্যন্ত।

বারদিক থেকে দরজায় একটা টোকা দিলে খসলা। সাড়া শব্দ কিছু পাওয়া গেল না। একটুখানি ঠেলা দিতেই খুলে গেল দরজাটা। হুড়কো এখনও বন্ধ করে নি কাজলী।

চৌকির উপর একধারে বসেছিল কাজলী, কোলের উপর কৃত্তিবাসী রামায়ণখানা খুলে। পাশে একটা লণ্ঠন জ্বলছে, কেরোসিন কাঠের বাক্সের ওপর। পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল খসলা। চাপা গলায় একটা ডাক দিলে, কাজলদিদি।

চমকে উঠল কাজলী। খসলা গিয়ে ধীরে ধীরে বসে পড়ল চৌকির এক পাশে। বললে, এখন যে ঘুমুস নি।

কাজলী একটু সোজা হয়ে বসল। গায়ে পিঠে কাপড় টেনে বললে, কই

আর ঘুমুলোম, ঘুম যে সহজে আসতে চায় না পোড়া চোখে।

সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল খসলা, আমারও, আমারও ঠিক সেই দশা কাজল-দিদি, ঘুম কিছুতেই আসতে চায় না। একটা বিড়ি খাবি কাজলদিদি?

মাথা নেড়ে বললে কাজলী, না ভাইটি, বিড়ি খাওয়া তো আমি ছেড়ে দিয়েছি। তুই একটা খাবি তো খা।

আমতা আমতা করে বললে খসলা, তোকে একটা কথা বলছিলোম কাজলদিদি, বলব?

কাজলী বললে, কি বলছিস ভাইটি, বল কেনে।

মনে মনে যেন ঘেমে উঠল খসলা। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, তোর ঘরে দেশলাই আছে কাজলদিদি!

পুঁথিখানা চিহ্ন দিয়ে বন্ধ করলে কাজলী, বললে, আছে বইকি, দিব একটা বার করে?

খসলা বললে, থাকগে এখন, কথাটা এগুতে শেষ করি। বলি মঞ্জরীকে দেখলি নাকি, শালী আবার সাঙা করলেক যে।

মুচকি একটু হাসলে কাজলী, বললে, ভালই করলেক, উয়োর খুশি হল উ করলেক।

বেশ বলেছে কাজলী। খসলা যেন একটু ঠেকা পেয়ে গেল, উৎসাহিত হয়ে বলে উঠল, ঠিক বলেছিস কাজলদিদি, ওর খুশি হল উ করলেক। না করলেই বা ও বেচারির চলে কেমন করে। খেটে খাওয়াবার মানুষ তো একটা চাই।

কাজলী বললে, তা ঠিক, খেটে খাওয়াবার মানুষ একটা চাই বইকি। যা এবার শো গা যা।

দায় পড়েছে খসলা বাউরীর একা শুতে যেতে। কাজলীর কথা কানেই তুললে না। তাড়াতাড়ি আবার বলে উঠল, এর মধ্যে একটা কথা আছে কাজলদিদি। কথাটা কি জানিস, এই ধর না কেনে তোর কথাই বলছি।

একটুখানি সজাগ হয়ে উঠল কাজলী। বললে, আমার কথা, আমার আবার কি কথা!

কাজলীর দিকে একটু ঘেঁসে বসল খসলা। মোলায়েম স্বরে বললে, তুই সুদ্ধ একটা সাঙা করে ফ্যাল কেনে, তোরও তো একটা মানুষজন চাই

হেসে ফেললে এবার কাজলী। হাসতে হাসতে বলে উঠল, কথা একটা বললি বেটে, আমি করব সাঙা। আমার কি আর সাঙা হয় রে পাগল?

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে উঠল খসলা, হয় না কেনে শুনি। সাঙা তোকে শেষ পর্যন্ত করতেই হবেক কাজলদিদি। এইবেলা ওটা সেরে ফেলাই ভাল।

অবাক হয়ে গেল কাজলী, খসলা বাউরীর বোলচাল শুনে।

খসলা আবার বলে উঠল, ঠোঁটে একটু হাসির আমেজ টেনে, আচ্ছা কাজলদিদি, মন খুলে একটা কথা বল দেখি, আমি হলে চলবেক তোর?

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল কাজলী। বললে, সেইজন্যেই এই রাতদুপুরে আমার ঘরে এসে ধন্না দিয়েছিস খালভরা। মরবার আর ঠাঁই পেলি না।

হঠাৎ যেন একটু মিইয়ে গেল খসলা। একটুখানি কাঁচুমাচু করে বললে, দুটো সুখ-দুস্কের কথা কইতে এলোম, তাতে এমন কিছু দোষ আছে নাকি।

কাজলী বললে, বুঝেছি তোর সুখ-দুস্কের বেবাক কথা আমি বুঝে নিয়েছি, উঠ এইবার ইখান থেকে।

মরীয়া হয়ে বলে উঠল খসলা, তোর পায়ে পড়ি কাজলদিদি, আমাকে তুই বৈমুখ করিস না। আমি তোকে মাথায় করে রাখব।

চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কাজলী। চোখের কোণে ছুঁ চলো একটা তীর হেনে বললে, মাথায় করে রাখবি! সাধ্যি আছে এই আগুনের খাপরা মাথায় তুলে ধরতে? জানিস আমি বামুনের বৌ, জাতসাপের নাগিনী, ডংশে দিলে জ্বলে পুড়ে মরবি যে রে খালভরা।

কথাটা বেশ মনঃপুত হল না খসলার। যত সব বাজে বুকনি। কটমট করে তাকাল একবার কাজলীর দিকে, বললে, উ সব আমি শুনতে চাই না কাজলী, আমি তোকে সাঙা করতে চাই। রাজী আছিস কি না বল, তার পর আমি দেখছি।

সুরটা যে হঠাৎ চড়ে গেল খসলার। চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখায় যে কাজলীকে।

চৌকির নীচে থেকে এক জোড়া চটিজুতো টেনে বের করলে কাজলী। বললে—দেখেছিস, মুখুজ্যের এই চটি জোড়া দেখেছিস? বেরো হারামজাদা ইখান থেকে।

একপাটি চটিজুতো নিয়ে খসলার দিকে উঁচিয়ে ধরলে কাজলী। চোখ পাকিয়ে উঠে দাঁড়াল খসলা। কাজলীর হাত থেকে চটিখানা ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে টান মেরে ছুঁড়ে দিলে এক পাশে।

খসলার মুখখানা দেখতে দেখতে বীভৎস হয়ে উঠল। এ যেন এক অন্য মানুষ। হেঁড়োলের মত লব্ধ দৃষ্টি, কঠোর ভাবে চেয়ে আছে কাজলীর দিকে।

ভয় পেলে একটু কাজলী, নেশা ভাঙ করেছে হয়তো ছোঁড়াটা। একটুখানি পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। খপ্ করে ওর ডান হাতখানা চেপে ধরলে খসলা গিয়ে।

চিৎকার করে লোক ডাকবে নাকি কাজলী? কেলেঙ্কারি হবে যে। না না, খসলার মত একটা লুচ্চাকে ঘর থেকে তাড়াবার জন্যে এতখানি মূল্য দিতে রাজী নয় কাজলী। দাঁত দিয়ে হঠাৎ কামড়ে ধরলে খসলার বজ্রমুষ্টির উপর। সঙ্গে সঙ্গে হাতখানা ছেড়ে ফেললে খসলা। ওর বুকের উপর আচমকা একটা লাথি ঝেড়ে দিলে কাজলী। মেঝের উপর ছিটকে পড়ল খসলা।

কাজলীর চোখে যেন আগুনের ফুলকি। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠল কাজলী, তোকে আজ আমি খুন করে ফেলব, ভাল চাস তো বেরো আমার ঘর থেকে। কাঁড় খাওয়া বুনো ভালুকের মত দাঁত খিঁচিয়ে গর্জে উঠল খসলা, বামুনের বৌ, না পাঁড় মাতাল একটা চামারের রাখনী। তোর বামুনের বৌয়ের নিকুচি করছি থাম।

টাল সামলে উঠে দাঁড়াল খসলা। ভয়ে কাজলীর মুখ শুকিয়ে গেল। কি করতে কি করে বসবে মুখপোড়া, কে জানে!

দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল খসলা, এক বোতল মদ দিলে তোর মতন একটা মেয়েমানুষ কিনতে পাওয়া যায়। তার আবার এতখানি দেমাক? তোকে আজ আমি ছাড়ছি না কাজলী।

কঠোরভাবে চেয়ে আছে খসলা। কাজলীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে নাকি? জোয়ান মরদ খসলা বাউরীর ক্ষুধার্ত এই নগ্ন রূপ কাজলীর চোখে একেবারে নতুন। ভয় পেয়ে গেল কাজলী। কাতর ভাবে বলে উঠল, খসলা, এ তুই করছিস কি খসলা? এই জন্যে কি বাতাসীর সঙ্গে তোর বিয়ে দিয়েছিলুম? আমি যে তোর গুরুজন।

গর্জে উঠল খসলা বাউরী, চুপ রও হারামজাদী।

অসুরের মত থাবা উঁচিয়ে এগিয়ে গেল কাজলীর দিকে।

দপ করে আর একটিবার জ্বলে উঠল কাজলী। তাড়াতাড়ি চৌকির নীচে থেকে হাত বাড়িয়ে টেনে নিলে বাউরী মুখুজ্যের তবলাটা। ধাঁ করে ছুঁড়ে মারলে খসলা বাউরীকে লক্ষ্য করে। ঠাঁই করে লাগল গিয়ে খসলার মাথায়। চোখ দুটো হঠাৎ বুজে গেল খসলার। সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ল মাথাটাকে দু হাত দিয়ে চেপে ধরে। চোট লেগেছে রীতিমত, ফেটেই বুঝি

গেল খানিকটা।

চোখ তেড়ে চাইলে খসলা আর একটিবার কাজলীর দিকে। বিকৃত স্বরে বলে উঠল, আচ্ছা, আমারও নাম খসলা বাউরী, আমি যদি বাপের বেটা হই —এর শোধ আমি তুলব। সহজে তোকে আমি ছাড়ব না কাজলী, বুঝবি এর পর মজাটা।

মাতালের মত টলতে টলতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। একেবারেই বেরিয়ে গেল। নাচদুয়ারের আগল খুলে পড়ল গিয়ে সদর কুলিতে। কাজলী গিয়ে এঁটে দিয়ে এল আগলটা। ভালই হল, নিজে থেকেই বিদেয় হয়ে গেল আপদ। তা না হলে জুতো মেরেই তাড়াতে হত হারামজাদাকে।

কাজলী এসে ঘরে ঢুকল। দরজার খিলটা বেশ শক্ত করে এঁটে দিলে। থম থম করছে নিষুতি রাত। জনমনিষ্যির সাড়া-শব্দ নাই। তুলতুলটা শুয়ে আছে বিছানার একপাশে। ভাগ্যিস ওর ঘুম ভেঙে যায় নি। খুব রক্ষে, নইলে ওই অবোধ শিশুর চোখের সামনে কি অবস্থায় না পড়তে হত আজ কাজলীকে। ভগবান রক্ষে করেছেন।

তবলাখানা কাত হয়ে পড়ে আছে মেঝের উপর। পায়ে ঠেকল হঠাৎ, থমকে একটু দাঁড়াল কাজলী। ধীরে ধীরে মেঝের উপর থেকে উঠিয়ে নিলে তবলাটা। মুখুজ্যের স্মৃতি, বহুদিনের শখের জিনিস। বুকের ভিতরটায় মোচড় দিয়ে উঠল যেন কাজলীর। কি সুন্দর তবলাই না বাজাত। কি মিষ্টি হাত, বাজনার কি চটক। এ তবলা আর বাজবে না মুখুজ্যের হাতে। যত্ন করে তুলে রাখবে কাজলী, তুলতুল যদি বড় হয়ে বাজায়। বাপের গুণ সে পেতেও পারে তো। কিন্তু সে ঝঙ্কার উঠবে কি আর এ তবলায়? সে বোল কি আর বাজাতে পারবে কেউ।

নিমকাঠের একটা তবলা। এক ফালি চামড়া আর কালো রঙের একটু-খানি গাব দিয়ে ছাওয়া। কাজলীর কাছে এ যেন আজ অমূল্য এক সম্পদ। একদৃষ্টে নিবিড় ভাবে চেয়ে আছে তবলাটার দিকে। যন্ত্রখানা পড়ে আছে, যন্ত্রী আজ নেই। নেই আজ সে মিঠে হাতের মনমাতানো লহর।

কিসের যেন একটা দাগ পড়েছে তবলার গায়ে। দাগ নয়, একটা ফাটল। চমকে উঠল কাজলী, ফেটে গেল নাকি তবলাটা! আলোর কাছে নিয়ে গিয়ে উল্টোপাল্টে দেখে নিলে। ফেটে গেছে একটা দিক, উপর থেকে নীচে পর্যন্ত। ফেটে গেছে সান বাঁধানো মেঝের উপর পড়ে। রাগের মাথায় ওভাবে এটা ছুঁড়ে মারা ঠিক হয় নি কাজলীর। রদ্দি হয়ে গেল যে, এ যন্ত্র

কি ঠিকমত আর বাজবে ?

চৌকির উপর তবলাটা রেখে চামড়ার গায়ে আঙুল দিয়ে একটা টোকা মারলে কাজলী, আস্তে একটা চাঁদি দিলে। সে আওয়াজ আর উঠল না। নেমে গেছে এর স্বর, একেবারে বিগড়ে গেছে যন্ত্রটা।

চৌকির উপর ধপ করে বসে পড়ল কাজলী, তবলাটার উপর মাথা গুঁজে। দু হাত দিয়ে চেপে ধরলে বুকের কাছে। চিড় খেয়ে গেল তবলাটা, মাটির উপর পড়ে। মুখুজ্যের বহুদিনের সঙ্গী, বহু যত্নের সামগ্রী। কাজলীর পাঁজরের একখানা হাড় চৌচির হয়ে ফেটে গেল যেন। তবলার উপর কালো রঙের বৃত্তটা লণ্ঠনের আলোয় চিক চিক করছে কেন। গাবটা বুঝি ভিজে গেল চোখের জলে। কাজলীর কণ্ঠে ফুটে উঠল অপরাধীর স্বর। ভাঙা গলায় নিজের মনেই বলে উঠল কাজলী, এ আমি কি করলুম, হঠাৎ আমি এ কি করে বসলুম। তোমার তবলাটা যে আমি নিজের হাতে ভেঙে ফেললুম গো। রাগ করলে, রাগ করলে নাকি তুলতুলের বাপ !

বুকের উপর পড়ছে যেন ঢেঁকির পাড়, ছুঁচ ফুটছে মনের মধ্যে। ফুলে ফুলে কঁদছে নাকি কাজলী, সামান্য একটা নিমকাঠের তবলার জন্য !

কাজলীর চোখে ঘুম নেই সারাটা রাত ধরে। চৌকির ওপর পড়ে পড়ে চোখ বুজে শুধু ভাবছে। নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে আছে তুলতুল, কাজলীর বুকের উপর একখানি হাত রেখে। কোমল কচি একখানি হাত। বর্মের মত ঢেকে আছে যেন কাজলীকে। এ শিশু যে আস্তাকুঁড়ে শালগ্রাম। কাজলীকে উদ্ধার করতে এসেছে। এর সেবাযত্নের সকল ভার যে কাজলীর উপর। তাই তো কাজলী এত দুঃখেও বাঁচতে চায়। তুলতুলকে মানুষ করতে হবে যে। মনের মধ্যে বারে বারে খোঁচা দিচ্ছে ওই খসলার কথাটা। খসলাদের হাত থেকে বাঁচতে হবে তুলতুলের মাকে। দেহে মনে আগুন জ্বেলে রেখেছে তাই কাজলী। বুকের মধ্যে জ্বেলে রেখেছে অগ্নিগড়। সেই আগুনের ফিনকি মেখে বাঁচতে হবে কাজলীকে।

কিন্তু একটা যে বড় ভুল হয়ে গেল। টাকা পাঁচ শ গচ্ছিত ছিল খসলার কাছে। গামছায় বাঁধা পোঁটলাটা কোমরে বেঁধে সরে পড়ল যে। টাকাগুলো তো ফেরত দিয়ে গেল না। কোম্পানীর কাছ থেকে পাওয়া গেছে দফায় দফায়। কাজলী সে টাকা ছুঁতে পারে নি, জ্যান্ত মানুষের ধড়ের দাম যে। শুধু বার দুই-তিন কোম্পানীর খাতায় নাম সই করে দিয়েছিল কাজলী।

কথাটা মোটে খেয়াল ছিল না, খসলার কাছ থেকে কেড়ে রাখা উচিত ছিল টাকাটা। ও টাকা যে তুলতুলের। ওর বাপ যে ওকে দিয়ে গেছে খাদের নীচে জীবন দিয়ে। খসলার হাতে টাকাগুলো ছেড়ে দিয়ে ভুল করেছে কাজলী। তুলতুলকে সে মানুষ করবে কেমন করে? ও টাকা তো খসলার মত লুচ্চা একটা বাটপাড়ের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না। ফিরিয়ে আনতে হবে যেমন করে হোক, ও টাকা যে তুলতুলের অনেক কাজে লাগবে। যেতে হবে কাজলীকে খসলাদের গাঁয়ে। শয়তানটার বুকে লাথি মেরে ছিনিয়ে আনতে হবে টাকার পোঁটলা। আনতেই হবে ছিনিয়ে, সে দায়িত্ব কাজলীর।

কাজলীর দায়িত্ব যে বেড়ে গেছে অনেকখানি। বহু কিছু দায়িত্বের ভার বহন করতে হবে যে আজ কাজলীকে একা। তুলতুলকে মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলতে হবে। তা না হলে দশজনের সামনে বাপের নামে সে পরিচয় দেবে কেমন করে। মুখুজ্যের ছেলে, হতে হবে তাকে মুখুজ্যের মত; বাপ-পিতামোর বংশের মান যে আকে রাখতেই হবে। পাশের গাঁয়ের ইস্কুলে তুলতুলকে ভর্তি করে দেবে কাজলী। শ্লেট পেন্সিল বই পুঁথি কিনে দেবে বড়বাজারের দোকান থেকে। ইস্কুলের খাতায় কালির আখরে নাম উঠবে—শ্রীতুলতুল। না-না, শুধু তুলতুল নয়, লেখা হবে ওর পুরো নাম—শ্রীতুলতুল মুখোপাধ্যায়। পিতা ৺অমুকচরণ মুখোপাধ্যায়। ওই নামেই যে পরিচয় তার। আর একটু বড় হলে পুরুত ডেকে ওর পৈতে দিতে হবে, তুলতুল যে বামুনের ছেলে। সে ব্যবস্থা করতেই হবে কাজলীকে। মাথা মুড়িয়ে দণ্ডী হাতে ব্রহ্মচারী সাজতে হবে তুলতুলকে। কাঁধে নেবে ভিক্ষার ঝুলি, অঙ্গে ধরবে গেরুয়ার বসন। ভিক্ষা চাইবে মন্ত্র পড়ে। কি যেন একটা মন্ত্র পড়তে হয়, ভিক্ষা চাইবার মন্ত্র, কাজলীকে যে শিখিয়ে দিয়েছিলে মুখুজ্যে। ভবতি ভিক্ষাং দেহি। মনে পড়েছে, মনে পড়েছে কাজলীর, এই মন্ত্রই যে বামুনের ছেলের ভিক্ষা মন্ত্র, ভবতি ভিক্ষাং দেহি। বেলকাঠের খড়ম পায়ে দণ্ডী হাতে ব্রহ্মচারী সেজে ভিক্ষার ঝুলি বাড়িয়ে দেবে তুলতুল। ভিক্ষা চাইবে ছাঁদনা-তলায় দাঁড়িয়ে, ভবতি ভিক্ষাং দেহি, ভবতি ভিক্ষাং দেহি। সেদিন শুধু একজন তাকে ভিক্ষে দিতে এগিয়ে আসবে না। থালায় করে আতপ তণ্ডুল ফল মিষ্টান্ন সাজিয়ে এগিয়ে যেতে হবে হতভাগী এই কাজলীকে।

সে দিনটি কি সত্যি সত্যি আসবে কাজলীর জীবনে? ওই ব্রাহ্মণ বটু কাজলীর যে গর্ভজ সন্তান। ব্রাহ্মণত্বের স্বীকৃতি তাকে আদায় করে নিতে

হবে যে, কর্মে ও নিষ্ঠায়, ধর্মে ও আচারে, শিক্ষা ও দীক্ষায়। কাজলীর স্বপ্ন, কাজলীর সাধনা, কাজলীর এ তপস্যা, এ কি কখনো ব্যর্থ হতে পারে? ব্যর্থ একে হতে দেবে না কাজলী, এ কখনো ব্যর্থ হতে পারে না। পিতৃহীন ওই ব্রাহ্মণ শিশু একদিন তার ব্রাহ্মণত্বের মহিমায় কাজলীর সপ্তকুল যে উদ্ধার করবে। সে দিনটি আর কত দূরে গো! তুলতুলকে মন্ত্র পড়া ব্রাহ্মণের বেশে সূর্যপ্রণাম করতে দেখে চোখ দুটি কবে সার্থক হয়ে উঠবে কাজলীর। কত দূরে—সে দিনটি আর কত দূরে!

নীরব নিথর গভীর রাতের অন্ধকারে মনের আবেগে থর থর করে কাঁপছে কাজলী। দু হাত দিয়ে বুকের মধ্যে চেপে ধরলে তুলতুলকে। মা যশোদার স্তন্যধারায় সিক্ত হয়ে উঠল যে তার বক্ষলগ্ন বসনপ্রান্ত। গোপাল কি তার শুধুই গোপাল। সে যে বৈকুণ্ঠের ঠাকুব। পরশ পাথব বুকে ধবে কাজলী যে আজ সোনা হয়ে গেল।

সকালবেলা তুলতুলকে পাশের বাড়ির ময়না বুড়ীব জিম্মা কবে দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল কাজলী। যেতে হবে খসলাদেব গাঁয়ে। বেল লাইনেব ধার দিয়ে বাঁ-হাতি রাস্তা। ডানহাতি পথ ধরে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে কতকগুলো লোক। কি যেন ওবা বলতে বলতে যাচ্ছে। কোথায় যেন কি একটা ঘটেছে। বেললাইনের ধারে গিয়ে থমকে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল কাজলী। খাদমোয়ানে কিসেব যেন একটা শোরগোল উঠছে। লোক ছুটছে চারদিক থেকে কদমডাঙা কলিয়াবির পথ ধবে। দুর-দুর করে বুক কাঁপছে কাজলীর। নতুন করে ঘটল নাকি আবার কিছু!

শেখপাড়ার হিঙ্গু বুড়ো এগিয়ে যাচ্ছে হন্তদন্ত হয়ে। রেললাইনের পথ ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটছে। পিছন থেকে সাড়া দিলে কাজলী, কি হয়েছে, কি হয়েছে নানা, খাদমোয়ানে এত গোলমাল কিসেব?

পিছন ফিরে তাকাল একবার শেখবুড়ো। দূব থেকেই জবাব দিলে, সেই খবরটাই তো আনতে যাচ্ছি, ভয়ানক এক জোর খবর; এ সময় আর পিছু ডাকিস না দিদি।

হন হন করে এগিয়ে গেল হিঙ্গু শেখ। অবাক হয়ে কি যেন ভাবছে কাজলী। দৃষ্টি পডল খাদমোয়ানের দিকে। বন্ বন্ করে চাকা ঘুরছে হেডগিয়ারে। দূর থেকে ভেসে আসছে কিসের যেন একটা হৈ-চৈ আর হাঁকডাকের শব্দ। হঠাৎ আবার কি ঘটল তিন নম্বর খাদে? আছে নাকি

নতুন খবর কিছু!

রাস্তার উপর থ মেরে দাঁড়িয়ে গেল কাজলী। থর থর করে কাঁপছে।

॥ ৮০ ॥

আছে কিছু নতুন খবর। দুর্জ্ঞেয় দুরধিগম্য রহস্যের আবরণ ভেদ করে ছিটকে পড়ে মাঝে মাঝে দু-একটা নতুন কথা, পুরাতনের ঝাঁপি থেকে। হয়ে ওঠে তাই মানবমনের বিস্ময়। বাস্তবের ভিত্তি থেকে নিজেকে সে প্রকাশ করে বিচিত্র এক নতুন খবর হয়ে। আছে কিছু সেই সংবাদ, সাম্প্রতিকের ঝাঁপি খোলা আজগুবি এক নতুন খবর। পুরোপুরি সেটা জানতে হলে গোড়ার কথা একটুখানি ঝালিয়ে নিতে হয়। খাদ ডুবেছে বেনোজলের চাপে এ আর এমন নতুন কথা কি। রহস্য এর ধরা পড়ে গেছে। পশ্চিম দিকের সুড়ঙ্গের ওই ভাঙনটা দৈত্যের মত বিরাট একটা হাঁ মেলে দিনের আলোয় সে রহস্য ফাঁস করে দিয়েছে। বাদবাকিটা অন্ধকারে ঢাকা। খাদভরতি মেঠো জলের পাথার, আর সুড়ুং ঠাসা অফুরন্ত অন্ধকার ঢেকে রেখেছে পাতালপুরীর অনেক কিছু। সরজমিনের ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়ে সে রহস্য ভেদ করা খুব সহজ নয়। আটশ ফুট খাদের নীচে বেনোজলের তাড়া খাওয়া কয়লা কাটা মানুষগুলোর সঠিক খবর কে রেখেছে? কে যে কোথায় রইল, কোন্ সুড়ুঙে পা হড়কে কে যে কোথায় পড়ল, বাঁচল না মরল, সে খবর কি পুরোপুরি জানা গেছে আজও। একটু শুধু নিশানা, একটুখানি ইঙ্গিত, রেখে গেছে ডাইক মিস্ত্রী আলতাব মিয়া, আর মালকাটা কালীচরণ বাগতি। ওদের কথাই সাবুদ করে গেছে আরও কয়েকটা ফুলো ফ্যাঁপসা বিকৃত মৃতদেহ। ঢাবায় চড়ে ঝুলতে ঝুলতে উঠে এল যারা। বাকিগুলোও উঠবে হয়তো একে একে। কিন্তু লোকগুলোকে ঠিকমত আর চেনা যাবে কি? একছার সব এক চেহারায় উঠে আসে যদি? প্রশ্নটা খুব স্বাভাবিক। হতে পারে, আর হয়তো লোকগুলোকে চেনাই যাবে না।

চেনা গেছে শুধু আলতাব মিয়া আর কালীচরণকে। ' মঞ্জরী আর হাকিম মিয়া খাদমোয়ানে হাজির ছিল বলে। তাই তো ওদের যত্ন করে কবর দিয়ে এল। আজ যদি ওদের প্রেতাত্মা হাঁকার ছাড়ে খাদের নীচের থেকে? হাঁকার যদি ছেড়েই বসে, তা হলে? তা হলে একটা খবরের মত খবর হয়ে ওঠে বই

কি। শাঁখা সিন্দুর মুছে ফেলেছে কালী মালকাটার বৌ। বিধবা হল আলতাব মিয়ার বিবি। শুদ্ধাচারে পালন করছে এদ্দাৎ। সার করেছে মলিন বস্ত্র ভুমিশয়ন। মঞ্জরীর কথা আলাদা, ও বেচারী বাট চাইবার আর সময় পেলে কই। সাত-তাড়াতাড়ি নিকের খবর হয়ে গেল যে, গাঁটছড়াটা বেঁধে ফেললে যখাই বাগতির সঙ্গে। আজ যদি হঠাৎ কালিচরণ গাড়ুই নদীর কবর ফুঁড়ে সামনে এসে দাঁড়ায়! মঞ্জরীকে গোটাকয়েক লাথি ঝেড়ে গলাটা হঠাৎ চেপে ধরে যখাই বাগতির! নাকি স্বরে যদি দাঁত মুখ খিঁচে হাঁকাই ছাড়ে, আঁমার বৌঁকে সাঁঙা কঁরেছিস কেঁনে শাঁলা, ঘাঁড় মটকেঁ তোঁর রঁক্ত চুঁষে খাঁব! তা হলেই হল, বোঝ একবার সাঙা করার ঠেলাটা। এও হয়তো একটা রীতিমত জবর খবর হলেও হতে পারে। আসলে যে কোন্ দিক থেকে কি সব কাণ্ড ঘটে গেল, এখান থেকে সাদা চোখে ধরবার কোন উপায় আছে কি? সে রহস্য জানতে হলে নামতে হবে খাদের নীচে। অন্য কোন উপায় নাই।

ভাদ্রমাসের সংক্রান্তি। ভাদুপূজোর উৎসব চলছে কদমডাঙার বাউরী-পাড়ায়। রাতারাতি পথ-ঘাট সব ডুবে গেল অতিবর্ষার দাপটে। সকাল-বেলা বহালের জল পাথার হয়ে বসে আছে। সেই পাথারে সাঁতার কাটছে বাতাসী আর খসলা। এমন সময় উঠল একটা প্রচণ্ড আওয়াজ। মাটির নীচে ভেঙে পড়ল এক সুড়ঙ্গ। হড় হড করে জল ঢুকল খনি-গহ্বর দিয়ে। স্রোতের টানে ভেসে গেল বাতাসী। চলল সিধে পাতালপুরীর পথ ধবে। শোরগোল উঠল খাদের নীচে, পানি—পানি—খাদের নীচে পানি আসে কোত্থেকে রে!

হকচকিয়ে উঠল হঠাৎ মালকাটাবা। সুড়ুং বেয়ে কল কল শব্দে এগিয়ে আসছে জলস্রোত। প্রথম হল এক পাঁজ, দেখতে দেখতে এক হাঁটু। হাঁটু ছেড়ে জল উঠল ওপর দিকে। কি সর্বনাশ, খাদের জলে মালকাটাদের কোমর অবধি ডুবে গেল যে। হতভম্ব হয়ে পড়ল মানুষগুলো। এদিকওদিক-ছুটতে আরম্ভ করলে। ছুটতে ছুটতে এগিয়ে চলল সুড়ঙ্গপথ ধরে। একটা থেকে আর একটায়। নিস্তার নাই কোনখানেই, অথৈ জলের হড়পা পিছন থেকে তাড়া করে আসছে। হাবুডুবু খেতে লাগল একগলা জলে দাঁড়িয়ে। চিৎকার কবছে গলা-ফাটিয়ে, ডুবে মলুম—খাদের জলে ডুবে মলুম, পার যদি কেউ বাঁচাও ভাই।

কে বাঁচাবে? পাতালপুরীর অন্ধকারে বিধ্বংসী এই মহাপ্লাবনের হাত থেকে কে কাকে বাঁচাতে পারে? দিশাহারা হয়ে পড়ল অসহায় খনি-মজুরের

দল। কে কোন্ দিকে ছিটকে পড়ল বানের তোড়ে। মরি বাঁচি করে ছুটতে লাগল যার যেদিকে খুশি। বেনো জলের সঙ্গে বেশ খানিকটা ধ্বস্তাধ্বস্তি করে এদিক-ওদিক শুয়ে পড়ল কতকগুলো। একেবারেই শুয়ে পড়ল, উঠতে হল না আর কাউকে। বাকিগুলো যুঝছে, চিৎকার ছাড়ছে গলা ফাটিয়ে—তুফান—তুফান—খাদের নীচে তুফান।

ডুলি বেয়ে এইমাত্র উঠে গেলেন নাহারবাবু, ইলেকট্রিকের সুপার-ভাইজার। ডাইকমিস্ত্রী আলতাব মিয়া দলবল নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, দক্ষিণমুখী পড়ো একটা গ্যালারির দিকে। মগবাতির আলোয় হঠাৎ তার চোখে পড়ল মালকাটা আলি নেওয়াজ হাবুডুবু খাচ্ছে পাশের একটা গ্যালারির মধ্যে। এগিয়ে গেল আলতাব মিয়া। পিছন দিক থেকে গর্দানসুদ্ধ রঙিন ছিটের হাফ্ সার্টটা টেনে ধরলে আলি নেওয়াজের। বললে, ওদিকে নয়, ফিরে আয়: খাদের জলে ডুবে মরবি যে।

ওটা হল ডীপ সেকশনের দিক। অথৈ জলে ভরতি। অবধারিত মৃত্যুর পথে পা বাড়িয়েছিল বিভ্রান্ত আলি নেওয়াজ। গর্দান ধরে টেনে নিয়ে এল আলতাব। দলবল সমেত ঢুকে পড়ল পড়ো একটা গ্যালারিব মধ্যে। রাইজ সেকশনের দিক এটা। ডীপ সেকশনে গ্যালারিগুলো দেখতে দেখতে ডুবে গেল চোখের সামনে। বাঁধ ভাঙা বেনো জল ধাওয়া করেছে রাইজ সেকশনের দিকে। ফুট দশেক চওড়া একটা কয়লার সুড়ুং, উচ্চতায় চার থেকে পাঁচ ফুটের মধ্যে। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল আলতাব মিয়ার সঙ্গী-সাথীরা। সবার আগে আলতাব। এই পড়ো গ্যালারির অন্ধি-সন্ধি একমাত্র আলতাব মিয়াই জানে। বছর দশেক আগে এই গ্যালারিতে ডাইকমিস্ত্রীর কাজ করেছিল আলতাব। কয়লাটা কেটে নেওয়ার পর থেকেই বন্ধ আছে এ গ্যালারি। হাল আমলের মালকাটারা কেউ কোনদিন ঢোকে নি এই সুড়ঙ্গের মধ্যে। আলতাব মিয়া ঢুকিয়ে দিলে এদের, পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলল।

পিছন দিক থেকে তাড়া করে আসছে উত্তাল জলরাশি। জলের তোড়ে ছিটকে পড়ল কয়েকটা। ডুবতে ডুবতে উঠল আবার। মাথার উপর কয়লার ছাদ। পায়ের নীচে বেনো জল। এক কোমর অবধি জল ঠেলে ঠেলে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল প্রাণপণে। হেঁকে চলল আলতাব মিয়া—এগিয়ে আয়, এগিয়ে আয় ভাই সব, সামনের দিকে এগিয়ে আয়। পিছন ফিরে আর তাকাস না। ডান হাতে ওই বাঁক ফিরে একেবারে নাকের সোজা। এগিয়ে

আয়, এগিয়ে আয় সব তাড়াতাড়ি।

মগবাতিগুলো একে একে নিবে যাচ্ছে, বেনো জলের আঝাট খেয়ে। দু-একটা জলছে এখনো। আলোয় আলোয় আর খানিকটা এগিয়ে যাওয়া দরকার। তাড়া দিয়ে আর এক দফা বলে উঠল আলতাব মিয়া, এগিয়ে আয়, আর খানিকটা এগিয়ে আয়, যদি বাঁচতে চাস তো মাঝপথে কেউ থামিস না।

পা হড়কে আছাড় খেলে কুদ্দুস মিয়া। জলের নীচে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তুলে ধরলে আলি নেওয়াজ। এগিয়ে দিলে সামনের দিকে। গড়াতে গড়াতে এগোচ্ছে সব, হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটছে। পিছন দিক থেকে বিপুল বেগে ধেয়ে আসছে বেনো জলের হড়পা। তাড়া করে আসছে যেন মালকাটাগুলোকে। এবার বুঝি ডুবিয়ে মারবে, গ্যালারিটা কানায় কানায় ভরতে যা একটুখানি দেরি।

জলের ওপর কি যেন একটা ভাসছে। ক্লান্ত হয়ে গড়িয়ে পড়েছে কে যেন। ডান হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরলে আলতাব মিয়া। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল, বেনো জলের তাড়া খেতে খেতে।

মাথার ওপর কয়লার ছাদ। খাড়া হয়ে দাঁড়াবার উপায় নেই। মাথা নীচু করে কালো কয়লার সুড়ুং ধরে এগোচ্ছে। হাজার দুই ফুট পারি দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে কোথায় গিয়ে উঠল যেন লোকগুলো। জায়গাটা কেউ চেনে না, চেনা আছে শুধু আলতাব মিয়ার। থামল গিয়ে একে একে কাঁচা কয়লার দেওয়ালের গায়ে ধাক্কা খেয়ে। তার পর আর পথ নেই, এইখানেই শেষ।

পিছন থেকে তাড়া করে আসছে মহামরণ, মৃত্যুরূপী জলোচ্ছ্বাস। কুলু কুলু শব্দে এগিয়ে আসছে। ওর হাত থেকে বাঁচবার আর উপায় নেই, পালাবার পথ অবরুদ্ধ। হতাশ হয়ে থমকে দাঁড়াল লোকগুলো। ঘুরে দাঁড়াল হড়পা বানের মুখোমুখি। সার দিয়ে সব দাঁড়িয়ে গেল কাঁচা কয়লার দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে। ভেঙে পড়ল চরমতম হতাশায়। ভাঙা গলায় বলে উঠল কুদ্দুদ মিয়া, এ কোথায় এলাম রে, বাইরে বেরোবার পথ কই, পথ?

কই আর পথ। সকল পথের শেষ পথ যে এইখানেই রুদ্ধ। এর পর আর পথ নেই।

উন্মত্ত জলোচ্ছ্বাস পিছন দিক থেকে মানুষগুলোকেই শুধু তাড়া করে আসে নি। সেই সঙ্গে গ্যালারিভরা উন্মুক্ত বায়ুপ্রবাহকেও তাড়া দিয়ে ঠেলে নিয়ে আসছে রাইজ সেকশনের দিকে। সেই বন্যাতাড়িত বায়ুপ্রবাহ গ্যালারির শেষপ্রান্তে গিয়ে এমন এক শক্তিশালী চাপের সৃষ্টি করে তুললে যে ধাবমান জলস্রোত শেষ পর্যন্ত আর এগোতে পারলে না। বায়ুচাপের বিপরীত তাড়নায় স্তব্ধ হয়ে থেমে গেল গ্যালারির প্রান্তসীমার কাছাকাছি গিয়ে। এ যেন এক অভূতপূর্ব অচিন্তনীয় ব্যাপার। অঘটন-ঘটন পটিয়সী কোন এক দৈবী শক্তি যেন তার অদৃশ্য বরাভয় মূর্তি নিয়ে লহমায় মধ্যে আবির্ভূত হল এসে ঘনীভূত বায়ুচাপের মধ্যে। উন্মত্ত জলরাশিকে তর্জন করে বলে উঠল যেন, ওইখানেই থাম, একটি পা আর এগিও না। আমি এদের আশ্রয় দিয়েছি, পড়ো গ্যালারির শেষপ্রান্তে। এরা বাঁচুক, আমি চাই এরা বাঁচুক, মরতে আমি দেব না এদের।

ধাবমান জলোচ্ছ্বাস স্তব্ধ হয়ে রয়ে গেল সেইখানেই। গ্যালারির প্রান্তসীমা থেকে ফুট চারেকের ব্যবধান মাত্র। পুঞ্জীভূত বায়ুচাপ ভেদ করে ওটুকু আর এগোতে পারলে না। বন্যাতাড়িত হতবিহ্বল খনিকর্মীর দল ওর মধ্যেই পেয়ে গেল বুঝি একটুখানি আশ্রয়। ভাইয়ের মত ভালবেসে বুক দিয়ে যেন জড়িয়ে ধরলে সদ্যসৃষ্ট ওই 'এয়ার পকেট'। কিন্তু অবরুদ্ধ মৃত্যুপুরীর ক্ষণিকের এই স্বপ্নমায়া কতটুকু কাজে লাগবে তাদের। বাঁধভাঙা বেনো জলের তোড়ে কানায় কানায় ভরে গেছে তিন নম্বর পিট। বাইরে বেরোবার এতটুকু পথ যে আর কোন দিকে খোলা নেই।

অবরুদ্ধ মানুষগুলো শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে উঠল। চোখের সামনে আঁধারবরণ কে যেন ওই এগিয়ে আসে ছায়ামূর্তি! সাক্ষাৎ ও যে মরণ!

বিকরাল ধ্বংসের দেবতা দুর্ভেদ্য এই অন্ধকারের মধ্যে মৃত্যুশূল উঁচিয়ে ধরে এদের যেন পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে সংহারের প্রতীক্ষায়। ভয়াল ভ্রূকুটি বিস্তার করে গর্জে উঠল যেন ঘনীভূত বায়ুচাপকে লক্ষ করে, কে বাঁচাবে, আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে এদের। এরা আমার পাতালপুরীর শিকার, মহাপূজার বলি, বাঁচতে আমি দেব না এদের।

কানের কাছে গুমরোচ্ছে মহাকালের অট্টহাস। কেঁপে উঠল নিঃশব্দ পাতালপুরী। ওই যেন আবার, গর্জাচ্ছে বায়ুচাপের উদ্দেশে, এরা মরবে, অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে কার সাধ্য এদের বাঁচায়। চেয়ে দেখ ওই মূর্খের দল মগবাতিটা জেলে রেখেছে এখনো। তিলে তিলে ক্ষয় করছে তোমাকে।

পুড়িয়ে ফেলছে তোমার প্রাণশক্তি, মূল্যবান ওই অক্সিজেনটুকু। কতক্ষণ আর, হয়ে এল বলে। তার পর তুমি নেই, একেবারেই নেই ; ফুরিয়ে যাবে তোমার অক্সিজেন। সেই সুযোগে আমি এদের এই প্রেতপুরীতে একে একে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে যাব, চিরদিনের মত। কে বলে এরা বাঁচবে। মূর্খের কথা, অর্বাচীনের আকাশকুসুম।

কে বলবে কার কথা সত্য। কে জানে এই মহাদ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি কোথায় ?

সংগ্রাম শুরু হল জীবনেব সঙ্গে মৃত্যুর, মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের। আলতাব মিয়া, সোনাই মালতে, কুদ্দুস মিয়া, আলি নেওয়াজ, জমিরুদ্দিন, দায়েমবক্স, কালীচরণ—একুনে মোট বারো জন। দিশাহারা হয়ে একে একে সব লুটিয়ে পড়ল মাটির ওপর। হুঁ করে উঠল কে একজন, এ কোন্ মুলুকে এসে পড়লাম রে, বাইরে বেরোবার পথ দেখাবেক কে ?

পথ দেখাবার কেউ নাই। পথ ঘাট কিছু থাকলে তো।

কেঁদে উঠল সোনাই মালতে, শোভান, আমার বেটা ! মা-হারা ওই তিন বছরের বাচ্চাটাকে কার কাছ আমি রেখে এলাম রে ?

সোনাই মালতের দেখাদেখি চাপা গলায় কান্না জুড়লে অনেকেই। আলতাব মিয়া একটা হাঁক দিলে, সোনাই, এটা কি একটা কাঁদবার সময় রে। ব্যাপারটা আগে ভাল করে বুঝতে দে। বিপদের মুখে এমন করে ভেঙে পড়লে তো চলবে না দোস্ত।

সাহস দিয়ে বলে উঠল আলি নেওয়াজ, ঘাবড়াস না ভাইসব, মরতে মরতে আমরা বেঁচে গেছি। আল্লার দয়ায় জল তো কই আর তাড়া করে আসছে না।

বায়ুচাপের বিপরীত ধাক্কায় একেবারে সামনে এসে থেমে গেছে দরিয়ার পানি। কিন্তু তার পর, বাঁচবার পক্ষে সেইটাই কি যথেষ্ট। মুখে যে যা-ই বলুক—অন্তরাত্মা ধুঁকছে এদের, মনের মধ্যে তোলপাড় করছে গভীরতম জীবনমরণ সমস্যা। এখান থেকে বাইরে যাবার এতটুকু পথ যে কোথাও খোলা নেই। তা হলে আর বাঁচে কেমন করে।

কুদ্দুস মিয়ার মগবাতিটা কোন রকমে জ্বলছে এখনো। বাতির ছটায় চোখে পড়ল হঠাৎ আলতাব মিয়ার—মাটির উপর কে যেন একটা লুটিয়ে পড়েছে। এগিয়ে গেল আলতাব, তাড়াতাড়ি বলে উঠল, এদ্দিকে একটু মগবাতিটা দেখা না ভাই কুদ্দুস। কে যেন একটা ছিটকে পড়েছে। এর

মধ্যে হঠাৎ এমন করে নেতিয়ে পড়লি কে রে ?

মগবাতিটা কাছে এনে দেখা গেল এদের দলের কেউ নয়। মাটির উপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একটা মেয়েমানুষ। সবিস্ময়ে বসে উঠল আলতাব, আরে এ কি, এ যে দেখছি একটা আওরত !

একসঙ্গে সবাই মিলে চমকে উঠল যেন, আলতাব মিয়ার কথা শুনে। আওরত, আওরত এখানে এল কেমন করে !

সে কথা কারো জানা নেই। এইটুকু শুধু মনে পড়ল আলতাব মিয়ার, রাইজ সেকশনে আসবার পথে বানের জলে হাবুডুবু খাচ্ছিল কে একটা। আলতাব তাকে টানতে টানতে নিয়ে এসে নামিয়ে দিয়েছে এইখানটায়। এটা যে একটা মেয়েমানুষ, সেকথা আদৌ ভাবতে পারে নি।

নতুন একটা আকস্মিকের ধাক্কায় লোকগুলো যেন অসাড় হয়ে গেল। আলতাব মিয়া বলে উঠল, এটাকে কেউ চিনিস নাকি রে।

চেনে না কেউ। একে একে উঁকি মেরে দেখে নিলে সবাই। পিছন দিক থেকে এগিয়ে এল কালীচরণ। চমকে উঠল মেয়েটাকে দেখেই। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, চিনি, একে আমি চিনি, বাউরীপাড়ার বাতাসী। খসলা বাউরীর বৌ এটা, বাউরী মুখুজ্যের শালী।

কি আশ্চর্য, বাউরীপাড়ার বাতাসী হঠাৎ খাদের নীচে এল কেমন করে !

যেমন করে হোক এসেছে। শখ করে হয়তো খাদ দেখতে নেমেছিল কারো সঙ্গে। কিন্তু সেসব চিন্তা পরে। মেয়েটা এখন বেঁচে আছে কি না সেইটা আগে দেখা দরকার।

নাড়ী টিপলে আলি নেওয়াজ। নাড়ীর গতি অতিশয় ক্ষীণ। প্রাণটা এখনো আছে বলেই মনে হচ্ছে ধড়ে ! মরে নি এখনো মেয়েটা। জল খেয়ে পেটটা গেছে ফুলে।

বাতাসীর পেটের উপর হাত রেখে ধীরে ধীরে চাপ দিলে আলতাব মিয়া। গলগল করে মুখ দিয়ে খানিকটা জল গড়িয়ে পড়ল। দম ভরে একটা নিঃশ্বাস টানলে বাতাসী। তারপর একটু গোঙানির শব্দ। স্বর টেনে হঠাৎ বলে উঠল ক্ষীণকণ্ঠে, ডুবে মলুম—বয়ালের জলে ডুবে মলুম !

কানের কাছে মুখ রেখে কালীচরণ একটা ডাক দিলে, বাতাসী।

আর কোন সাড়া নাই। অচৈতন্য হয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। আলতাব আর আলি নেওয়াজে ধরাধরি করে সরিয়ে দিলে একধারে বাতাসীকে। যত্ন করে শুইয়ে দিলে সুড়ঙ্গের একপাশে। বাঁচে যদি বাঁচুক মেয়েটা, আল্লার

দয়ায় বেঁচে উঠুক। এখানে যে তার আপনার বলতে কেউ নেই। আছে এই হতভাগ্য মালকাটার দল। বাঁচে যদি একসঙ্গেই বাঁচবে। মরণ যদি হঠাৎ এসে কেড়ে নিয়ে যায় কাউকে, তার উপর কারও হাত নেই।

আলতাব মিয়া ভিজে কাপড়ের খুঁট দিয়ে ধীরে ধীরে মুছে দিলে বাতাসীর মুখটা। জোর গলায় একটা আওয়াজ দিলে, বহিন!

সাড়া নেই বাতাসীর। আলতাব মিয়া একটু ভরসা দিয়ে বলে উঠল, ভয় করিস না বহিন, আমরা সব তোর কাছেই আছি। ভাবনার কোন কারণ নাই তোর।

বিচিত্র এই সংবেদনশীল হৃদয়ের নিগূঢ়তম সংবাদ। মৃত্যুর যে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, সেও কি না আজ আর একজনকে ভরসা দিচ্ছে—ভাবনার কোন কারণ নাই তোর। কিন্তু ভরসা দেবে সে ক'জনকে? অন্যান্য তার সঙ্গীরাও যে নেতিয়ে পড়েছে। ডুবন্ত এই খাদের নীচে কোণ-ঠাসা হয়ে পড়ে আছে একধারে।

একটা মাত্র মগবাতি টিম টিম করে জ্বলছিল এতক্ষণ। তেল ফুরিয়ে আসছে। ক্ষীণ হয়ে এল ধূমাঙ্কিত নির্জীব শিখা। দেখতে দেখতে দপ করে নিভে গেল একেবারেই। অন্ধকার—জমাট বাঁধা অন্ধকার, কেউ কাউকে আর দেখতেও পাচ্ছে না।

ভয়ার্ত কণ্ঠে হেঁকে উঠল সোনাই মালতে—আলতাব, এ আমরা কোথায় আছি রে! আলো কই, আলো?

কি হবে আর আলো জেলে। পুঞ্জীভূত বায়ুচাপের মধ্যে যেটুকখানি অক্সিজেন অবশিষ্ট অছে—পুড়িয়ে সেটুকু ছাই করে দিত যে আলোরূপী ওই দুশমন। এতগুলো লোককে ঠেলে দিয়ে যেত অবধারিত মৃত্যুর মুখে। সে কথা এরা জানে না, তাই অন্ধকার দেখে ভয় পাচ্ছে; আঁতকে উঠছে অন্ধপুরীর নিবিড় কালো বাস্তবরূপ দেখে। উদ্বেল কণ্ঠে বলে উঠল কুদ্দুস মিয়া, আঁধি, চারিদিকে শুধু আঁধি। কে যে কোথায় হারিয়ে গেলাম রে, বেঁচে আছি, না মরে গেছি আমরা!

আলতাব মিয়া সাড়া দিলে—ঘাবড়াস না কুদ্দুস, অন্ধকারকে এত ভয় কিসের রে, এই তো আমরা বেঁচে রয়েছি।

ঠক ঠক করে কাঁপছে কুদ্দুস। মুখগুলো যে আর দেখা যাচ্ছে না কারো। কাঁপনধরা ভাঙা গলায় বলে উঠল কুদ্দুস মিয়া, হাত বাড়িয়ে কেউ একটুখানি ধর না আমাকে দোস্ত।

গায়ের উপর গা ঠেকিয়ে, হাতের উপর হাত রেখে, এক জায়গায় সব পাশাপাশি ঘনিয়ে বসল লোকগুলো। পিছন দিকে চাপ কয়লার ঠেসান, পায়ের নীচে কয়লার চাতাল, সামনের দিকে সিঁড়ি বেয়ে একটুখানি হাত বাড়ালেই খাদভরতি জল। তার পর শুধু জলই। সমস্তটাই ঢেকে আছে কফন কালো আস্তরণে। কালো কুচকুচে আঁধার-বুড়ী অন্ধকারে ঘাপটি মেরে জিভ দিয়ে যেন গা চাটছে লোকগুলোর!

কুদ্দুস মিয়া নিজের ডান হাতখানা তুলে ধরলে হঠাৎ নাকের ডগায়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে। দেখছে আর কই, দেখা যায় কি না দেখছে। দেখতে কিছুই পাওয়া গেল না। আঁতকে উঠল যেন কুদ্দুস মিয়া—কি সাংঘাতিক, হাত-পাগুলো গেল কোথায় রে, ধড়খানা ঠিক গায়ে-গায়ে লেগে আছে তো। নাকি চোখ দুটো হঠাৎ কানা হয়ে গেল কুদ্দুস মিয়ার!

চোখ দুখানা সকলেরই কানা হয়ে গেছে। ও চোখে আর দেখা যাবে না, যতক্ষণ না পাতালপুরীর নিমজ্জিত অন্ধ কারা থেকে উদ্ধারের কোন উপায় হচ্ছে।

কে করবে উদ্ধারের উপায়। সে আশা কি আছে। আটশ ফুট খাদের নীচে বেনোজলের তুফান ঠেলে কার এত গরজ পড়েছে লোকগুলোকে টেনে হিঁচড়ে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। সে আর হয় না, এইখানেই হয়তো একসঙ্গে সব মাটি নিতে হল।

নেতিয়ে পড়ল কে যেন। ঢলে পড়ল আলি নেওয়াজের ঘাড়ের উপর। ঘুম পেয়েছে, ঘুম পেয়ে গেছে মালকাটা আতা হোসেনের। ঘুমের সময় হয়ে এল নাকি! কদিন থেকে ঘুম হয়নি কারোরই। কে বলবে কদিন থেকে। সময়ের কোন মাপজোখ তো নেই এখানে। দিন না এটা রাত—তাই বা কে বলতে পারে। চাঁদ-সূয্যির মুখ দেখবার উপায় নেই যে। রাতই হয়তো হবে এটা, তা না হলে ঘুম পাবে কেন। আতা হোসেনের চোখের পাতা বন্ধ হয়ে গেছে। ভিজে কাপড়ে লুটিয়ে পড়ল কর্দমাক্ত মেঝের উপর।

সোনাই মালতে গুম হয়ে বসেছিল একপাশে। চীৎকার করে উঠল হঠাৎ—শোভান, শোভান রে, আমার বেটা।

নিষ্ফল ক্রন্দন। কে শুনছে সোনাই মালতের কথা। বেটা-বেটি জরু-লেড়কার নাম ধরে ছাতি পিটিয়ে খানিক হা-হুতাশ করা যেতে পারে। কয়লার চাঙে মাথা ঠুকে ফিং দিয়ে খানিকটা লহু ছুটিয়ে দিতে পারলে দুঃসহ এই মানসিক উদ্বেগের কিছুটা হয়তো উপশম হলেও হতে পারে। তাতে

কিন্তু এ জীবনমরণ সমস্যার সমাধান কিছু হবার নয়। তা হলে আর হা-হুতাশ করে লাভ!

লাভ হয়তো আছে কিছু। তা না হলে সোনাই মালতের দেখাদেখি বাকিগুলোও একে একে এমন করে ভেঙে পড়বে কেন। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার আত্মীয়স্বজন যার যেখানে ছিল যারা, একসঙ্গে সব ভিড় করে এসে দাঁড়াল যে সোনাই মালতের মা-হারা ওই সন্তানের হাত ধরে। সোনাই মিয়ার শোভান পথ দেখিয়ে ওদের নিয়ে এল নাকি!

কুদ্দুস মিয়া সবচেয়ে অধীর হয়ে উঠেছে। একমাত্র কন্যা তার ফুলজানের নাম ধরে বুক চাপড়াতে শুরু করলে আবার। পাখা থাকলে পাখী হয়ে উড়ে যেত কুদ্দুস, এই মুহূর্তে উড়ে যেত ফুলজানের কাছে।

এও আর এক মস্ত ভুল। পাখী হয়ে উড়ে যাবার পথ কোথায়। চারিদিকে যে অথৈ জলের বেড়া, উপর নীচে ঠাসা। যেতে হলে যেতে হবে তাকে মীন হয়ে, অথৈ জলে সাঁতার কেটে কেটে। দরিয়া হয়ে বসে আছে তিন নম্বর পিট। এখান থেকে বেরোবার কোন উপায় নেই যে।

চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে কুদ্দুস মিয়ার। মনে হচ্ছে নিজের গলাটাকে দু হাত দিয়ে চেপে ধরে ধড়টাকে দিই মাটির নীচে শুইয়ে। এ অবস্থা অসহ্য। হঠাৎ একবার গর্জে উঠল নিজের মনেই, আলতাব, এ দুশমনি কে করলেক রে।

ঘুম ভেঙে গেল আতা হোসেনের। স্বপ্ন থেকে জেগে উঠল বুঝি। চকিতের মত বলে উঠল হঠাৎ, কে, কে এমন করে চিৎকার করছিস কানের কাছে! এ কি, ধাওড়ায় যে একটা আলো পর্যন্ত নাই। আলো কই রে, আলো?

সাড়া দিলে আলি নেওয়াজ, আনসুরের গায়ে হাত রেখে, চুপ দে, চুপ দে রে ভাই আতা হোসেন, আলো এখানে কোথা পাবি দোস্ত।

সম্বিত ফিরল আতা হোসেনের। বুকে একটা চাপড় মেরে বলে উঠল—হায় রে নসিব, এ আমরা কোন্ মুলুকে রয়ে গেলুম রে।

গ্যালারির মধ্যে কোণঠাসা হয়ে কাতরাচ্ছে লোকগুলো। অবরুদ্ধ পাষাণ-কারায় মাথা কুটছে ওদের অন্তরাত্মা। নিয়তি যে নিজের হাতে কবর দিয়ে গেল এদের কয়লাখাদের নীচে। কালো রঙের কফন দিয়ে ঢেকে দিয়ে গেল কতকগুলো জীবন্ত মুর্দাকে। বাইরে বেরোবার পথ নেই, অন্ধকারে গা

ঢাকা দিয়ে মৃত্যু এসে দাঁড়িয়ে আছে শিয়রে। এ দুশ্চিন্তা যে কতখানি—কি তার রূপ, কি তার বর্ণ, কি তার আস্বাদ, সে কথা কি ভাষা দিয়ে প্রকাশ করবার সাধ্য আছে কারো। চিন্তাশক্তি আচ্ছন্ন, দৃষ্টিশক্তি অন্ধ, ভেঙে পড়েছে শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন পৌরুষ। গুমোটবাঁধা চাপা একটা উদ্বেগ বুক ঠেলে যেন বাইরে বেরুবার পথ খুঁজছে। কতদূরে—কতদূরে আজ রয়ে গেল দুনিয়ার মাটি, আশমানের আলো, চাঁদ তারা সূয্যির রোশনি; আর সব থেকে যে অমূল্যধন—পৃথিবীর সেই মানুষের সঙ্গ। আজ যে এরা বিচ্ছিন্ন। আত্মীয়-স্বজন অন্তরঙ্গ, জরু লেড়কা মা বহিন, আজ তার সব কে যে কোথায় রইল।

কুদ্দুস মিয়া আর সোনাই মালতের ছোঁয়াচ লেগেছে। জেগে উঠল কান্নার ফোঁপানি। স্ত্রী-পুত্র পরিবারের নাম ধরে একে একে শুরু হয়ে গেল সকরুণ বিলাপ।

—কে, কে কাঁদে? এমন করে সব কাঁদছিস কেন রে! এখন থেকেই এই ভাবে সব ভেঙে পড়লে চলে কেমন করে?

প্রশ্ন করলে আলতাব মিয়া। সায় দিয়ে উঠল আলি নেওয়াজ। ঠিক কথা, এভাবে সব ভেঙে পড়লে তো চলবে না। কান খাড়া করে শুনছে ওরা সকলেই, মন কিন্তু কোন কথাই শুনতে চায় না।

সবচেয়ে বেশী ভেঙে পড়েছে সোনাই মালতে। আলতাব মিয়ার দলের লোক, পাথরকাটা মিস্ত্রী। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সাহস দিলে আলি নেওয়াজ, কাঁদিস না, কাঁদিস না সোনাই, এমন করে ছেলেমানুষের মতন কাঁদে নাকি রে।

আলতাব মিয়া অন্ধকারে হাতড়াচ্ছে। সোনাই মালতের একখানা হাত টেনে নিলে হাতের উপর। আলতাব ওদের দলের সর্দার। সান্ত্বনা দিয়ে বললে, ভয় কি রে, বেটা ছেলে এত ভয়টা কিসের। আফত যদি এসেছে—কেটে যাবে আল্লার দয়ায়, ভয় কি।

আলস ধরেছে পাম্পখালাসী গোলাম রসুলের চোখে। কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে হাতের চেটোয় মাথা রেখে পা দুখানা ছড়িয়ে গড়িয়ে পড়েছিল একটুখানি। পা দুটো তার খানিক করে ডুবেছিল জলে। খেয়াল করে নি গোলাম রসুল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল হঠাৎ। কিসে যেন কামড়াচ্ছে, জ্বালা ধরিয়ে দিলে যেন পা দুটোতে।

ব্যাপারটা শুনেই ডেকে নিলে মালকাটা কালীচরণ বাগতি। এর আগেই সে গোটা কয়েক কামড় খেয়েছে। কামড় নয় ঠিক, খোবল। বেনো জলের

মাছ ওগুলো, চুনোপুঁটি খলসে নেটা ট্যাংরা মাগুর দাঁড়কে। মেঠো কাঁকড়াও কিছু কিছু ঢুকে পড়েছে হয়তো। জলের মধ্যে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে খাদের নীচে।

গোলাম রসুলের পা দুটো বারকয়েক বেশ জোরে জোরে রগড়ে দিলে আলি নেওয়াজ। বললে, শোবার সময় পা দুটো একটু গুটিয়ে শুবি। সময় বুঝে বেনো জলের মাছসুদ্ধ দুশমনি করতে আরম্ভ করেছে, দেখছিস না!

আলতাব মিয়া সরে গেল একটুখানি কোণের দিকে। বাতাসীর নাকের কাছে কান রেখে অবস্থাটা আন্দাজ করবার চেষ্টা করছে। নিঃশ্বাস পড়ছে ঠিকই, ঘোরটা কিন্তু কাটে নি এখনো। আলি নেওয়াজকে ডাক দিলে আলতাব, নাড়ীটা একবার দেখতে হবে।

কালীচরণ এগিয়ে গেল হামাগুড়ি দিয়ে। বসল গিয়ে বাতাসীর গা ঘেঁষে। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে বাতাসীর বাঁ-হাতটা তুলে ধরলে আলি নেওয়াজ। নাড়ীর গতি খুব খারাপ বলে মনে হয় না। মেয়েটা হয়তো ধকল কিছুটা সামলে উঠল।

কালীচরণ একটু উৎসুক হয়ে বললে, কি দেখছিস, কি দেখছিস আলি নেওয়াজ, বাঁচবে তো?

জবাব দিলে আলি মিয়া, বেঁচে যেতে পারে, ধাউতটা বেশ ভালই আছে। আল্লার দয়ায় বেঁচে যেতে পারে মেয়েটা।

কুদ্দুস মিয়ার মগবাতির খোলটা হাতে নিয়ে জলে নামল আলতাব। দু হাত দিয়ে বেশ পরিষ্কার করে ধুয়ে নিলে মগটা। মাছ দু-একটা খোবলাচ্ছে পায়ে। তাড়াতাড়ি উঠে এল জল থেকে। বাতাসীর ঠোঁটটা একটু ফাঁক করে ধীরে ধীরে ঢেলে দিলে মগের জল। ঢোক গিললে বাতাসী। গোঙানির সুরে আর একটিবার চিৎকার করে উঠল, সাপ, সাপ—বয়ালের জলে সাপ।

সঙ্গে সঙ্গে নিঝুম মেরে গেল। আলতাব বললে, ঘুমিয়ে পড়েছে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে হয়তো। নিশ্চিন্তে ওকে ঘুমুতে দে, জাগে যদি আপনা থেকেই জাগবে।

কালীচরণ আর আলি নেওয়াজকে ওখান থেকে সরিয়ে দিলে আলতাব। বসল গিয়ে সব দলের সঙ্গে ঠাসাঠাসি হয়ে।

এ কি আবার এক নতুন উপসর্গ। কুদ্দুস মিয়ার ক্ষিদে পেয়ে গেল যে। খাবার তো এখানে পাওয়া যাবে না, তবু হঠাৎ ক্ষিদে পায় কেন। মাথা গোঁজবার ঠাঁই একটু জুটেছে, এবার যেন একটু কিছু খেতে পেলেই হয়।

তার পর যা নসিবে আছে তাই হবে, সে তো আর কেউ রদ করতে পারছে না।

উঠে দাঁড়াল কুদ্দুস। খাদ্য নেই, কিন্তু পানীয় আছে। অফুরন্ত, অঢেল। তাই একটু মুখে দিলে কেমন হয়। এগিয়ে গেল হামাগুড়ি দিয়ে, ফিরে এল কয়েক আঁজলা জল পেটে পুরে। ক্ষিদেটা কিন্তু পড়ে গেল কুদ্দুস মিয়ার। একটুখানি চাঙ্গা হয়ে উঠল।

ক্ষিদে পেয়েছে অনেকেরই। কুদ্দুদ মিয়ার দেখাদেখি একে একে আঁজলা ভরে শুধু জল খেয়ে এল। তাতেই যেন শান্তি, এছাড়া আর উপায় যে কিছু নেই।

দিন যায়, রাত্রিও যায়। এদের কাছে যায় না কিন্তু কিছুই, দিনরাত দুই সমান। বোঝবার কোন উপায় নেই যে, কখন দিন আর কখন রাত। সময়ের কোন পরিমাপ নেই এদের কাছে, নেই কোন একটা নিরিখ। চাঁদ উঠল আকাশে। আসমানের টিপ সোনার চাঁদ। মিইয়ে গেল দেখতে দেখতে। মরা চাঁদকে বিদেয় দিয়ে শুরু হল নবারুণের জয়যাত্রা। এক যায়, আর এক আসে। দিন ছুটছে রাতের পিছু, রাত ছুটছে দিনের খোঁজে। শুকতারা আর সাঁজের প্রদীপ জ্বলছে আর নিবছে। খাদের নীচে এরা তার কোন খবর রাখে না। এরা শুধু উঠছে আর বসছে। জল খাচ্ছে ক্ষিদে গেলেই, অবসাদে লুটিয়ে পড়ছে মেঝের উপর। ওরই ফাঁকে হয়তো কেউ একটু ঘুমিয়ে পড়ল, কয়লার চাতাল ঠেস দিয়ে! ও কি আর ঘুম, চোখ বুজে শুধু ঘুমবুড়ীকে ফাঁকি দেওয়া। জেগেই আছে ধরতে গেলে, আকাশ-পাতাল ভাবছে শুধু; সে ভাবনার আর শেষ নেই। চোখের সামনে নেই এতটুকু আশার আলো। উদ্ধারের আর কোন আশাই নেই যে। তা হলে আর বেঁচে থেকে লাভ? তাড়াতাড়ি যা হোক কিছু একটা ঘটে যাক না; তিলে তিলে এইভাবে দগ্ধে মরার চেয়ে সেও যে অনেক ভাল।

অন্ধকারে হাঁপিয়ে উঠেছে লোকগুলো। আবার সেই অবসাদ, একে একে ঝিমিয়ে পড়তে লাগল। বিলাপ শুরু করলে আবার সোনাই মালতে। তার বছর তিনেকের বাচ্চাটা যে কদিন থেকে অসুস্থ। কেমন আছে কে জানে? কে জানে সে সোনাইয়ের জন্যে হামলাচ্ছে কি না।

ওদিক থেকে ফ্যাঁস ফ্যাঁস করতে শুরু করেছে পাম্পখালাসী গোলাম রসুল। বুকখানা যে পুড়ছে। খাদে আসবার আগে জরুর সঙ্গে ঝগড়া করে বেরিয়ে এসেছে ধাওড়া থেকে। হাতুড়ি দিয়ে পিটতে গিয়েছিল, মাথা

ফাটাতে গিয়েছিল তার বিবিজানের ; দু-এক ঘা কষেওছে। এ দুঃখ রাখবার যে আর ঠাঁই নেই গোলাম রসুলের।

ছেলেমানুষের মত হাউ হাউ করে কেঁদেই ফেললে গোলাম রসুল। নিজের গালেই ঠাই ঠাই করে চড় কষলে গোটা কয়েক। চিৎকার করে বলে উঠল, তুই আমাকে ক্ষেমা করিস—দূর থেকে ক্ষেমা করিস রাবেয়া, তোর সঙ্গে আর দেখা করতে পারলুম না রে।

হু-হু করে আগুন জ্বলছে বুকের ভিতর। কলজের মধ্যে বিঁধছে যেন ফণি-মনসার কাঁটা।

কুদ্দুস মিয়ার ফুলজান এসে চমক দিলে আর এক দফা। হুঁকরে উঠল কুদ্দুস, ওরে আমার ফুলজান, একমুঠি ভাতের লেগে কার দোরে গিয়ে দাঁড়াবি রে বেটী।

ছাতি পেটাচ্ছে গোলাম রসুল। ভেঙে পড়েছে সোনাই মালতে। বিলাপ করছে কুদ্দুস মিয়া। আঁশু ঝরছে হাপুস নয়নে। মগবাতিটা জ্বালা থাকলে দেখতে পাওয়া যেত—আঁশু শুধু এদের চোখেই ঝরছে না, বাকিগুলোরও তাই।

দলের সর্দার আলতাব মিয়া আর একদফা হেঁকে উঠল, গোলাম রসুল, কুদ্দুস মিয়া, এ সময় তোরা এ আবার কি শুরু করলি রে। এতখানি অবুঝ হলে তো চলে না। হয়তো কোথাও সুড়ুং ভেঙে জল ঢুকেছে কলিয়ারিতে। একে একে সব ডুবে গেছে গ্যালারিগুলো। আমরা কিন্তু ডুবি নি, জলজ্যান্ত বেঁচে আছি এখনো। এর পিছনে খোদাতালার একটা কি কোন হদিস নাই ভেবেছিস ? শেষতক আমরা বেঁচে যাব দেখে নিস, জল নিকাশের ব্যবস্থা একটা হবেই।

সায় দিয়ে বললে আলি নেওয়াজ, ঠিক কথা, আলতাব মিয়া ঠিকই বলেছে। জলনিকাশের ব্যবস্থা একটা হতেই হবে।

হঠাৎ একটা নতুন আশার ঝিলিক দিয়ে উঠল। জল নিকাশের ব্যবস্থা, তা হয়তো হলেও হতে পারে।

বিশ্বাস হয় না কুদ্দুস মিয়ার। সে ব্যবস্থা আর কখন হবে ? ঘুটঘুটে এই অন্ধকারে মানুষগুলো দম আটকে মারা গেলে পর ?

গোলাম রসুল মনে মনে হাসছে। বিদকুটে এক অবিশ্বাসের হাসি। এ যে একটা স্বপ্ন, জলনিকাশের খোয়াব দেখছে আলতাব মিয়া। এও কখন হয় ?

লোকগুলো সব দমে যাচ্ছে একটু একটু করে। দম ফুরিয়ে আসছে যেন।

দমে নি শুধু আলতাব মিয়া, ক্রমাগত ভরসা দিচ্ছে লোকগুলোকে। দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠল আবার, তোরা ভুলে যাচ্ছিস কেনে ভাই সব, এতবড় একটা জাঁদরেল কোম্পানী, ওরা কি আর আমাদের কথা ভাবছে না মনে করেছিস? ঠিক ভাবছে। এতগুলো লোককে মরণের মুখে ঠেলে দিয়ে নিশ্চিন্তে কি ওরা বসে থাকতে পারে? পাম্প দিয়ে ওরা জল মারবার চেষ্টা করছে, এতক্ষণ হয়তো সারফেসের উপর বসে গেল পাম্প।

আন্দাজটা ঠিকই করেছে আলতাব মিয়া। পাম্প এসে পৌঁছে গেছে সারফেসের উপর, কাজ চলছে পুরোদমে। পিটমাউথে ভেঙে পড়েছে দেশসুদ্ধ লোক। জলনিকাশের ব্যবস্থা যে করতেই হবে কোম্পানীকে। অবশ্য লোকগুলোর বাঁচা না-বাঁচা পরের কথা। ওদের কাছে এরা তো সব মরেই গেছে, খাদের নীচে জল ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে। কোম্পানী থেকে জলনিকাশের ব্যবস্থা করা হচ্ছে. কলিয়ারিটা শুধু সাফ করবার জন্য।

কুদ্দুস মিয়া বললে, জলনিকাশের লক্ষণ কই দোস্ত, পানি তো কই কমছে না।

আলতাব বললে, কমবে, সামনে থেকে সরে যাবে পানি, ঠিক কমবে। এত বড় একটা ব্যাপার, এত বড় একটা এন্তাজাম, সময় একটু লাগবে বই কি। দেখে নিস তোরা আমার কথা, ডুলি বেয়ে আবার আমরা উঠে যাব উপরে।

ডুলি আবার নামবে নাকি? সত্যি সত্যি নামবে ডুলি? তা হয়তো নামবে। কোম্পানীর ওই ডুলি চড়ে ওঠানামা করতে বছরের পর বছর কেটে গেছে, হতভাগ্য এই মালকাটাদের। সেই ডুলি কি এদেরকে আজ ভুলে থাকতে পারে? নামবে ডুলি অবধারিত, তা হলে আর চিন্তা কি।

কালীচরণ মালকাটার সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না অনেকক্ষণ থেকে। লোকটা হঠাৎ একদমসে চুপ মেরে গেল কেন? আলতাব একটু সজাগ হয়ে উঠল। ডানধারে তার বসেছিল কালী, হাত বাড়িয়ে লোকটাকে আর ছোঁয়া যাচ্ছে না। গেল কোন্ দিকে কালীচরণ!

অন্ধকারে সবই ঢাকা। মনের গভীর অন্ধকারে কার কোথায় কি ঢাকা আছে কে জানে? কালীচরণ বাগদি। ওই এক বিচিত্র জীব। সবই ভাল কালীচরণের, শুধু একটা জায়গায় দুর্বলতার সীমা নেই তার। সেটা হল মেয়েছেলের ওপর কালীচরণের অত্যধিক আকর্ষণ। সেটা হল তার অপরিমেয় আসঙ্গলিপ্সা। জীবনব্যাপী ওই ওর এক অমানুষিক ক্ষুধা।

কালীচরণকে সবাই এরা চেনে যে, ভাল করেই চেনে কালীকে।

তাই বলে এই জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে সে কথাও কি চিন্তা করা যায়? যায় হয়তো, কিংবা হয়তো যায় না; উদ্ভট এই মনস্তত্ত্বের সঠিক মত কৈফিয়ত দিবার সাধ্য আছে কারো!

আলতাব মিয়া অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল একটুখানি। গেল কোথায় কালীচরণ! এদিক-ওদিক হাতড়াচ্ছে আলতাব।

কোণের দিকটা আন্দাজ করে আর একটু এগুলো। কালী মালকাটার নিঃশ্বাস গায়ে এসে ঠেকল যেন আলতাব মিয়ার। কি আশ্চর্য, কালী হঠাৎ এখানে কেন?

- আলতাব যা ভেবেছিল তাই! কালীচরণের কলুষিত স্পর্শে অশুচি হয়ে উঠল যেন আলতাব মিয়ার প্রাসারিত হাত দুখানা। সুড়ঙ্গের কোণে ঘাপটি মেরে বসে আছে কালী। বাতাসীর হাত একখানা আলতোভাবে জড়িয়ে নিয়েছে নিজের গলায়। মুখখানা কালীর নুয়ে পড়েছে বাতাসীর ঠোঁটের উপর। কি সাংঘাতিক, কী করছে ও! গর্জে একটা হুঙ্কার দিলে আলতাব মিয়া, কালী!

ঘাবড়ে গেছে কালীচরণ। চমকে উঠল আলতাব মিয়ার হাঁক শুনে। কালী বাগতির কলার দেওয়া গেঞ্জিটা ঘাড়ের দিক থেকে টেনে ধরলে আলতাব, দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল, ইদিকে আয় শালা, উল্লুককা বাচ্ছা!

ভড়কে গেছে কালী। কাঁচুমাচু করে কি যেন একটা বলতে যাচ্ছিল। গর্জে উঠল আলতাব মিয়া, চুপ রও বেটা হারামজাদা, রামছাগলের জনিত!

চেপে ধরলে আলতাব মিয়া কালীচরণের বাবরী চুলের গোছাটা। পিঠের উপর দুমদাম পড়তে লাগল কিল ঘুঁষি আর থাপ্পড়। টানতে টানতে নিয়ে এল সকলের মাঝখানে।

ব্যাপারটা এঁচে নিয়েছে সকলেই। বাতাসীর উপর নজর পড়েছে হারামজাদার! এর চেয়ে আর বিচিত্র কি হতে পারে। অতিমাত্রায় খাপ্পা হয়ে উঠল মালকাটা আর পাথরকাটার দল। এ পাপের আর চারা নেই, একের পাপে বাকিগুলোও বরবাদ হয়ে যাবে যে সব একসঙ্গে! পাম্পখালাসী গোলাম রসুল মরীয়া হয়ে বলে উঠল, আমরা ওকে ডুবিয়ে মারব খাদের জলে, একেবারে শেষ করে দেব বেটা বাগতিকে, টেনে নিয়ে চল হারামজাদাকে দরিয়ার মধ্যে।

হতভম্ব কালীচরণকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া শুরু করলে কয়েকজনে মিলে।

চারদিক থেকে পড়তে লাগল চড় চাপড় আর গুঁতো।

কাতর কণ্ঠে বলে উঠল কালীচরণ, দোহাই তোদের, দোহাই তোদের ভাই সব, এই নাক মলছি আর কান মলছি, এবারটির মতন রেহাই দে তোরা আমাকে।

মালকাটাদের হাতে পায়ে ধরতে লাগল কালী। আলতাব শেষে জোর করে ছাড়িয়ে দিলে কালীচরণকে। বললে, ক্ষেমা দে, এবারটির মত ক্ষেমা দিয়ে দে বেয়াকুবকে। এই মরণপুরীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি হবে আর নোংরা এইসব হুজ্জোত বাড়িয়ে!

ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে উঠল আলি নেওয়াজ, ও আমাদের মা-বোন, মরণপথের সঙ্গী, এইভাবে ওর অপমান কিছুতেই আমরা বরদাস্ত করব না কালী। ভাল চাস তো পায়ে ধরে ওর মাপ চেয়ে নে।

টনেতে টানতে কোণের দিকটায় নিয়ে গেল কালীচরণকে। বাতাসীর পায়ের উপর ঠেকিয়ে দিলে কালীচরণের হাত দুটো। বললে, ডাক এইবার, মা বলে ডাক, বল মাগো—নিজগুণে এই অধম সন্তানকে ক্ষেমা করিস মা!

ঠক ঠক করে কাঁপছে কালী। মা বলে তাকে ডাকতে হল বাতাসীকে। না ডেকে আর উপায় কি, অবস্থা যে সঙীন হয়ে উঠেছে। ছি ছি ছি, কেন এমন মতিচ্ছন্ন ঘটতে গেল কালীর! সামান্য একটু ভুলের জন্য হতমানের একশেষ আজ হতে হল কালীকে। এত বড় একটা আহাম্মুকি কেউ কখনো করে? নিজের মনেই নিজেকে একবার ধিক্কার দিয়ে উঠল কালী। মনে মনে বলে উঠল, বাহানচোত কোথাকার!

কালী কিন্তু খুব বেঁচে গেল এযাত্রা।

আলি নেওয়াজ কি ভাবছে। বাতাসীর পা দুটো এত ঠাণ্ডা লাগছে কেন? সঙ্গে সঙ্গে নাড়ী টিপল আলি নেওয়াজ। ডান কানটা এগিয়ে দিলে বাতাসীর নাকের কাছে। নিঃশ্বাস কি টানছে বাতাসী? তেমন কোন লক্ষণ কই? নিজের মনেই একবার চমকে উঠল আলি নেওয়াজ। নিঃশ্বাস টানার শেষ দায়িত্বটুকু শেষ করে দিয়ে চলে গেল নাকি হতভাগী? কি সর্বনাশ, মেয়েটা যে হয়ে গেছে; ভবের খেলা শেষ। বিভ্রান্তের মত জোর গলায় একবার চিৎকার করে উঠল আলি নেওয়াজ—আলতাব!

সচকিত হয়ে উঠল নিস্তব্ধ পাতালপুরী। ভাঙা গলায় বলে উঠল আলি নেওয়াজ—বাতাসী নাই, ওর জীবনপাখী খাঁচা-ছাড়া হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগেই।

শিউরে উঠল আলতাব মিয়া। এগিয়ে গেল কোণের দিকে, বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠল, সে কি রে, বাতাসী নেই? এর মধ্যেই শেষ হয়ে গেল নাকি?

উচ্চকিত হয়ে উঠল পাষাণকারা। উদ্বেলিত হয়ে উঠল কোণঠাসা ওই নির্বাসিত মানুষগুলো। মৃত্যু এসে অন্ধকার এই মরণ-গুহা থেকে চুপি চুপি ছিনিয়ে নিয়ে গেল একটাকে। বাকিদেরও একে একে ডাক পড়বে হয়তো। কিংবা হয়তো একসঙ্গেই, একটিবার শুধু চোখ বুজলেই খালাস।

জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানের সীমারেখা বিলুপ্তপ্রায়। মরণপথের যাত্রী এরা সকলেই। মুহূর্ত গুনছে আশঙ্কাকুল অন্তিম প্রতীক্ষায়। তবু যে হায় প্রাণ কাঁদে, কোথাকার কোন্ এক বাতাসীর জন্য। উত্তাল তরঙ্গের বুকে ঝড়ের মুখে ভেলা ভাসিয়ে একসঙ্গেই ভাসছিল এরা। একটি তার ডুবে গেল আচম্বিতে, অতলস্থ হয়ে গেল আর সকলের চোখের সামনে। নিভে গেল জীবন-দীপ মহাকালের অদৃশ্য ফুৎকারে। দুঃখ একটু হয় বইকি।

কোন্ এক পরমাত্মীয়ের বিয়োগ-ব্যথায় লোকগুলো যেন হায় হায় করে উঠল। আলতাব মিয়া বসেছিল বাতাসীর মৃতদেহের পাশে। ভগ্নকণ্ঠে বলে উঠল—বহিন, আমরা তোর এতগুলো ভাই থাকতে অসময়ে তোর কোন কাজেই লাগলুম না। তুই আমাদের ক্ষেমা করিস বহিন।

জল ঝরছে সোনাই মিয়ার চোখে। পথ দেখিয়ে দিয়ে গেল যে বাতাসী। এই পথ যে সকলেরই পথ আজ। যেতেই হবে এগিয়ে। কেউ কিছুটা আগে, কেউবা একটু পরে। হু-হু করে কেঁদে উঠল সোনাই, তার মা-হারা ওই বাচ্চাটার সঙ্গে আর তো সোনাইয়ের দেখা হবে না!

বুক চাপড়ে বলে উঠল কুদ্দুস মিয়া—আলতাব, যাবার সময় হয়ে এল নাকি রে!

মৃদু একটা দাবড়ি দিলে আলতাব মিয়া, আঃ—আবার তোরা শুরু করলি যে!

শান্ত হল সব একটুখানি। আলতাব মিয়াকে লক্ষ্য করে বলে উঠল আলি নেওয়াজ. কি ভাবে এর সৎকার করা যায় বল দেখি। যা হোক কিছু ব্যবস্থা একটা করতে হবে তো।

সমস্যার উপর দেখা আর এক সমস্যা। মৃতদেহের সৎকার করবার মত কোন ব্যবস্থাই যে সম্ভব নয় এখান থেকে। বড় জোর মুর্দাটাকে টেনে হিঁচড়ে জলের দিকে একটুখানি ঠেলে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ওই জল যে এতগুলো লোকের একমাত্র ভরসা। খাদ্য এবং পানীয়ের কাজ করছে

একসঙ্গে। জলে ভাসানো ঠিক হবে না, অন্য কোন ব্যবস্থা করা দরকার।

আলতাব মিয়া ভেবে-চিন্তে ব্যবস্থা একটা ঠাউরে নিলে মনে মনে। করতেই হবে জানাজার ব্যবস্থা। কুদ্দুস মিয়াকে ডাক দিয়ে বললে, তোর কয়লা-কাটা গাঁইতিটা একবার দিতে পারিস কুদ্দুস, কবর খুঁড়তে হবে বাতাসীর জন্যে।

সেই সবচেয়ে ভাল। গাঁইতি আছে, শাবল আছে সঙ্গে; কবর একটা কোনরকমে খোঁড়া যেতে পারে। এ প্রস্তাবে সায় দিয়ে উঠল সকলেই। এ ছাড়া আর পথ নেই, বাতাসীকে মাটির নীচে গেড়ে দেওয়াই ভাল। আপনার বলতে কেউ নেই তার এখানে, এরাই যে তার সব। অন্তিমের ব্যবস্থাটুকু করতেই হবে এদেরকে। যতটুকু সম্ভব, যতটুকু এদের সাধ্য।

বাতাসীর দেহটাকে ধরাধরি করে পাশের দিকে একটু সরিয়ে দেওয়া হল। কুদ্দুস মিয়া এগিয়ে দিলে গাঁইতিটা। আলি হোসেন দিলে তার শাবলখানা। আলতাব আর আলি নেওয়াজে মিলে শুরু করলে গর্ত খুঁড়তে। মৃত্তিকা নেই, পায়ের নীচে জমাট বাঁধা কয়লা। গাঁইতির ফলার আঘাতে ভাঙতে লাগল কয়লার চাঙড়। কিছুক্ষণের মধ্যেই গর্ত একটা খোঁড়া হয়ে গেল। হাত-পা ছড়িয়ে সোজাসুজি শুইয়ে দেওয়ার জায়গা নেই, তাই নীচের দিকে গর্তটা একটু গভীর করে খুঁড়ে নেওয়া হল।

আলতাব একটু ভারী গলায় বললে, মৃতদেহ দাফনের আগে একটুখানি কাফন দরকার। কারো কাছে কিছু আছে নাকি রে?

নতুন একখানা গামছা বাঁধা ছিল কালীচরণের কোমরে। বললে, 'এটা দিয়ে হবে?

মৃতদেহ ঢাকা দিতে নববস্ত্র একটুখানি দরকার। গামছাখানা কাজে লেগে গেল।

আলতাব বললে, সময় হল জানাজার। জলে নেমে সব অজু করে আয়, খোদাতালার নাম নিয়ে বাতাসীকে এবার বিদেয় দিতে হবে যে।

খাদের জলে একে একে হাত-পা ধুয়ে তৈরি হয়ে এল। কোন দিকটায় কাবা শরিফ পাতালপুরীর অন্ধকারে ঠাওর করা মুশকিল। ভেবে-চিন্তে পশ্চিম দিকটা কোনরকমে ঠাওরে নিলে আলতাব মিয়া। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে উত্তরদিকে মাথা আর দক্ষিণদিকে পা রেখে কেব্‌লামুখী করে দেওয়া হল বাতাসীকে।

সার দিয়ে সব দাঁড়িয়ে গেল বাতাসীর মৃতদেহের পাশে। পাম্পখালাসী

গোলাম রসুল, সেই হল আজ পাতালপুরীর এমাম। জানাজার নামাজ আজ পড়তে হল তাকেই। আল্লার দয়া, সবই তাঁর দয়া। মৃত্যুর জন্য তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে মন্ত্র পড়লে গোলাম রসুল, শেষ করলে জনাজার নামাজ।

পৃথিবীর কেউ জানলে না এর বার্তাটুকু পর্যন্ত। দুনিয়ার কেউ শুনলে না এর মর্মবাণী। নিখিল বিশ্বচরাচরের মালিক যিনি—তিনি হয়তো উদ্‌গ্রীব হয়ে কান পেতে আছেন। গোলাম রসুলের জানাজার এ প্রার্থনা-মন্ত্র তাঁর কাছে গিয়ে ঠিকই পৌঁছেছে।

মারা গেছে বাতাসী। ধর্মে ও কর্মে হতে পারে সে ভিন্ন, তবু সে আজ আপন হতেও আপন জন। বাতাসী আজ এদের কাছে মা-বোনের চেয়ে কম নয় কিছু। তার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা না করে কি পারে এরা!

লাস এইবার নামাতে হবে কবরে। দোওয়া পডছে এমাম—

"বিছ্‌মিল্লাহে অ-আলা মিল্লাতে রাছুলিল্লাহে।"

যাঁর ধন ফিরিয়ে নিলেন তিনি। তাঁরই নামে সঁপে দেওয়া হল বাতাসীকে। আলতাব আর আলি নেওয়াজে মিলে গর্তের মধ্যে ঠেস দিয়ে বসিয়ে দিলে বাতাসীর নিষ্প্রাণ দেহখানা। গাঁইতি-কাটা ঝুরো কয়লার স্তূপটা ঠেলে ঠেলে বুজিয়ে দেওয়া হল গর্তটা। আট শ ফুট খাদের নীচে পড়ো একটা সুড়ঙ্গের কোণে অন্ধকারে কবরস্থ হয়ে গেল বাতাসী। বিলীন হয়ে গেল কয়লাখনির গর্ভে। বাইরের লোক সে-কথা কেউ জানলেই না। সারফেসের সরজমিনে পাম্প ফিট হচ্ছে জল নিকাশের জন্য।, তাদের কাছে এরা আর কেউ বেঁচে নেই। কবরস্থ বাতাসীর চেয়েও এদের মৃত্যু অধিকতর নিশ্চিত বলে বহু আগেই সাব্যস্ত হয়ে গেছে বাইরের লোকের কাছে।

বাতাসীর কবরের পাশে একে একে নেতিয়ে পড়ল লোকগুলো। আবার সেই অবসাদ, আবার সেই হতাশা, জীবনের আর কোন আশাই নেই যে। কে কার জন্যে কবর খুঁড়বে, এখনো যে বারো জন বাকি। বারো জনের বারোটা কবর খুঁড়তে এখনো বাকি আছে। সে আর হয়তো হয়ে উঠবে না। নির্জন এই অন্ধকার সুড়ঙ্গের শেষপ্রান্তে একে একে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে যাবে মহাকাল। ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে যাবে ঠিক বতাসীর মতই, হয়তো বা সব একসঙ্গেই। তখন আর কোন খোঁড়াখুঁড়ির দরকার হবে না। এই সুড়ঙ্গটাই হয়ে উঠবে আস্ত একটা করবখানা। এইখানেই সব মাটি নিতে হবে যে!

গলা ফাটিয়ে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল সোনাই মালতে, আল্লা—!

আলতাব মিয়া ধমক দিলে, সোনাই!

কারো মুখে আর রা শব্দ নেই। অন্ধকারে ঝিমিয়ে পড়ল নিস্তব্ধ পাতালপুরী।

॥ ১১ ॥

সারফেসের চাঞ্চল্য থিতিয়ে গেছে অনেকখানি। বহিরাগত লোক সমাগম কমে আসছে একটু একটু করে। খাদ ডুবেছে বেনোজলে, লোক মরেছে শ দুয়েকের কাছাকাছি। নতুন করে আর তো কিছু জানবার নাই। এখন শুধু কলিয়ারি সাফ করবার ব্যবস্থা। সে ব্যবস্থা কোম্পানী করছে, বাইরের লোকের ও নিয়ে আর মাথা ঘামাবার নেই কিছু। কৌতূহলী জনতার ভিড় ক্রমশ তাই কমে আসছে। ভিড় হয়তো হতে পারে আর এক দফা, কয়লা-খাদের জলনিকাশের পর। ভিড় জমবে পাতালপুরীর কঙ্কালগুলো দেখতে। এখনো তার দেরি আছে কিছু।

এদের কিন্তু আর দেরি সইছে না। মালকাটাদের আত্মীয়স্বজন ধাওড়া ছেড়ে পালায় নি কেউ আজও। আধাপটা খেয়ে পড়ে আছে ছেলেপিলে নিয়ে। খাদমোয়ানে মাঝে মাঝে গিয়ে পাটাশ খেয়ে পড়ছে। মড়াগুলো ওঠে যদি, সৎকার করবার ব্যবস্থা করতে হবে যে। কার মুখে কে আগুন দেবে, তাও যে বেবাক ঠিক হয়ে আছে। কাকে কোথায় কবর দেওয়া হবে, ভাবছে যারা কবর দেবার মালিক! জ্যান্ত যখন পাওয়া গেল না মানুষ-গুলোকে, মরাগুলোই নিয়ে যেতে হবে। তাও তো কিছু পাওয়া হল, সেও যে অনেক সান্ত্বনা। বুক চাপড়ে আর মাথা ঠুকে আর একটিবার হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদতে পাওয়া যাবে তো। শেষ দেখা আর শেষ কান্না বাকি এখনো। সেই আশাতেই দিন গুনছে এরা, পাষাণ বুকে পাথর চাপা দিয়ে। খাদ থেকে ওরা উঠবে কবে, আর যে দেরি সয় না। জ্যান্ত হোক আর মরাই হোক—দেরি যে আর সয় না। বুকের ভিতর চিতে জ্বলছে। থরে থরে সাজানো, একুনে এক শ বাষট্টি, পাশাপাশি জ্বলছে। তিন নম্বর খাদানের এই সুড়ুংভাঙা বেনো জলে নিভল কই সে চিতের আগুন।

বিলাসপুরী কামিনটা। মালকাটা ওই মলুয়ার মা। ওকে কিন্তু খাদমোয়ান

থেকে তাড়াতে পারে নি কেউ। দিনরাত্তির পড়ে আছে ফাঁকা মাঠে। বলে মলুয়াকে সঙ্গে না নিয়ে ধাওড়ায় আমি ফিরব না কিছুতেই। চিৎকার করছে যখন তখন, ওরে আমার মলুয়া রে।

খাদমোয়ানের খালসীরা বহু চেষ্টা করেছে ওকে বোঝাতে। বিলাসপুরী সঙ্গীসাথীরা চেষ্টা করেছে ধরে পাকড়ে ধাওড়ায় নিতে যেতে। মলুয়ার মা কারো কথাই শুনতে চায় না। বলে ঝাঁপ দেব ওই খাদে, মলুয়াকে আমি খুঁজে নিয়ে আসব।

কোম্পানীর লোক সজাগ আছে চারিদিকে। খাদে ঝাঁপ দেওয়া সহজ নয়। ফ্যাল ফ্যাল করে দূর থেকে শুধু চেয়ে থাকে মলুয়ার মা, চেয়ে থাকে ওই হেডগিয়ারের কাঠামোটার দিকে। ওরই নীচে মলুয়া গেছে কয়লা কাটতে। সেই যে গেছে—ফেরে নি আর। মলুয়ার মা আকাশ-পাতাল ভাবছে শুধু। আচম্বিতে আকাশপানে তাকায়। ওদিকটায় তো নজর দেওয়া হয় নি, পথ ভুলে যদি এগিয়ে গিয়ে থাকে। চেঁচিয়ে উঠে উদ্‌ভ্রান্তের মত, মলুয়া—আমার মলুয়া রে!

পাম্প-খালাসীর ছেনি হাতুড়ি ছিটকে পড়ে কাজের মাথায়। লাঠি ঠুক ঠুক করে এগিয়ে যায় শেখপাড়ার হিঙ্গু বুড়ো, গোটা কয়েক নাতি-নাতনীর হাত ধরে। এগিয়ে গিয়ে খবর নেয়, কাঁদছিস, কাঁদছিস নাকি মলুয়ার মা!

পাশে গিয়ে বসে পড়ে। একটু কিছু শুনতে চায় যেন, শুনতে চায় কোন নতুন খবর, মলুয়ার মায়ের মুখ থেকে। ভাতিজাটা নেমে গেছে খাদের নীচে, এক ডুলিতেই নেমে গেছে মলুয়া আর আনসুর। হিঙ্গু শেখ তাই মাঝে মাঝে এইখানেই খবর নিতে আছে। আছে নাকি নতুন খবর কিছু। ভেঙে পড়ে মলুয়ার মা, হাত পা ছুঁড়ে আবার কাঁদতে বসে। দেখাদেখি হুঁ করে উঠে হিঙ্গু শেখ নিজেও।

কোম্পানীর লোক তাড়া করে আসে। কাজ চলছে খাদমোয়ানে। কান্নাকাটি হৈ-চৈ করে ভিড় জমাবার জায়গা এটা নয়। শেখ বুড়োকে দেখেই এগিয়ে গেল কোম্পানীর একটা চাপরাসী। আপ্যায়নের বাঁধা বুলিটা মুখস্থই আছে, ঝেড়ে দিলে হিঙ্গু বুড়োকে তাক করে, নিকালো, নিকাল যাও হিঁয়াসে।

নিকালতেই হবে। যন্ত্রপাতি জোড়াতালির কাজ চলছে খাদমোয়ানে। মলুয়ার মাকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে মিয়া সাহেব যদি দিনের মাথায় বার দুই তিন ছাতি পেটায় কাজের মাথায় এসে, কোম্পানীর আসল কাজে ব্যাঘাত ঘটে।

যে। শেখ বুড়োকে হাত ধরে তাই টানতে টানতে খানিকটা দূর এগিয়ে দিয়ে এল।

লাইনধারের কাছাকাছি গিয়ে থমকে একটু দাঁড়াল হিঙ্গু। দূর থেকে তাকাল একবার হেডগিয়ারের দিকে। বন্ বন্ করে চাকা ঘুরছে! চাকা নামছে আসমান থেকে। ধাঁই ধাঁই করে শব্দ উঠছে পাইপ জোড়ার। জল নিকাশের কাজ চলছে পুরোদমে। এবার হয়তো মালকাটারা উঠবে। কোম্পানীর তরফ থেকে এলাহি কাণ্ড চলছে একটা বটে; এর পর আর মালিক বাবুদের দোষ দেওয়া যায় কি। খুব করছে, ঢের করছে মালকাটাদের জন্যে। এর বেশী কি করতে পারে মানুষ? জয় হোক, রাজাবাবুদের জয় হোক। এইভাবে ঠিক কাজ চললে জল সরতে আর কদিন।

কপালের উপর বাঁ হাতের চেটোটা মেলে ধরে কোটরগত চোখ দুটো সামনের দিকে প্রসারিত করে দিলে হিঙ্গু। একাগ্র দৃষ্টি মেলে কি যেন নিরীক্ষণ করছে। জল কমছে সরজমিনের উপর। ক্ষেত খন্দ খানা ডোবা নিঃশেষ হয়ে আসছে। সদ্‌গোপদের বয়ালটার জল আধাআধি হয়ে এল প্রায়। এই ভাবে যদি পাম্প চলে—তা হলে আর ভাবনা কি। খাদের জলে টান পড়তে আর বেশি দেরি হবে না। কোম্পানীর এই আজব কাণ্ড দেখে সুড়ংঠাসা মানুষগুলো এবার হয়তো সত্যি সত্যি তাজ্জব বনে যাবে।

এইখানেই একটু ভুল হয়ে গেল হিঙ্গুবুড়োর। তাজ্জব ওরা ঢের আগেই বনে গেছে। কোম্পানীর এই আজব কাণ্ড নিজের চোখে দেখবে বলে খুব বেশী ওদের অপেক্ষা করতে হয় নি। এই তো সবে হপ্তা দুয়েক হল, বড় জোর আর দিন পাঁচ সাত। একটি ফোঁটা জল বলতে খুঁজে কোথাও পাওয়া যাবে না। বিলকুল সব শুষে নেবে এই পাম্প দিয়ে। তার পরেই ঘটবে আর এক তাজ্জব কাণ্ড। খাদের নীচে মালকাটারা নতুন করে দেবে আর এক চমক। সেই আনন্দেই লোকগুলো যে বিভোর হয়ে আছে।

বিলাসপুরী কামিনটা তবু এত চেঁচায় কেন? তাজ্জব কাণ্ডের এত বড় একটা প্রস্তুতি চলছে, সে খবর ওর জানা নেই নাকি? নির্বোধের মত চিৎকার করছে ওই আবার, ওরে আমার মলুয়া রে—।

পাম্প খালাসীর খাম্বা পেটা হাম্বারের শব্দে কোথায় যেন তলিয়ে গেল মলুয়া।

ধাপ্পা, ধাপ্পা, আলতাব মিয়ার ধাপ্পা। আলি নেওয়াজের বুজরুকি

অন্ধকার এই পাতালপুরী থেকে কারো বাপের তাগদ আছে জীবন নিয়ে ফিরে যায়! বিলকুল সব ধাপ্পা।

কুদ্দুস মিয়া তড়পে উঠল। মাঝে মাঝেই তড়পাচ্ছে, আবোলতাবোল বকে যাচ্ছে নিজের মনেই। মাথাটা শেষতক খারাপ হায় গেল নাকি কুদ্দুসের।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে আলি নেওয়াজ গিয়ে ধরে ফেললে কুদ্দুসকে। রুখে উঠল কুদ্দুস মিয়া, কে, পথ আগলে দাঁড়ালি এসে কে রে? পথ ছাড়—আমি বাইরে যাব, ফুলজান আমার পথে দাঁড়িয়ে কাঁদছে যে।

আলি নেওয়াজ একটু মোলায়েম স্বরে বললে, কুদ্দুস, এ আবার কি ছেলেমানুষি শুরু করলি বল দেখি।

—ছেলেমানুষি! কে বলে ছেলেমানুষি? তোরা আমাকে ভেবেছিস কি বল তো। দূর থেকে ওই শুনতে পাচ্ছিস না উল্লুক, ফুলজান আমার নাম ধরে ডাকছে—বাপজী, বাপজী, ঘরে আয়! কেঁদে কেঁদে মেয়ে যে আমার সারা হয়ে গেল।

এগিয়ে গেল আলতাব মিয়া। ভুল বকতে শুরু করেছে কুদ্দুস। মেয়ের শোকে লোকটা বুঝি পাগল হয়ে গেল। কুদ্দুস মিয়াকে জড়িয়ে ধরলে আলতাব, মৃদু কণ্ঠে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, আমরা তোকে ফুলজানের কাছে পৌঁছে দেব দোস্ত। বিশ্বাস কর আমার কথা, ঘরে ফিরতে খুব বেশি আর দেরি হবে না আমাদের।

কুদ্দুস মিয়া গর্জে উঠল, চুপ রও হারামজাদ, গুল মারবার আর জায়গা পাস নি! বাতাসীকে গলা টিপে খুন করলেক কে? আলতেবে আর আলি নেওয়াজ। নিজের চোখে দেখেছি আমি, কেলে বাগতি আর গোলাম রসুল সাক্ষী। আমি তোদের জেলে না পুরে ছাড়ব না কিছুতেই। পুলিস—পুলিস—।

জোর গলায় চেঁচিয়ে উঠল কুদ্দুস মিয়া। আলতাব মিয়া আর আলি নেওয়াজের সঙ্গে রীতিমত কিল ঘুষি ধস্তাধস্তি শুরু করে দিলে। আলতাব একটু শক্ত করে চেপে ধরলে কুদ্দুসকে। জোর একটা দাবড়ি দিয়ে বললে, কুদ্দুস, থেমে যা, ভাল চাস তো থেমে যা বলছি।

থামবার কোন লক্ষণ নেই কুদ্দুসের। স্বর চড়িয়ে বলে উঠল—কি, তোরা আমাকে গলা টিপে খুন করতে চাস নাকি। বাতাসীর মতন খাদের নীচে খাল খুঁড়ে পুঁতে দিতে চাস?

ভয় পেলে বুঝি কুদ্দুস মিয়া। হঠাৎ যেন শিউরে উঠল একটুখানি। চিৎকার করে উঠল আবার, ফুলজান, ফুলজান, এরা আমাকে খাদের জলে ডুবিয়ে মারলে। সামনে থেকে পালা বেটি, গলা টিপে এরা মেরে ফেলবে তোকে। দুশমন—দুশমন—চারিদিকে দুশমন।

থেমে গেল কুদ্দুস মিয়া, আর কোন রা-শব্দ নাই। অতিরিক্ত উত্তেজনার ফলে বেঁহুশ হয়ে পড়ল বুঝি। সকলে মিলে ধরাধরি করে মাটির ওপর শুইয়ে দিলে কুদ্দুসকে। আলতাব মিয়া হেঁকে উঠল, পানি, পানি।

অন্ধকারে গুঁড়ি বেয়ে এগিয়ে চলল আলি নেওয়াজ। মগবতির খোলটা ডুবিয়ে নিয়ে এল জলে নেমে। মুখে চোখে ঝাপটা দিয়ে একটুখানি ঢেলে দিলে কুদ্দুস মিয়ার মুখের মধ্যে। শান্তভাবে ঘুমুচ্ছে ভিজে স্যাঁতসেতে মেঝের উপর। নিঃসাড়ে বুঝি ঘুমিয়ে পড়ল কুদ্দুস। ঘুমোক—দম ভরে একটু ঘুমিয়ে নিক, একেবারে ভেঙে পড়েছে বেচারা। কে জানে কোন্ ব্যারামের লক্ষণ এটা। মাথার ছিট, না ফিটের ব্যামো? নাকি একেবারেই পাগল হয়ে গেল! এ যে আবার নতুন করে একটা ফ্যাসাদ বাঁধালে কুদ্দুস মিয়া।

থম থম করছে নিস্তব্ধ পাতালপুরী। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল উচ্চকিত মালকাটার দল। কুদ্দুস মিয়ার লক্ষণটা কেমন কেমন ঠেকছে। আর কোন আশা নেই, কারো কোন আশা ভরসাই নেই। তা না হলে কুদ্দুস মিয়া এমনধারা উদ্ব্যক্তা হয়ে উঠবে কেন? কালে এসে ঘিরেছে। অন্ধকার এই সুড়ঙ্গের কোণে থাবা গেড়ে বসে আছে মরণ। কে বাঁচাবে মালকাটাদের?

কালীচরণ ওপাশ থেকে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। বসল গিয়ে গায়ে গায়ে গা ঠেকিয়ে। ফিস্ ফিস্ করে বলে উঠল কালী, একটা কথা বলব আলতাব?

কান খাড়া করে শুনছে সব। কালী বললে, বাতাসী বোধ করি পুষ্করা পেয়ে গেল রে। দিন-ক্ষ্যাণটা হয়তো ভাল ছিল না।

আলতাব বললে, পুষ্করা, সে আবার কি? পুষ্করা পেলে কি হয়?

কালী বললে, সবই হয়, উৎপাত শুরু হয় চারদিক থেকে। কাউকে করে উদ্ব্যক্তা, কারো মটকায় ঘাড়। কুদ্দুস মিয়াকে ভর করেছে, লক্ষণটা ভাল না।

আলতাব একটু হেসেই ফেললে, বললে, ভূতের কথা বলছিস নাকি কালী। সে আবার কি রে, ভূত আবার আছে নাকি?

সোনাই মালতে আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে। একে এই ঘুটঘুটে অন্ধকার, তার ওপর কিনা পুষ্করা। কাঁপা গলায় বলে উঠল সোনাই, ভূত-মামদোর কথা নিয়ে হাসি মস্করা ভাল নয় আলতাব।

কালীচরণেরও সেই কথা। আর সকলের অজ্ঞাতে বুকের ওপর থু থু করে বার বার দুই-তিন থুথু ছিটিয়ে নিয়ে কালী। ফিস্ ফিস্ করে বলে উঠল, জয় মা কালী, কালী কৈবল্যদায়িনী করালবদনী মা গো—!

কবিয়ালের চেলা কালী। অনেক কিছু জানা আছে তার। মন্ত্রতন্ত্র ঝাঁড়ফুকটাও কিছু কিছু জানে। ধরলে একটা শ্লোক ঃ—

আশ বন্ধন পাশ বন্ধন······

ভাগ ভাগ ভূতিনী, ভাগ ভাগ প্রেতিনী, লিং লটপট স্বাহা।

আলতাব মিয়া অবাক মেরে গেল। হাঁক দিলে আর এক দফা, কালী!

সোনাই মালতে কাঁপছে ভয়ে। কাঁপা গলায় বলে উঠল, ইয়া আল্লা।

আলতাব মিয়া দাবড়ি দিলে আর একটা, এ সময় তোরা এ আবার কি আজগুবি কাণ্ড শুরু করলি রে! মা কালী আর আল্লা এসে ভূত তাড়াবে তোদের? মরতে মরতে এ ভুল তোরা করিস কেনে বল তো। ভূত নাই. এখানে কোন ভূত নাই, আমরাই তো এক-একটি আস্ত ভূত।

কালীচরণ ধাঁধায় পড়ল। আলতাব মিয়া ভূত মানে না! সত্যি সত্যি নেই নাকি ভূত। ওদের শাস্ত্রে সেই কথাই বলে হয়তো। কিন্তু আমরা হঠাৎ বেঁচে থেকেও ভূত হলাম কেমন করে? এটা আলতাব ভুল বলছে। কুদ্দুস মিয়ার লক্ষণটা ঠিক ধরতে পারে নি আলতাব। ভূত যদি এ না-ও হয়—মামদো-টামদো একটা কিছু হতে পারে তো!

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল কুদ্দুস মিয়া। উঠেই একটা ডাক দিলে, আলি নেওয়াজ।

—এই যে দোস্ত, এখানে। আমরা সব তোর কাছেই আছি।

সাড়া দিলে আলি নেওয়াজ। কুদ্দুস বললে, ঘুমিয়ে পড়েছিলুম নাকি রে? রাত্তির কটা বাজল?

রাত্তির দিন কিছুই এখানে বাজে না। অন্ধকারে সবই সমান। কুদ্দুস মিয়া নিজেই আবার বলে উঠল, ঘুমের ঘোরে খেয়াল ছিল না দোস্ত, ভেবেছিলুম রাত্তির হল বুঝি!

আলতাব বললে, তবিয়ত বেশ ভাল আছে তো?

—ভালই আছি, তবিয়ত তো কিছু খারাপ নেই!

জবাব দিলে কুদ্দুস মিয়া। ফোড়ন কেটে বলে উঠল কালীচরণ, তবে যে এতক্ষণ বিটকিলেমি শুরু করেছিলি? আমরা তোকে খাদে ডুবাই মারছিলোম, না?

ধমকে উঠল আলতাব মিয়া, কেলে !

ঘুমের ঘোরে কুদ্দুস মিয়া যে কথাটা একেবারেই ভুল গেছে, তা নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি কেন। এতটুকু যদি আক্কেল থাকে বেয়াকুবদের।

হো হো করে হেসে উঠল কুদ্দুস মিয়া। কালীচরণ বলে কি। পাগলের মত আবোলতাবোল বকে কেন ? ভূত-মামদোয় পেল নাকি বেটা বাগতিকে !

কুদ্দুস মিয়া হো হো করে হেসে উঠল আর এক চোট।

তবু ভাল, এযাত্রা খুব সামলে গেছে কুদ্দুস। আল্লার দয়ায় ব্যামোটা হয়তো সেরে গেল।

লোকগুলো সব থম্ব মেরে গিয়েছিল এতক্ষণ। আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল অজানা এক আশঙ্কায়। স্থান কাল পারিপার্শ্বিক ভালমন্দ জীবনমরণ কিছুই যেন ঠিক ঠাহর ছিল না। সম্বিত ফিরছে একে একে। আবার সেই অবসাদ, দেহ যেন লুটিয়ে পড়ছে, মৃত্যু এসে টানছে যেন চুলের মুঠি ধরে। আশা নেই. আর কোন আশা নেই, জীবনের আর কোন আশাই নেই।

আলতাব মিয়া বুঝতে পেরেছে, ক্রমশই যেন ভেঙে পড়ছে মানুষগুলো। আর বুঝি ঠেকা দেওয়া যায় না ! কি বলে আর সান্ত্বনা দেবে আলতাব, একলা সে আর কেমন করে ঠেকা দিবে এতগুলোকে। ভরসা মাত্র মনের জোর, তাও যে ক্রমশ উপে আসছে একে একে।

আলতাব মিয়া সজাগ হয়ে উঠল। যেমন করে হোক ঠেকা একে দিতেই হবে। লোকগুলোকে চাঙ্গা না রেখে যে উপায় নেই। দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠল আলতাব, তোরা যেন কেউ ভেঙে পরিস না ভাইসব, বাঁচতে হবে আমাদিকে যেমন করেই হোক। মৃত্যু নয়, জীবন। যমের মুখ থেকে জীবনকে আমরা ছিনিয়ে আনব।

হেঁকে উঠল আলি নেওনাজ, এই তো হল মরদকা বাত, যমের মুখ থেকে জীবনকে আমরা ছিনিয়ে আনব। মরতে আমরা চাই না এত সহজে।

কান খাড়া করে শুনছে সব বিভ্রান্তের দল। মরতে তো কেউ চায় না, কেউ ওরা মরতে চায় না। তিলে তিলে মরছে তবু, মরছে আর বাঁচছে। মরা বাঁচার টানাপোড়েন। কোন্ মাকুতে কে যে কখন উঠছে আর নামছে, কে রাখে তার হিসেবনিকেশ।

হিসেবনিকেশ রাখাটা খুব দরকার। সে কাজটুকু আলি নেওয়াজকেই করতে হচ্ছে আপাতত। অন্ধকারে কিছু দেখবার তো উপায় নেই, মাঝে মাঝে গুনতি করে হিসাব মেলায়, একুনে মোট বারো জন। একে একে নাম ধরে

ডাক দিয়ে যায় আলি নেওয়াজ, গোলাম রসুল, আছিস? আছি দোস্ত, আছি। কুদ্দুস মিয়া?—আছি। মালতে ভাই, আছিস তো রে?—আছি। কালীচরণ, কোন্ দিকে তুই আছিস রে?—আছি এখনো, বেঁচে আছি। বেশ, বেশ, কটা হল? চারটে, না পাঁচটা, না কি ছটা হল রে? ওই যাঃ—ভুলে গেলুম বেবাক।

গায়ে গায়ে হাত রেখে গুনতে থাকে আলি নেওয়াজ। অন্ধকারে বারে বারেই ভুল হয়ে যায়। একটা গায়ে দুবার গিয়ে হাত ঠেকে। দূর থেকে আবার কাউকে হয়তো ছোঁয়াই গেল না, গুনতির মুখে বাদ পড়ে গেল মানুষটা। তা হলে আর হিসেব মেলে কেমন করে? নতুন করে আবার হাঁক দিয়ে যায় আলি নেওয়াজ, গোলাম রসুল, আছিস? গলা খাঁকরে সাড়া দেয় গোলাম রসুল, আছি। এক হল। কুদ্দুস মিয়া?—আছি। এই হল দুই। মালতে ভাই, ঠিক আছিস তো? আছি দোস্ত, আছি। কালীচরণ বাগতি?......

এই ভাবে ঠিক হাঁক দিয়ে দিয়ে গুনতি করে আলি নেওয়াজ। বারোজনের হাজরি মেলায় গায়ে গায়ে হাত ঠেকিয়ে। একুনে মোট বারো জন। ঠিকই আছে মুড়ো গুনতি, এতক্ষণে নিশ্চিন্ত, পড়ো গ্যালারির আদমসুমারি খতম।

গোলাম রসুল বলে উঠে ওপাশ থেকে, এখনো তাহলে বেঁচে আছি, সব কটাই আমরা বেঁচে আছি এখনো! কদিন যে এমন করে বাঁচব, খোদাতালাই জানে।

কালী বাগতি একটু হতাশভাবে বলে উঠে, পিথিমীটা উলটপালট হয়ে গেল নাকি রে। পেল্লায় কাণ্ডে কুপোকাত হয়ে মাটির সঙ্গে মিলিয়ে গেল নাকি দুনিয়াটা। ধাওড়াগুলো আমাদের ঠিক আছে কি না কে জানে।

ঠিকই আছে ধাওড়াগুলো। প্রলয় ঘটেছে খাদের নীচে। দুনিয়ার তাতে এমন কিছু ক্ষতি হয় নি। পৃথিবীর বুকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ঠিকই চলছে। দিনের বেলা সূর্য উঠে, রাত্রিবেলা চাঁদ। খাদমোয়ানে জলনিকাশের কাজ চলছে পুরোদমে। সেসব খবর কিছুমাত্রই জানা নেই এদের। কতদিন যে এরা আবদ্ধ আছে বন্যাপ্লাবিত এই খাদের নীচে, সে কথাও এরা জানে না। কে জানে কদিন হল। কেউ বলে দুদিন, কেউ বলে তিন দিন, কেউ কেউ বা আন্দাজ করছে দিন চার-পাঁচ হয়েই গেল বুঝি।

যদি ওরা জানত যে এক নাগাড়ে পক্ষাধিক কাল এইভাবে ওরা পড়ে

আছে অন্ধকার এই পাতালপুরীর মধ্যে—তা হলে কি আর বাঁচত কেউ। হাতে যদি ঘড়ি থাকত, থাকত যদি পাশে ঝুলোনো ক্যালেণ্ডার, আর তাদের দৈনন্দিন হিসাবনিকাশের সঠিক কোন নিরিখ যদি থাকত এদের হাতে, তা হলে এরা বাঁচত না। বহু আগেই কুঁকড়ে হয়ত মরে যেত। সময়ের পরিমাপ সম্বন্ধে এদের এই অপরিমেয় অজ্ঞতাই মনস্তাত্ত্বিক রক্ষা-কবচের কাজ করেছে। অজ্ঞতা নয় মহাজ্ঞান, বেঁচে থাকার সাধনায় মৃত্যুমেধ এই মহাযজ্ঞে সমিধ যুগিয়েছে অজ্ঞতারূপী কালান্তক এই মহাজ্ঞান।

ধপ করে কে লুটিয়ে পড়ল মাটির উপর। কে রে, এমন করে নেতিয়ে পড়লি যে! মালতে ভাই, কি হয়েছে?

আলতাব মিয়া তাড়াতাড়ি ধরে ফেললে সোনাইকে। তবিয়ত একেবারে ভেঙে পড়েছে সোনাইয়ের। ওদিকে আবার ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে কাঁদছে কে? নাকি নাক ডাকছে গোলাম রসুলের?

কালীচরণ বলে উঠল, আঃ—কুদ্দুস মিয়া না কে রে? কাদা ভড়ভড়ে ঠ্যাং দুটো যে বড চাপিয়ে দিলি কোলের ওপর! এ আবার কি আদিখ্যেতা রে।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল কুদ্দুস মিয়া। হি-হি করে হেসে উঠল নিজের মনেই। হাসতে হাসতে অন্ধকারে গড়িয়ে পড়ল কালীচরণের কোলের ওপর।

আলি নেওয়াজ হাঁক দিলে, কুদ্দুস!

আবার সেই হি-হি হি-হি। হাসি যেন আর থামে না। আবার বুঝি বাতিকে চড়ল কুদ্দুস মিয়ার। লোকটাকে নিয়ে বিপদ হল যে!

ধমকে উঠল আলতাব। লোকগুলোকে পাগল করে ছাড়বে না এই কুদ্দুস মিয়া। এই সমস্ত অবুঝ মানুষকে কতক্ষণ আর সামাল দেওয়া যায়?

ঠাণ্ডা মেরে গেল কুদ্দুস মিয়া আলতাবের ধমক খেয়ে। আলতাব কিন্তু সত্যি সত্যি এবার চিন্তিত হয়ে পড়ল। একা শুধু কুদ্দুস বা সোনাই মালতেই নয়, মনে মনে ভেঙে পড়েছে সবগুলোই। আলতাব মিয়ার মুখের কথায় আর ওদের কোন আস্থাই নেই। দলের সর্দার আলতাব মিয়া, এতগুলোকে চালিয়ে এসেছে এতাবৎকাল। আজ কিন্তু সে একেবারেই অচল হয়ে উঠল বুঝি। জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আলতাব কি শুধু ধাপ্পাই দিয়ে এল এদের? তা হয়তো দিলে কিছুটা, দিতেও হবে শেষ পর্যন্ত, যতক্ষণ না মরণ এসে ধুকধুকে এই জীবনটুকু জোর করে কেড়ে নিয়ে যায়। ধরতে গেলে দুঃখু কি তার নিজেরই কিছু কম? মা-বুড়ী তার মরণ-পথের যাত্রী, ছেলের

লেগে ভেবে ভেবে অ্যাদ্দিন হয়তো মারাই পড়ে গেল। সন্তান হবে আলতাবের বৌয়ের। মা-বাপের এই প্রথম সন্তান। সে বাচ্ছার মুখ হয়তো আর দেখতে পেলে না আলতাব মিয়া। যমপুরীর এই অন্ধ কারা থেকে জান থাকতে খালাস পেলে তো!

একটু বুঝি গোলমাল ঠেকছে এই আলতাব মিয়াকে নিয়ে। ফুলে ফেঁপ্‌সে চানকের জলে ভেসে উঠেছিল আলতাবের বিকৃত মৃতদেহ। তার ভাই যে তাকে নিজের হাতে কবর দিতে নিয়ে গেছে, নিজের চোখে মৃতদেহ সনাক্ত করে। অথচ এখানে আলতাব মিয়া জলজ্যান্ত বেঁচে। মরবার আগেই কবর দেওয়া হয়ে গেছে বেচারীকে, গোলমাল একটু ঠেকবারই কথা। ভুল হয়েছে মৃতদেহ সনাক্ত করতে।

মালকাটা ওই কালীচরণ বাগতির অবস্থাটা আরও সঙিন। ওদিক থেকে মঞ্জরী যে নিকে করে বসে আছে, কালীচরণকে শেষ করেছে মাটি চাপা দিয়ে। সেই দুঃখেই কালী বুঝি গা-ঢাকা দিয়ে বসে আছে খাদের নীচে। নিকে যদি করতে হয় তো করুকগে। তার জন্য আর কালীচরণকে সরকারী দোলায় চড়ে গাড়ুই নদীর ধারে গিয়ে কবরের মধ্যে সত্যি সত্যি ঢুকে পড়তে হয় নি। এখানে বেশ আরামেই আছে কালী। কয়লা কাটার দায়িত্বটুকু পর্যন্ত কোম্পানী থেকে আপাতত মকুব করে দেওয়া হয়েছে। এ কথা কেউ না জানলেও এরা তো সব জানে। আলতাব মিয়া আর আলি নেওয়াজ, মালতে ভাই আর গোলাম রসুল, এরাই যে সব জলজ্যান্ত চাক্ষুষ প্রমাণ। তা হলে আর ওসব কথা আসে কেমন করে?

সোনাই মিয়া অসুস্থ। গা-টা একটু গরমেছে। বহু দিনের সুখ-দুঃখের সঙ্গী, আলতাব মিয়ার বিশ্বস্ত অনুচব, আজ্ঞাবাহী ভৃত্যের মত। মরণের পথে আর একটা ধাপ এগুলো বুঝি সেনাই। তা না হলে এ অবস্থায় জ্বল আসবে কেন?

আলতাব মিয়া সোনাইয়ের গায়ে হাত বুলোতে লাগল। পানি খাবি, পানি একটু খাবি নাকি সোনাই?

বিরক্তির সুরে বলে উঠল সোনাই মিয়া, থাক, পানি আর খাব না। পানি নয়, এ দুশমন, ও পানি আর মুখে দিতে চাই না।

আখের কথা ভেবে নিয়েছে সোনাই। পানি নয়, দুশমন। কিন্তু কথাটা তার পুরোপুরি সত্য হল কি?

খাদ ডুবেছে বর্ষার ভাঙনে। কুল কুল প্রবাহিনী উন্মাদিনী চামুণ্ডার মত

লক্ষ হাতে করতালি দিতে দিতে বিপুল বেগে ধেয়ে এসেছে সুড়ঙ্গ পথ বেয়ে। সেই সঙ্গে ঠেলে এনেছে সুড়ুংঠাসা উন্মুক্ত বায়ুপ্রবাহ। পুঞ্জীভূত বায়ু চাপের সৃষ্টি করে বুক দিয়ে এদের ঘিয়ে রেখেছে। তাই থেকে আজও নিঃশ্বাস টানছে মানুষগুলো। ক্ষিদে পেলেই আঁজলা ভরে খেয়েছে এই বেনোজল। তেষ্টা পেলেই পান করেছে আংখে ভরে। এর জোরেই যে বেঁচে আছে লোকগুলো। জল নয়, মৃতসঞ্জীবনী। পানীয় নয়, মা জননীর স্তন্যধারা। মাতৃস্তনের অমোঘ শক্তি সঞ্চিত এর কণায় কণায়। ধন্বন্তরীর ভেষজ হয়ে মার বুকের এই মুক্তধারা সোনাইকে যে চাঙ্গা করে দেবে না, এমন কথা জোর করে কেউ বলতে পারে কি?

আলতাব মিয়া ভাবছে। পানি নয়—পীযূষধারা, জল নয়—মা জননী। অনেক কিছু দিয়েছে যে, আঁজলা ভরে যুগিয়েছে অফুরন্ত স্নেহধারা, তৃষিত আর বুভুক্ষুদের একমাত্র বেঁচে থাকার রসদ। এখন যদি মা জননী টইটম্বুর গ্যালারির এই ছাদের নীচে থেকে একটুখানি পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ান, তা হলে তাঁর অপরিমেয় এই দানের কথা কোন দিন কি ভুলতে পারবে কোণ-ঠাসা এই কয়লাকাটা মানুষগুলো?

সোনাইয়ের কথা শুনতে চায় না আলতাব মিয়া। জল নাকি আবার দুশমন হয়! মৃদুকণ্ঠে বললে, পানি একমগ ডুবিয়ে আন ভাই আলি নেওয়াজ, মালতে ভাই যে একেবারে নেতিয়ে পড়ল।

আলি নেওয়াজ হাতড়াচ্ছে। ভিজে ডাঙ্গায় হাতড়াচ্ছে। এক হাতে তার মগবাতির খোল। গুঁড়ি বেয়ে এগিয়ে গেল পুরো একটি বাঁও। হাতে কিন্তু ঠেকল না কিছুই। অবাক হয়ে বলে উঠল আলি নেওয়াজ, তাই তো রে, এ আবার কি ভূতুড়ে কাণ্ড, জলটা তো কই হাত বাড়িয়ে ছোঁয়া যাচ্ছে না!

চমকে উঠল আলতাব। কেমন যেন একটা সন্দেহ হল তার। এগিয়ে গেল তাড়াতাড়ি। আলি নেওয়াজ বলে কি?

হাতের কাছে জল নেই! গুঁড়ি বেয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে গেল আলতাব। জল ছুঁলে গিয়ে হাত পাঁচ-ছয় দূরে। মনের আবেগে চিৎকার করে উঠল আলতাব মিয়া, জল কমছে, জল কমছে ভাইসুব। সরজমিনে চালু হয়ে গেছে কোম্পানীর পাম্প।

জল কমছে? সত্যিই জল কমছে নাকি! চমকে উঠল সব একসঙ্গে। নব জীবনের ডাক এ যে, অন্ধকারে আলোর ঝিলিক।

উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল মুমূর্ষু ওই মালকাটা পাথরকাটার দল। জল কমছে

খাদের নীচে। কমছে নাকি, কতটা জল কমল? সত্যি সত্যি সরে গেল নাকি সামনে থেকে?

হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে। ব্যাঙের মত লাফ দিয়ে দিয়ে এগোচ্ছে। হাত-পাগুলো ক্ষয়ে গেছে, হেজে গেছে জলে-কাদায়; আঙুলের ফাঁকে দগদগে ঘা। জ্বালা কিন্তু করছে না আর, এগিয়ে চলল মরীয়া হয়ে। জল কমছে, জল কমছে, ইয়া আল্লা।

ডাক দিচ্ছে আলতাব মিয়া, এগিয়ে আয়, সামনের দিকে সব এগিয়ে আয়। পিছন দিকে তাকাস না আর, সামনের দিকে এগিয়ে আসার সময় হয়েছে। আল্লা বুঝি সত্যি সত্যি মুখ তুলে চাইলে রে।

কালো কয়লার চাতালে বসে দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল জন দুই-তিন। ঠেলা মেরে মেরে জাগিয়ে দিলে আলি নেওয়াজ, উঠে পড ভাই উঠে পড়, ঘুমোবার আর সময় কোথায়, খাদের জল যে কমতে শুরু হয়েছে!

—অ্যাঁ—তাই নাকি?

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল লোকগুলো। এগিয়ে চলল হেজে যাওয়া হাতের চেটো আর পায়ের পাঁজে ভর দিয়ে। জান কবুল করে এগোচ্ছে। একসঙ্গে সব জুটল গিয়ে জলের ধারে। হাত ঠেকিয়ে দেখে নিলে জল কদ্দুর কমল! জীবন যেন জুড়িয়ে গেল শীতল জলের স্পর্শে। পিছিয়ে চল—পিছিয়ে চল মাগো, চানকমূলটা দেখিয়ে দে মা তাড়াতাড়ি। ডুলি বেয়ে আমরা ওপরে উঠব যে।

জলের ধারে গিয়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল কালীচরণ বাগতি। পাম্প চলছে খাদের ওপর, অবধারিত পাম্প চলছে, তা না হলে এই জল কি কমে? এই তো খানিক কমেছে, হাত পাঁচ-ছয় কমে গেছে খাদের জল, কমতে কমতে আর খানিককে একেবারে ফর্সা। তার পর আর কালী বাগতিকে পায় কে? খাদমোয়ান থেকে সিধে একেবারে ধাওড়ায়। দূর থেকে একটা ছড়া গাইতে গাইতে হুমড়ি খেয়ে পড়বে কালী একদম গিয়ে রসের কুপোয়। তাক লাগিয়ে ছেড়ে দেবে রসবতী মঞ্জরীকে। এখান থেকে একটুখানি সটকাতেই যা দেরি।

গদগদ হয়ে হেঁকে উঠল কালীচরণ, জয় মা কালী, মাগো—এই অধম সন্তানকে এবারটির মতন টেনে হিঁচড়ে কোনরকমে তরাও মা।

জ্বরটা হঠাৎ ছেড়ে গেল নাকি সোনাই মালতের? একটু যেন চাঙ্গা হয়ে

উঠেছে, তাজা গলায় বলে উঠল সোনাই, কালী, কালী রে !

স্থর ভাঁজছে কালীচরণ। জোর গলায় হঠাৎ ধরে ফেললে এক শ্যামা সঙ্গীত—

"মুক্ত কর মা মুক্তকেশী।
ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি ॥
কালের হাতে সঁপে দিয়ে মা, ভুলেছ কি রাজমহিষী।
তারা, কতদিনে কাটবে আমার এ দুরন্ত কালের ফাঁসি ॥"

গাইতে গাইতে উদ্দাম হয়ে উঠল যেন কালীচরণ বাগতি। আলতাব মিয়া হাটুভোর জলে দাঁড়িয়ে সাড়া দিলে, কালীচরণ, এখন থেকে এত পাউসে গেলি কেনে রে। জল কমাকমির হদিসটা তাই বুঝতে দে আগে ভাল করে।

কালীচরণ উঠে দাঁড়াল। জল ভেঙে ভেঙে এগিয়ে গেল চবং চবং করে। আলতাব মিয়াকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, সাঙাত।

এ কি, আলতাবকে কাঁধে তুলে নাচবে নাকি কালীচরণ। একসঙ্গে দুজনেই হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়ল এক হাঁটু ভর জলের ওপর।

আলতাব মিয়া হেঁকে উঠল, কেলে !

হা হা করে হেসে উঠল কুদ্দুস মিয়া, উৎকট একি গিলে-চমকানো হাসি। হেসেই চলল একটানা—হা-হা-হা-হা-হা-হা-হা-হা—। হঠাৎ যেন থর থর করে কেঁপে উঠল পাতালপুরীর জমাট বাঁধা অন্ধকার।

কে হাসছে, কে হাসছে হা-হা করে ? কুদ্দুস, না কুদ্দুস মিয়ার শিয়রস্থ মহাকাল ? হা হা করে এত হাসে কেন ?

পড়ো গ্যালারির অন্ধকারকে তেড়ে ফুঁড়ে হাওয়ার বুকে লুটোপুটি খাচ্ছে যেন অদৃশ্য এক প্রেতমূর্তি—হা-হা-হা-হা-হা-হা-হা-হা—।

হকচকিয়ে উঠল হঠাৎ অতলস্থ খনিগহ্বর।

॥ ৮২ ॥

পাম্প চলছে সারফেসের ওপর। জল কমছে ধীরে ধীরে। ইঞ্জিনয়ার ফিটার মিস্ত্রী কুলি মজুর চব্বিশ ঘণ্টা লেগে আছে জলনিকাশের কাজে। দেরিতে হলেও জল কিন্তু কমছে এবার, টান পড়েছে খাদের জলে। চানক ভরতি বেনোজল নীচের দিকে নামতে শুরু করেছে। হিম্মত সিং-এর পাঞ্জাবী গ্যাং হাজির আছে শুরু থেকেই। ঢাবার চড়ে পাইপ জুড়ছে, চানকের নীচের দিকটায়। সঙ্গে আছে জোরালো গ্যাসবাতি, অন্ধকারে কাজ করতে। চানকের জলে ডুব মারতে বা ঢাবার নীচে মদত দিতে লেগে আছে তেজা সিং 'আর গুরদিত কাউর। জল তো এবার কমে এল, বড় জোর আর দু-একটা দিন। তার পর এদের ছুটি। সুড়ুং ঠাসা মুর্দাগুলো, মুর্দা নয় আর কঙ্কাল, টেনে হিঁচড়ে ঢাবায় করে সরজমিনে তুলে দিতে পারলেই ডিউটি এদের খতম। তার আর বেশি দেরি নাই, খাদের জল প্রায় হয়ে এল বলে।

ধাওড়াগুলো সজাগ হয়ে উঠেছে। এবার হয়তো মালকাটারা উঠবে। কোন্ চেহারায় কে উঠছে কে জানে। লাসগুলো সব সনাক্ত করে নিয়ে যেতে হবে। নিয়ে যেতে হবে শ্মশানঘাটে, বাদবাকিদের কবরখানায়। বাঁশের মাচা তৈরি আছে খাদমোয়ানে।

সরকারী রেসক্যু পার্টি ঝিমিয়ে পড়েছিল মাঝখানটায়। তৎপর হয়ে উঠল আবার স্টীল হেলমেট মাথায় দিয়ে।

লোকগুলোকে সত্যি সত্যি এবার রেসক্যু করতে হবে যে। সারফেসের কাজ শেষ হয়ে আসছে। আণ্ডারগ্রাউণ্ডের অবস্থাটা পিটবটম থেকে উঁকি মেরে একটুখানি দেখে আসা যেতে পারে। এখন অবশ্য রেসক্যু করবার আর নেই কিছু। এখন যেটুকু দরকার—তার জন্য মুদ্দফরাসরাই যথেষ্ট।

কুদ্দুস মিয়া হঠাৎ আবার নিঝুম মেরে গেল কেন। হা-হা হি-হি যাহোক কিছু করছিল তাও মাঝে মাঝে। জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছিল। বিড় বিড় করে কথা বলছিল মেয়ের সঙ্গে। তার পর থেকে চুপচাপ। বাতিকগুলো একেবারেই উপে গেল যে। ভালমন্দ কিছু ঘটবে না তো কুদ্দুস মিয়ার।

আলি নেওয়াজ সাড়া দিলে, কুদ্দুস!

জলেয় ধারে হাঁটুর ওপর মাথা গুঁজে চোখ বুজে একটু আরাম করছিল কুদ্দুস মিয়া। সাড়া দিলে আলি নেওয়াজের ডাক শুনে, ঠিক আছি, ঠিকই

আছি খোস্ত। আমার জন্যে কোন ভাবনা নাই তোদের।

সোনাই কিন্তু ভাবনায় ফেলেছে। নেতিয়ে পড়েছে জরো গায়ে। বাকি-গুলোও তাই, তবিয়ৎ সব ভেঙে পড়ছে একে একে। চারিদিকে শুধু পলি-মাটির কাদা। জল আর কাদা ঘেঁটে ঘেঁটে ক্ষয়ে গেল যে হাত-পাগুলো, হেজে মজে চুপসে গেল অষ্টাঙ্গ। আর হয়তো বেশিক্ষণ যুঝতে হাব না। ফুরিয়ে আসছে পিদিমের তেল, একেবারে তলায় গিয়ে ঠেকেছে, একে একে এবার নিবলেই হয়। তার পর সব ফক্কিকার, তুনিয়াদাবি খতম। জল কতটা কমল বা না কমল—আর কাউকে দেখতে হবে না।

একে একে লুটিয়ে পড়ছে কালো কয়লার চাতালে। অবসন্ন দেহের বোঝা আর যেন কেউ টানতে পারছে না। চানকমূল আর কতদূর, এইখানেই যে তার আগে মাটি নিতে হল।

গোলাম রসুল ভাবছে একটা কথা। পথ ইস্তক কতখানি আসা হল—মাপজোখ করে একবার দেখে নিলে কেমন হয়। একটু যেন ভয়ে ভয়েই বললে, বাঁও দিয়ে কেউ সুড়ুংটা একবার মাপতে পারিস রে, চানকমূলের হদিসটা কেউ দিতে পারিস মেপেজুখে।

কে মাপবে অন্ধকার এই সুড়ঙ্গপথের দূরত্ব। তাও কখনো সম্ভব নাকি। কালীচরণ বলে উঠল, তুই যে ভারি কম্পাসের বেটা কম্পাস, সুড়ুং মেপে হদিস করে দিবি। গুটেক বাজে বকিস না।

ফোঁস করে উঠল গোলাম রসুল, কেলে, তোর কথার এত ডাঁট কিসের রে!

মরতে মরতেও কেজিয়া। ধমক দিলে একটা আলতাব মিয়া, আবার তোরা বকবকানি শুরু করলি। এবার তোরা মরবি, কাব সাধ্যি তোদেরকে আর বাঁচায়।

কে বাঁচাবে? আলতাব মিয়া খাঁটি কথাই বলেছে। খাদ ভরতি পানি, আর সুড়ুং ভরা অন্ধকার। এর হাত থেকে কে বাঁচাবে? সামনে থেকে জল শেষতক সরলে তো।

এরা জানে না যে জল কমবার শুরু থেকে অন্ধকার এই সুড়ঙ্গপথ বেয়ে প্রায় আড়াই হাজার ফুট এরা মরতে মরতে এগিয়ে এসেছে। বাকি মাত্র নব্বই ফুট, তার পরেই চানক। পাম্প যদি শেষ পর্যন্ত বিগড়ে না যায় তা হলে এরা বেঁচে গেলেও যেতে পারে। চানকমূল আর নব্বই ফুট দূরে। কিন্তু সে কথা এরা জানে না কেউ। অথৈ জলের আড়াল থেকে এসব খবর জানবার যে কোন উপায় নেই।

হতাশ হয়ে ধুঁকছে সব। এই বুঝি ঘনিয়ে এল জীবনের শেষ মুহূর্ত। চারিদিকে শুধু অন্ধকার, নিকষ কালো অন্ধকার। অন্ধকার নয় মরণ, আঁধারবরণ নিঠুর মরণ এগিয়ে আসছে। পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছে জীবনসুধা হরণ করতে। অন্ধকারের কফন ঢাকা দিয়ে ফেলে যাবে শুধু মুর্দাগুলোকে। তাই আসে তো আসুক, তিলে তিলে এই অন্ধকূপে ডুবে মরার চেয়ে সেও যে অনেক ভাল।

সুড়ঙ্গের কোণে কোণে হাওয়ার বুকে গুমরাচ্ছে যেন অবরুদ্ধ পাতালপুরীর অন্তিম নাভিশ্বাস।

আলতাব কি ভাবছে যেন। হাওয়ার বুকে কান পেতে আছে। আলি নেওয়াজ মাঝে মাঝে প্রেতের মত ঘুরে বেড়ায় অন্ধকার এই পাতালপুরীর মধ্যে। ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ওঠে জলের বুকে। মাঝে মাঝে থেমে যায় সে জলের আওয়াজ। লোকটা আবার ফিরে এসে হঠাৎ কখন মিশে যায় এই দলের সঙ্গে। কি মতলবে ঘুরে বেড়ায় কে জানে। হয়ে গেল তো অনেকক্ষণ, আলি নেওয়াজ কই ফিরল না তো এখনো। উঠে একটু দেখতে হল আলতাবকে।

জল ঠেলে ঠেলে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে আলি নেওয়াজ। দাঁড়িয়ে আছে এক জাং জলের ওপর। কচ্ছপের মত মুখ বাড়িয়ে কি যেন লক্ষ্য করছে। ক্ষীণ একটা কিসের যেন আওয়াজ, কানের মধ্যে ঠেকছে এসে। কিসের আওয়াজ ওটা, খাদের নীচে আওয়াজ কিসের। নাকি কান ভোঁ-ভোঁ শুরু হল আলি নেওয়াজের।

এগিয়ে গেল আরও খানিক। গ্যালারির খাদ থেকে জল কি একটু নামল? ঈষৎ যেন একটুখানি ফাঁক হয়ে গেছে। দূর থেকে একটা আলোর রেখা ফুটে উঠল আলি নেওয়াজের চোখের সামনে। কিসের আলো ওটা? ছেতোপড়া অন্ধ চোখে ভুল দেখছে না তো আলি নেওয়াজ। আলো আসে কোত্থেকে, ওইটাই কি চানকের মুখ নাকি?

আলি নেওয়াজের সারাদেহে কাঁটা দিয়ে উঠল। আঁকুপাঁকু করে এগিয়ে গেল আরও খানিকটা, দাঁড়াল গিয়ে একবুক জলে। হাতুড়ি পেটার শব্দ উঠছে কোথায় যেন। চোখের সামনে চিক চিক করছে কি ওটা? মৃদু একটা আলোর ঝিলিক, স্পষ্ট এবার চোখে পড়ল আলি মিয়ার। ওই কি তবে চানকমুখ!

পিছন ফিরে চিৎকার করে উঠল আলি নেওয়াজ, আলো—আলো—চানকমূলে আলো দেখা যায়!

এগিয়ে গেছে আলতাব মিয়া, আলি নেওয়াজের খোঁজে। চমকে উঠল আলি মিয়ার চিৎকার শুনে। সাড়া দিয়ে উঠল তাড়াতাড়ি, কোথায় আলো, কিসের আলো, আলো কিসের রে আলি নেওয়াজ?

আরও খানিকটা এগিয়ে গেল জল ঠেলে ঠেলে। আলি নেওয়াজের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। মুখ বাড়িয়ে দেখছে, দুজনেই দেখছে। বাজপাখীর মত তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে কি যেন একটা অবাক হয়ে দেখছে। আলোই বটে, নির্ঘাত আলো। ওই কি খাদের চানকমূল?

ওই খাদের চানকমূল। ওই পথ দিয়েই ডুলি নামে খাদের নীচে। চানকপথে ঢাবা নামিয়ে কাজ করছে হিম্মত সিংয়ের দল। পাইপ জুড়ছে পিটবটমের কাছাকাছি। গ্যাসবাতির জ্বলজ্বলে আলো ঠিকরে পড়ছে জলের ওপর।

আলি নেওয়াজ আরও খানিক এগুলো। দাঁড়াল গিয়ে একগলা জলে। এবার আর কোন সন্দেহই নেই, চানকমূলই বটে। পিছন ফিরে তাকাল, জল ঠেলে ঠেলে এগিয়ে আসছে আলতাব মিয়া। আলি নেওয়াজ ডাক দিচ্ছে, এগিয়ে আয়, এগিয়ে আয় আলতাব মিয়া, ডুলি বেয়ে যদি ওপরে উঠবি এগিয়ে আয়। ওই তো চানক, চানকমূলে প্রায় এসে পড়েছি।

তাই নাকি? কত দূরে—কত দূরে আলি নেওয়াজ, চানকমূল আর কত দূরে বল দেখি?

খুব কাছেই। ওই ত্যাখ চানকের আলো। হাতুড়ি পেটার শব্দ হচ্ছে, শুনতে পাচ্ছিস না!

আর কোন সন্দেহ নেই। গ্যালারির ছাদ থেকে জল একটু নেমেছে। তারি ফাঁকে চানক দেখা যায়। থর থর করে কাঁপছে যেন আলতাব মিয়া। আল্লার দয়ায় এযাত্রা ওরা বেঁচে গেল হয় তো।

চাপা গলায় বলে উঠল আলি নেওয়াজ, আয়, তাড়াতাড়ি চলে আয়, ডুলিতে গিয়ে উঠে পড়ি আমরা। তুই আর আমি, আমরাই তো সবচেয়ে সমর্থ আছি এখনো। ডুলি যদি পাওয়া যায়—ঠিক আমরা উঠে যেতে পারব।

আলতাব মিয়া অবাক হয়ে ভাবছে। পথভ্রষ্ট বিভ্রান্ত আলি নেওয়াজকে ডীপ সেকশনের দিক থেকে টেনে এনে অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে সেদিন বাঁচিয়ে দিয়েছিল আলতাব মিয়া। জোর করে টেনে এনেছিল রাইজ

সেকশনের দিকে। তাই বুঝি এ কৃতজ্ঞতা আলি নেওয়াজের। আলতাব মিয়াকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়। আলতাব যে তার জীবনদাতা।

আলি নেওয়াজ ডাক দিচ্ছে, আয়, এখনো দাঁড়িয়ে আছিস কেনে, শিগ্‌গির চলে আয়।

আলতাবের মনের মধ্যে হঠাৎ যেন খেলে গেল এক তড়িৎ-প্রবাহ। ক্ষিপ্রতর হয়ে উঠল ধমনীর স্পন্দন। মহামুক্তির উদাত্ত আহ্বান, নবজীবনের অনিবার্য আশ্বাস। আলি নেওয়াজ ডাক দিচ্ছে, চলে আয়, তাড়াতাড়ি চলে আয়।

পিছন ফিরে তাকাল একবার আলতাব মিয়া। অন্ধকারে পড়ে পড়ে ধুঁকছে পিছনের ওই লোকগুলো। কি ভেবে যেন বলে উঠল আলতাব মিয়া, আর ওরা—পিছনে যারা পড়ে রইল ঘুটঘুটে এই অন্ধকারে মধ্যে! ওদের ফেলে আমি যাই কেমন করে আলি নেওয়াজ?

পৃথিবীর মাটির গন্ধ পেলে নাকি আলি নেওয়াজ? পাতালপুরীর সহচরদের ভুলে গেল নাকি এর মধ্যেই। ঈষৎ একটু তর্জন করে বলে উঠল আলি মিয়া, যদি বাঁচতে চাস তো আর দেরি করিস না, ওদের কথা এখন থাক।

আলতাব মিয়া একটু বিস্মিত কণ্ঠে বললে, সে কি কথা আলি নেওয়াজ, ওদের ফেলে আমি চোরের মত পালাই কেমন করে? তা তো হয় না।

আলি নেওয়াজ একটু বিরক্তির সুরে বললে, ওরা না হয় একটু পরেই উঠবে। ওদের লেগে এত ভাবছিস কেনে? ওই শোন চানকমূলের ডাক। বেয়াকুবি করবার এটা সময় নয়। আয়, তাড়াতাড়ি চলে আয়, আমরা তো আগে ডুলি ছুঁয়ে বাঁচি।

কোথায় যেন একটা চিড় ধরল আলতাব মিয়ার মনের মধ্যে। গম্ভীর হয়ে বলে উঠল আলতাব, এতই যদি জীবনের মায়া, তা হলে আর দেরি কেনে আলি নেওয়াজ, এগো তুই। মোদ্দা ওদের ফেলে আলতাব মিয়া এখান থেকে একটি পাও আর এগোবে না।

আলতাব মিয়ার কটাক্ষ বিঁধল গিয়ে আলি নেওয়াজকে। ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে উঠল আলি মিয়া, যা তো হলে একসঙ্গে সব জাহান্নামে। আমি কিন্তু এগুলাম।

ধিক্কারের সুরে বলে উঠল আলতাব মিয়া, বেইমান, বেইমান কোথাকার। পরদেশী আদমী কি না, তাই! কিন্তু এরা যে আমার গাঁয়ের লোক, আমার পড়শী, আমার ভাই বন্ধু দোস্ত। এখান থেকে বেরিয়ে যাবার আগে এদের

কথা আমি ভুলব কেমন করে ?

আলি নেওয়াজ কেটে পড়েছে। ধীরে ধীরে পিছু হঠল আলতাব। সঙ্গীদের যে তাড়াতাড়ি গিয়ে সংবাদটা দেওয়া দরকার। জল ঠেলে ঠেলে এগোচ্ছে। দাঁড়াল গিয়ে আর সকলের সামনে। ক্ষিপ্রকণ্ঠে বলে উঠল আলতাব মিয়া, ওরে তোরা ওঠ, চানকমুলে আলো দেখা গেছে, এবার হয়তো ডুলি বেয়ে উঠে যাব আমরা।

পাতালপুরীর মৃতদেহগুলো গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল যেন। তাই নাকি, তাই নাকি আলতাব মিয়া, চানকমূলে আলো—আলো দেখা গেছে ? তা হলে আর চিন্তা কি, ইয়া আল্লা—।

তৈরি হচ্ছে চানকমূলে আলো দেখবার জন্য। চানকের আলো নয়—দুনিয়ার আলো, চাঁদ তারা সূয্যির আলো। এবার হয়তো দু চোখ ভরে দেখতে পাওয়া যাবে। তারই বুঝি ডাক পড়ল।

সার দিয়ে সব এগোচ্ছে, আলতাব মিয়ার পিছু পিছু। চবং চবং শব্দ উঠছে জলের ওপর।

চানকমূলের পথ ধরে এগিয়ে গেছে আলি নেওয়াজ। এদের সঙ্গে সত্যি সত্যি বেইমানি করে গেল নাকি লোকটা ? না, বেইমানি ঠিক বলা যায় না একে। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে এই চরমতম সঙিন মুহূর্তে যে কোন এক মহাপ্রাণ ব্যক্তির পক্ষে এর চেয়ে আর বেশি কিছু করা সম্ভব ছিল কি না, সে কথা কেউ জোর করে বলতে পারে না। বেইমানি সে করে নি, মরণপুরীর অন্ধকারা ভেঙে জীবন-দুয়ার খুলে দিতে গেছে।

গ্যালারির ছাতের সঙ্গে কোনরকমে নাকের ডগাটা ঠেকিয়ে ওপর দিকে মুখ করে জল ঠেলে ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছে আলি নেওয়াজ। জল হয়ে গেছে একগলা। চানকের প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে, এগোতে হবে আর একটুখানি। এবাব কিন্তু ডুবুজল, চানকের ঠিক মুখটার কাছে। ওটুকু আর এগোতে পারছে না, এগোতে গেলেই ডুববে যে। দেহটাকে একটুখানি কুঁকড়ে থমকে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল আলি নেওয়াজ। গুন্ গুন্ করে কিসের যেন আওয়াজ হচ্ছে না ? কারা যেন আড়াল থেকে কথা বলছে !

একগলা জলে দাঁড়িয়ে চানকের দিকে মুখ করে চিৎকার করে উঠল হঠাৎ আলি নেওয়াজ, বাঁচাও—বাঁচাও—কে কোথায় আছ বাঁচাও।

ঝুলন্ত চাবার উপর বসে কাজ করছিল ফিটার মিস্ত্রীর দল। একসঙ্গে সব

চমকে উঠল, মানুষের গলার আওয়াজ শুনে। অন্ধকার এই প্রেতপুরীতে হঠাৎ ও কার কণ্ঠস্বর? ভূত প্রেত মামদো কিছু? নাকি কোন মানুষ?

গ্যাসবাতির আলোটা আর একটু নীচের দিকে নামিয়ে দিলে তাড়াতাড়ি। মুখ বাড়িয়ে প্রশ্ন করলে একজন, কে, কোন্ হ্যায় হুঁয়া!

মানুষের সাড়া পেয়ে প্রাণপণ শক্তিতে চিৎকার করে উঠল আলি মিয়া, আমি আলি নেওয়াজ—মালকাটা আলি নেওয়াজ। আড়াল থেকে কথা বলছ কে দোস্ত, হাতটা একটু বাড়াও না এইদিকে!

কলিয়ারি ডুবে আছে একুশ দিন ধরে। পুরো তিনটি সপ্তাহ। হঠাৎ এ আজ কার হাতে হাত বাড়াতে হবে। কে চিল্লাচ্ছে, মানুষ না আর কিছু?

ঢাবাসুদ্ধ লোকগুলো হকচকিয়ে উঠল যেন। কারো মুখে আর রা শব্দ নেই। আড়াল থেকে কথা বলছে পাতালপুরীর আগন্তুক। দলের সর্দার হিম্মত সিং ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিলে ঢাবার উপর থেকে। বললে, কোন্ হ্যায়, পাকড়ো।

একখানা শুধু হাত। হাত নয়, জবরদস্ত একখানা অসুরের পাঞ্জা। ওপাশ থেকে চোখের সামনে ভেসে উঠল আলি নেওয়াজের। ঝাঁপিয়ে পড়ল আলি মিয়া সামনের দিকে। তার জীর্ণ শীর্ণ মুঠিখানা বাঘের থাবার মত চেপে ধরলে হিম্মত সিংয়ের হাতখানাকে। টেনে হিঁচড়ে লোকটাকে ওরা তুলে নিলে ঢাবার ওপর।

জলজ্যান্ত মানুষ একটা। স্তম্ভিত হয়ে গেল ঢাবার ওপর ঝুলন্ত ওই লোকগুলো আলি নেওয়াজকে দেখে। এও কখনো সম্ভব!

আলি নেওয়াজ হাঁপাচ্ছে। ভাঙা গলায় বলে উঠল, আরো আছে. আমি ছাড়া আছে আরো এগারো জন। বেঁচে আছে ঠিক আমার মতই।

কি আশ্চর্য, মালকাটা আলি মিয়া বলে কি! সে ছাড়া আরো এগারো জন, বেঁচে আছে ডুবন্ত এই খাদের মধ্যে?

চাঞ্চল্য শুরু হয়ে গেল। ঢাবা উঠছে ওপর দিকে আলি নেওয়াজকে নিয়ে। চানক থেকেই চিৎকার জুড়ে দিলে এরা, আদমি—আদমি—জিন্দা আদমি!

পিটমাউথে উঁকি মারছে কারা যেন। সারফেস থেকে তাকিয়ে আছে নীচের দিকে। হঠাৎ এত চিৎকার কিসের? প্রশ্ন করলে কে একজন, ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া জী?

জবাব এল নীচের থেকে, আদমি, জিন্দা আদমি নিকল গিয়া কলোয়ারিসে।

সে কি, জ্যান্ত মানুষ পাওয়া গেছে কয়লা খাদের নীচে? লোকটা হঠাৎ চিৎকার জুড়লে পিটমাউথে দাঁড়িয়ে, মানুষ—মানুষ—জীবন্ত মানুষ, খাদ থেকে ওই উঠে আসছে।

কলিয়ারির যে যেখানে ছিল হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে আরম্ভ করলে। জমল এসে খাদমোয়ানে। এ আবার কি আজগুবি খবর, খাদের নীচে জ্যান্ত মানুষ! এ কথাও আজ বিশ্বাস করতে হবে নাকি?

বিশ্বাস কেউ করুক চাই না-করুক—লোক ছুটছে মরি-বাঁচি করে। দেখতে দেখতে রীতিমত ভিড় জমে গেল পিটমাউথে। লোকে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল কদমডাঙা করিয়ারির তিন নম্বর পিট।

ঢাবা থেকে নেমে এল এক নতুন মানুষ। এই খাদেরই মালকাটা আলি মিয়া। দাঁড়াল এসে সকলের সামনে। জীর্ণ শীর্ণ দেহখানা, কোটরগত চোখ, মুখে একমুখ রুক্ষ দাড়ি।

পৃথিবীর মাটির ওপর দাঁড়িয়ে হাত দুটি জোড় করে মনের আবেগে চিৎকার করে উঠল আলি নেওয়াজ, ইয়া আল্লা! মেহেরবান, তুমি আছ। জয় হোক, জয় হোক তোমার।

অভিভূতের মত তাকাল একবার কলিয়ারির বাবুদের দিকে। জল গড়াচ্ছে আলি নেওয়াজের দু চোখ বেয়ে। ভাঙা গলায় বলে উঠল, কত দিন—কত দিন যে আপনাদের দেখি নি বাবু, কত দিন যে দেখি নি এই দুনিয়ার আলো। দিন চার-পাঁচ হয়ে গেল হয়তো, না বাবু?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন কলিয়ারির ইনচার্জবাবু, আরে না—না, এই তো সবে তিন দিন। ঘাবড়াও মৎ আলি নেওয়াজ, সব কুছ ঠিক হ্যায়।

একজন গিয়ে তাড়াতাড়ি আলি নেওয়াজের চোখ দুটো বেঁধে দিলে রুমাল দিয়ে। সূর্যের আলোয় চোখ দুটো ঝলসে যেতে পারে। আবার সেই অন্ধকার, অন্ধকারের গুহায় ফেলে অন্ধ করে দিলে বুঝি আবার আলি নেওয়াজকে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠল আলি মিয়া, মোট আমরা বারো জন, বাকিগুলো ধুঁকছে এখনো খাদের নীচে। আলতাব মিয়া, কুদ্দুস, গোলাম রসুল, সোনাই মালতে, কালীচরণ, হাফেজ আলি······

আলি নেওয়াজকে খাদমোয়ানে পৌঁছে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নেমে গেছে ঢাবা। নেমে গেছে বাকিগুলোকে তুলে আনবার জন্য। বায়ুতাড়িত

অগ্নিশিখার মত চারিদিকে হঠাৎ ছড়িয়ে পড়ল আলি নেওয়াজের আবির্ভাব-বার্তা। তোলপাড় হয়ে উঠল আবার কদমডাঙা কলিয়ারি। চারিদিক থেকে লোক ছুটছে যমালয়ের ফেরতা মানুষ দেখতে।

টেলিফোনে অ্যাম্বুলেন্স ডাকা হয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়ল চারিদিক থেকে চারটে। তারই একটায় চাপিয়ে দেওয়া হল আলি নেওয়াজকে। জনতার ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলল অ্যাম্বুলেন্স। মোড় ফিরল কোম্পানীর অফিসঘরের সামনে। ফেলারামের রেস্টুরেন্টের পাশ দিয়ে পড়ল গিয়ে বড় রাস্তায়। হাসপাতালের পথ ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল দু-এক মিনিটের মধ্যেই।

খাদের নীচে আলতাব মিয়া তৈরি হয়ে গেছে। দলবল নিয়ে এগিয়ে আসছে সুড়ঙ্গপথ বেয়ে। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। সোনাই মালতে অসুস্থ। দুর্বল দেহখানা তার শক্ত করে চেপে ধরে টানতে টানতে এগিয়ে চলল আলতাব। পিছনে তার গোলাম রসুল, কুদ্দুস মিয়া, কালী বাগতি, আতা হোসেন, আর আর ওরা সকলেই। ছাদের গায়ে নাক ঠেকিয়ে এগোচ্ছে। ফুটখানেকের ব্যবধানে জলের ওপর মুখ উঁচিয়ে জল ঠেলে ঠেলে এগোচ্ছে।

চাবায় চড়ে অপেক্ষা করছে উদ্ধারকারী দল। দূর থেকে ওরা ঘণ্টা বাজাতে লাগল। গ্যাসবাতির আলো দেখিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে চানকমুলের নিশানা। আলতাব মিয়ার দলবল এসে পৌঁছে গেছে চানকমূলের কাছাকাছি। চাবা ঝুলছে জলের ওপর। সামনে এবার ডুবুজল। পিছন ফিরে হেঁকে উঠল আলতাব, হাবিস্—থেমে যা সব যে যেখানে আছিস।

অথৈ জলের অকূল পাথার সামনে। পিটবটমটা ফুটো হয়ে গেছে। এই সিমের ঠিক বারো শ ফুট নীচে ঠাসা ছিল ডিসেডগড় সিম, যাকে বলে প্রথম শ্রেণীর কয়লা। তোলা হয়ে গেছে বহুকাল আগেই। ওপর নীচে এই দুটো সিমের মাঝখানটা স্থায়ীভাবে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল মজবুত একটা পাটাতন দিয়ে। বানের তোড়ে ভেঙে চুরে ফাঁক করে দিয়েছে। চাবা থেকে একটা হাতুড়ি কিংবা গাঁইতি ছিটকে হঠাৎ যদি জলে পড়ে, সেটা গিয়ে থামবে একেবারে বারো শ ফুট নীচে। অন্য আর এক পাতালপুরীর সীমানায়।

অসুস্থ সোনাই মালতে অচৈতন্য হয়ে পড়ল হঠাৎ। আলতাব মিয়ার হাত ফসকে টুপ্ করে ডুবে গেল জলে। ডুবে গেল মোক্ষম ওই বারো শ ফুটের সীমানায়। গেল এবার, সোনাই মালতে গেল, পাতালস্থ হয়ে গেল বুঝি লোকটা।

সঙ্গে সঙ্গে ডুব দিলে আলতাব মিয়া, চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে। জল কেটে কেটে নীচের দিকে এগিয়ে গেল কয়েক বাঁও। এগিয়ে গেল আঁকুপাঁকু করে। হাতে কিন্তু ঠেকল না কিছুই। সোনাইকে আর ধরা গেল না। হতভাগ্য সোনাই, একেবারেই ছুটি নিয়ে চলে গেল আলতাব মিয়ার কাছ থেকে।

ভেসে উঠল আলতাব মিয়া, খালি হাতেই ভেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে পাশ থেকে সাড়া দিলে গোলাম রসুল, সোনাই মিয়ার কি হল রে?

করুণ কণ্ঠে জবাব দিলে আলতাব, ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে এলুম দোস্ত, বারো শ ফুট চানকের নীচে। ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে এলুম সোনাই মিয়াকে। আরাম করে ঘুমুচ্ছে, ডিসেরগড় সিমের ওপর। ও ঘুম আর কোন দিনই ভাঙবে না সোনাইয়ের।

আলতাব মিয়া ঢাবার নীচে ভাসছে। কয়েক ফোঁটা তার চোখের জল মিশে গেল খাদের জলে। করুণ ভাবে একটা ডাক দিলে আলতাব, সোনাই।

পাতালস্থ হয়ে গেছে সোনাই। ও-নামে আর সাড়া দেবার নেই কেউ। সোনাই মিয়া ফিরবে না। তাহলে আর মিছিমিছি দেরি করে লাভ? তাড়াতাড়ি এবার উঠতে পারলেই হয় যে। ছটফট করছে আলতাব মিয়ার সঙ্গীরা সব।

ঘণ্টা বাজছে ঢাবার ওপর। গ্যাসবাতির আলো দুলছে, একেবারে চোখের সামনে। মুছতে হল চোখের জল আলতাব মিয়াকে। কঠোরতর কর্তব্য তার সামনে। চানক থেকে উঠে এসে সঙ্গীদের সামনে দাঁড়াল। ডাক দিলে আবার আলতাব মিয়া, এগিয়ে আয়, এগিয়ে আয় সব একে একে। এইখানটা খুব সাবধান, গভীর জলে পা হড়কে কেউ যেন পড়িস না।

তৈরি ছিল উদ্ধারকারী দল। তাদের সঙ্গে ধরাধরি করে ঠেলেঠুলে চার পাঁচটাকে ঢাবার ওপর চাপিয়ে দিলে আলতাব মিয়া। ঢাবা উঠল আসমানের দিকে। পুলিসের লোক বর্ডন করে ঘিরে ফেলেছে পিটমাউথের সামনেটা ঢাবা থেকে একে একে ওরা নেমে আসছে। দাড়ি-ঢাকা মুখ, কঙ্কালসার চেহারা। কোনটা যে কে—চেহারা দেখে হঠাৎ চেনা মুশকিল।

কুদ্দুস মিয়া ঢাবা থেকে নেমেই পাগলের মত চিৎকার শুরু করে দিল ফুলজান—ফুলজান—আমার ফুলজান—

বছর পাঁচেকের ফুটফুটে একটা মেয়েকে কোলে নিয়ে একপাশে এসে দাঁড়িয়েছিল থুথুড়ি এক বুড়ী। কুদ্দুস মিয়া ছুটে গিয়ে ছোঁ মেরে কেড়ে নিলে মেয়েটাকে। কাঁধে তুলে নাচতে লাগল। পাগলের মত হা-হা করে শুধু

হাসছে কুদ্দুস। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়তে লাগল। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, ফুলজান—ফুলজান—আমার বেটী—।

একেবারেই পাগল হয়ে গেছে। ছুটে গেল কয়েকজন, তাড়াতাড়ি গিয়ে ধরে ফেললে কুদ্দুস মিয়াকে। মেয়েটাকে কেড়ে নিলে ওর হাত থেকে। মাটির ওপর বেহুঁস হয়ে লুটিয়ে পড়ল কুদ্দুস। ছুটে এলেন কলিয়ারির ডাক্তারবাবু। নাড়ী দেখছেন। কুদ্দুস মিয়ার বুকের ওপর চেপে ধরলেন স্টেথেসকোপখানা। একদৃষ্টে চেয়ে আছেন কলিয়ারির ম্যানেজার সাহেব। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, হোয়াট্‌স্ দি ট্রাব্‌ল, হাউ ডু ইউ ফিল ইট ?

ম্লান একটা দৃষ্টি মেলে ম্যানজার সাহেবের মুখের দিকে তাকালেন একবার ডাক্তারবাবু। চাপা গলায় কি যেন বললেন।

গম্ভীর হয়ে উঠলেন ম্যানেজার সাহেব, মালকাটা কুদ্দুস মিয়া, মোস্ট আনলাকি চ্যাপ।

একসঙ্গেই ওদের পাঁচজনকে ধরে পাকড়ে তুলে দেওয়া হল অ্যাম্বুলেন্স গাড়িতে। এগিয়ে গেল সেনট্রাল হাসপাতালের পথ ধরে।

তোলপাড় হয়ে উঠল কদমডাঙা কলিয়ারি। হাঁ করে সব চেয়ে আছে বিভ্রান্ত জনতা। এ যে কাল্পনিক উপন্যাসের অবিশ্বাস্য কাহিনী। খাদ ডুবেছে আজ থেকে ঠিক একুশ দিন আগে। তা হলে এরা ছিল কোথায় এত দিন ?

ঢাবা নিয়ে নেমে গেল উদ্ধারকারী দল। তুলে নিয়ে এল আরও কয়েকটা মালকাটাকে। সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হল হাসপাতালে।

বাকি মাত্র আর একজন। আলতাব মিয়া উঠতে পারে নি এখনো। ঠাঁই ছিল না ঢাবায়। আর সকলকে আগে আগে তুলে দিয়ে খাদের নীচে অপেক্ষা করছে আলতাব। মনটা তার ভরে উঠেছে অপরিমেয় ব্যথায়। আর সকলে উঠে গেল কোন রকমে, প্রাণে প্রাণে উঠে গেল দুর্ভেদ্য এই মরণপুরী থেকে, রয়ে গেল শুধু সোনাই মালতে। খোদাতালার এও হয়তো এক মর্জি, তাঁরই হয়তো দয়া, সোনাই মিয়াকে টেনে নিলেন নিজের কাছে।

বাকিগুলো সব উঠেছে। ভালোয় ভালোয় উঠে গেছে একে একে। আলতাব মিয়া নিশ্চিন্ত। দলের লোকের জিম্মাকারি খতম।

টান পড়ল রসিতে। শেষ খেয়ার যাত্রী হয়ে ঢাবায় চড়ে উঠে আসছে আলতাব। চোখ দিয়ে তার বারে বারে আঁশু ঝরে কেন ? সুখ-দুঃখে কোলাকুলি। আশা আর হতাশার দ্বন্দ্ব বুঝি শেষ হতে চলল। মনের আবেগে দুর দুর করে কাঁপছে যেন আলতাব মিয়ার সর্বাঙ্গ। কাঁপছে

প্রতি অঙ্গের প্রতি অণু-পরমাণু। কি বিচিত্র অনুভূতি, এ যে এক নবজীবনের আস্বাদ। শতেক বাঁধনে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে আলতাবকে টানছে যেন দুনিয়ার মাটি। কতদূর—আর কতদূর বাকি, চাবা এসে খাদমোয়ানে পৌঁছে গেল নাকি।

চারদিক যেন থৈ থৈ করছে লোকের ভিড়ে। হতবিহ্বল দৃষ্টি মেলে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে বিস্ময়াকুল জনতা। লক্ষ্য করছে আলতাব মিয়ার আবির্ভাব। চাবা থেকে ধীরে ধীরে নেমে এল আলতাব, এই বিস্ময়কর মহানাট্যের মহানায়ক শের-এ-মজদুর জনাব আলতাব মিয়া। দাঁড়াল এসে সকলের সামনে। সমবেত জনতার উৎসুক ও উৎফুল্ল দৃষ্টি অভিনন্দন জানালে বুঝি আলতাব মিয়াকে। হাত দুখানি জোড় করে বলে উঠল আলতাব, সেলাম—সেলাম, বাবুগো—আপনাদের সকলকে সেলাম। কত দিন যে দেখি নি এই দুনিয়ার মাটি, কত দিন দেখি নি এ আসমানের আলো—

কলিয়ারির ইনচার্জবাবু অভিভূত হয়ে পড়েছেন অতিমাত্রায়। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, তাকিও না—অমন করে সূর্যের দিকে তাকিও না আলতাব।

একখানি কাপড় দিয়ে বেঁধে দিলেন আলতাবের চোখ দুটো। নিজের হাতে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলেন অ্যাম্বুলেন্সের স্ট্রেচারের ওপর।

ধীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলে চোখ-বাঁধা আলতাব মিয়া, কোথায় এখন যেতে হবে বাবু?

হাসপাতালে যেতে হবে আলতাব।

ধাওড়ায় একবার দেখা করে যাব না?

না, সে-সব এখন পরে হবে। হাসপাতালে গিয়ে তবিয়তটা আগে ঠিক করে এসো।

এক্সিলেটারে চাপ পড়ল অ্যাম্বুলেন্স গাড়িতে। এগিয়ে চলল উৎসুক জনতার ভিড় ঠেলে। মোড় ফিরল অফিসঘরের পাশ দিয়ে। অ্যাম্বুলেন্স এগোচ্ছে। হঠাৎ গিয়ে থেমে গেল ফেলারামের রেস্টুরেন্টের সামনেটায়। অসুস্থ বাবুয়াকে পাঁজাকোলো করে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে গোলাপী। ফেলারাম তাকে কি যেন একটা বোঝাবার চেষ্টা করছে। গোলাপী কিন্তু কোন কথাই শুনতে চায় না। বাবুয়াকে সে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চায়। চাপরাসী ধুমকি সিং লোহার একটা ডাণ্ডা দিয়ে বাবুয়ার পা একটা খোঁড়া করে দিয়েছে। বাঁ পায়ে তার গ্যাংরিন।

পয়সার অভাবে বিনা চিকিৎসায় মরতে বসেছে ছেলেটা। এ দায়িত্ব কোম্পানীর। যতক্ষণ না বাবুয়াকে তুলে নেওয়া হচ্ছে এই হাসপাতালের গাড়িতে, পথ ছাড়তে রাজী নয় গোলাপী।

হেঁকে উঠল পাঞ্জাবী ড্রাইভার, হঠ যাও, জলদি হুঁয়াসে হঠ যাও।

ড্রাইভারের পাশ থেকে নেমে এল সোফারটা। গোলাপীকে ধাক্কা দিতে যাচ্ছে। নাগিনীর মত ফুঁসে উঠল গোলাপী, খবরদার মিন্সে, ভাল চাস তো ছেলেকে আমার তুলে লে এই গাড়ির মধ্যে। আর তা না হলে চালা গাড়ি আমার বুকের ওপর দিয়ে, দেখি তোদের কতবড় হিম্মত।

নেমে এলেন সরকারী এক ডাক্তারবাবু। গোলাপীর সামনে থেকে সরিয়ে দিলেন সোফারটাকে। অ্যাম্বুলেন্সের দরজা খুলে তুলে দিলেন গোলাপী আর বাবুয়াকে। গাড়ি ছুটল হাওয়ার বেগে।

বটতলার একপাশে দাঁড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে ফেলারাম। থ মেরে গেছে গোলাপীর দুঃসাহস দেখে। এইভাবে সে হাসপাতালের গাড়ি চড়াও হয়ে কাজটা বড় ভাল করলে না।

লোকগুলো কিন্তু বেঁচে গেল। চরম বাঁচা বেঁচে গেল মালকাটার এই দলটা। হপ্তা তিনেক খাদের জলে হাবুডুবু খেয়ে মরতে মরতে উঠে এল পাতাল ফুঁড়ে। উঠে এল খাদমুলুকের বিরাট একটা নতুন খবর হয়ে।

নতুন খবর সন্দেহ নেই। তবু এর জের কিন্তু থেকে গেল একটুখানি। আর যারা সব রয়ে গেল পাষাণময়ী মৃত্তিকার গর্ভে। মোটের ওপর দেড় শ। একপাল্লিতে এদের সঙ্গে খাদে নেমেছিল। তাদের খবর এরা তো কেউ দিয়ে গেল না?

পিছন ফিরে তাকাল একবার ফেলারাম। তাকাল একবার পিটমাউথের রসি-জড়ানো হেডগিয়ারটার দিকে। ডুলি বেয়ে উঠেছে নাকি আর কেউ?

না। ডুলি বেয়ে আর উঠছে না কেউ। ডীপ সেকশন অথৈ সমুদ্দুর। খাদের নীচে গ্যালারিগুলো ডুবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওঠানামার পালা ওদের শেষ হয়ে গেছে। কোম্পানীর হাজরিখাতায় নামগুলো সব কাটা পড়ে গেল। আজ আর কোন নাম নেই ওদের। বেনো জলের পলিমাটির নীচে নামগোত্র চাপা পড়ে গেছে। হয়তো বা কোন্ অনাগত সুদূর ভবিষ্যতে যুগান্তরের নতুন সমীক্ষায় মহাকাল ওদের চিহ্নিত করবে নতুন কোন নামে।

সে নাম কি মৃদঙ্গার!

শেষ